যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

দ্বিতীয় খণ্ড



প্রবীর ঘোষ

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০

প্রচ্ছদ : পিনাকী ঘোষ

দাম : ১০০ টাকা

ISBN-81-295-0294-1

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

YUKTIBADIR CHALLENGERRAA (2nd Vol.)
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০

প্রচ্ছদ : পিনাকী ঘোষ

দাম : ১০০ টাকা

ISBN-81-295-0294-1

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

কিছু কথা ... ৯

সাহেব যখন রেইকি করে
রাঘব বোয়াল চামচা ঘোরে ... ১৯

লক্ষ্মী মূর্তি কালী হলেন আপন খেয়ালে ... ৪৭

পাথর যখন কথা বলে ... ৫৩

ফাঁদে পড়ে, জ্যোতিষী স্ত্রীঘরে ... ৬১

বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী'র
বিষ্ময়কর পরাজয় এবং... ... ৭০

আই আই টি'তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও ... ৯৪

জণ্ডিস সারাবার পীঠস্থান ইছাপুর ... ১০২

মালপাড়ার পেশা দাঁতের পোকা বের করা ... ১০৮

নিমপীঠের গুগি মা ও অধ্যাত্মবাদ ... ১১৫

ওঝার ঝাড়-ফুঁক আর টেরিজার লকেটে
মণিকার রোগমুক্তি ঃ কুসংস্কারের দু'পিঠ ... ১২৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

The Times of India
আজকাল
সংবাদ প্রতিদিন
আনন্দবাজার পত্রিকা

কিছু কথা

আমি লেখক বলছি,

'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' প্রথম খণ্ড প্রকাশের পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। সময়ের ব্যবধানটা বড়ো-ই দীর্ঘ। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষমা চাইছি। চিঠিতে বা ফোনে যাঁরা দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্য তাগাদা দিয়েছেন, তাঁরাই এই বইটি লেখার প্রেরণা।

গত পাঁচ বছরে শ'দুয়েকের উপর তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার পিছনের আসল সত্য ফাঁস করেছি। দু'শো থেকেই দশটি ঘটনা এখানে তুলে এনেছি। বলতে পারেন 'টপ টেন'। কাহিনিগুলো একশো ভাগ সত্যি।

যুক্তিবাদী সমিতির বহু রকমের কাজের মধ্যে একটি হল তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা ফাঁস করা। এইসব 'অলৌকিক' ঘটনাগুলোকে আমরা দুটো শ্রেণিতে ভাগ করছি। এক শ্রেণির ঘটনার পিছনে অসাধারণ বুদ্ধি ও মুন্সিয়ানা থাকলেও ঘটনার পিছনের নায়ক-নায়িকারা অর্থ বলে বলীয়ান নয়। কিন্তু ওদের ফেরেববাজি ধরতে গেলে ঠোক্কর খেতে খেতে বুঝতে পারবেন, প্রতারণাকে কী শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে ওরা। এই যেমন ধরুন, ফুটপাথে যারা জলের রং পালটে দেবার ক্ষমতাওয়ালা পাথর বেচে। তাদের প্রতারণা ধরার তাত্ত্বিক জ্ঞান আপনার আছে। অর্থাৎ রং পালটাবার বিজ্ঞানটা আপনার জানা। তারপরও ধরতে গেলে দেখবেন, বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। ফুটপাথের এই শিল্পী-প্রতারকরা হাতের কৌশলে বারবার আপনার চোখকে ফাঁকি দেবে।

অনেক অলৌকিক ঘটনার পিছনে থাকে ছোটোদের দুষ্টুবুদ্ধি। তার মানে অবশ্য

এই নয় যে, ধরে ফেলাটা খুব সোজা। দমদমের সেই হাড়কাঁপানো কাচ-ভাঙা বাড়ির কথা মনে আছে? একটি কিশোর দিনের পর দিন ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল অনেক তাবড় নামী বিজ্ঞানীদের।

এদের ক্ষমতার হাত ছোটো। তাই এদের বুজরুকি ফাঁস করলে বিপদের সম্ভাবনা খুব-ই কম।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে লম্বা হাতের ধনকুবের অবতার-জ্যোতিষী ইত্যাদিরা। ধরুন সেই 'ইমামি' গ্রুপের কথা, যারা দাঁত দিয়ে গোটা একটা প্লেন টানাবে। কিংবা 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র সহযোগিতা পাওয়া বিলিয়োনিয়ার হ্যারিস, যে নাকি স্পর্শ চিকিৎসায় সব রোগ সারিয়ে তুলবে। এদের মতো ক্ষমতাবানদের বুজরুকি বানচাল করলে তা হয়ে দাঁড়ায় সব রকমভাবেই অত্যন্ত ঝুঁকির।

ধরতে গেলে যা করতে হবে ঃ

(১) কোনও গুণ শিখতে শত্রু-মিত্র বিচার করতে নেই। উদাহরণ (ক) জেমস বন্ডের সিনেমা থেকেও শেখা যায়—মরার আগে মরতে নেই। (খ) আমেরিকা পেন্টাগন থেকে শেখা যায় 'মস্তিষ্ক যুদ্ধের' নানা কূট ও প্রয়োগ কৌশল; শত্রুদের মধ্যে মিত্র তৈরির পদ্ধতি।

(২) তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আমি বা আমরা শেষ কথা বলার ক্ষমতা রাখি, এমনটা কখনই ভাবি না। প্রয়োজন মতো এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিই। এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ভূ-তত্ত্ববিদ, শারীরবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ধাতুবিদ, চিকিৎসক, জাদুকর ইত্যাদিরা আছেন। আপনারাও তা-ই করুন। আখেরে লাভ হবে-ই।

(৩) সত্যানুসন্ধানে যাওয়ার আগে বিষয়টাকে নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতি পর্বকে বলব 'হোম ওয়ার্ক'। কিন্তু কোনও ভাবে-ই আগে থেকে একটা ধারণাকে মাথায় গুঁজে সত্যি খুঁজবেন না। তাতে 'সত্যি' অধরা থেকে যাবার সম্ভাবনা।

আগরপাড়ার একটা বাড়িতে যখন-তখন আগুন জ্বলে উঠছিল। আপনা-আপনি আগুন ধরে যাচ্ছিল বিছানায়, পরদায়, কাপড়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই এ'নিয়ে পত্রিকাগুলো বাজার গরম করে রেখেছিল। কাজে ব্যস্ত থাকায় ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারিনি। ইতিমধ্যে কিছু বিজ্ঞান সংগঠন কারণ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টাও চালিয়েছে। আমরা যে'দিন গেলাম, সেদিন আমাদের সঙ্গী ছিল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম।

সে'দিনই পুড়েছে, এমন কিছু নমুনা আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করলাম। কয়েকটা চিনেমাটির সাদা প্লেট নিলাম। একটি করে নমুনা প্লেটে রেখে সামান্য

জল ঢেলে একটা কাঠি দিয়ে নাড়ছিলাম। জলের রং হালকা বেগুনি হল। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললাম। শেষে বাড়ির-ই একটি বালক স্বীকার করল ঘটনাটি ঘটাচ্ছিল। বিছানায় বা পর্দায় সামান্য গ্লিসারিন ঢেলে দিচ্ছিল। ভারী তরল ধীরে ধীরে নিচে নামছিল। কিছুটা নিচে কাপড়ে বা পর্দাতেই ছড়িয়ে রাখছিল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। গ্লিসারিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিলিত হলেই বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হচ্ছে ও শেষে আগুন ধরে যাচ্ছে।

আমি বললেই লোকে তা মানবেন কেন? বাজার থেকে গ্লিসারিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আনালাম। একটা কাপড়ে একই পদ্ধতিতে আগুন লাগালাম। পোড়া নমুনা একটা প্লেটে রেখে জল ঢেলে দেখালাম, এই জলের রংও বেগুনি হয়ে গেল। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থাকার জন্যই বেগুনি হল।

জানলাম, যে স্কুল পড়ুয়া একটি বালক এমন কাণ্ডটি ঘটাচ্ছিল সে আমাকে কথা দিয়েছে, আর এমন দুষ্টুমি করবে না। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও ছেলেটির নাম জানাইনি। ছেলেটিকে শোধরাবার সুযোগ দিতে-ই জানাইনি।

এই সত্যানুসন্ধানের কথা অনেক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল। আর তারপরই ঘটতে লাগল মজার মজার কাণ্ডকারখানা। এর থেকেই দুটি উদাহরণ হাজির করছি।

এই ঘটনার পরে বরাহনগরে একটি বাড়িতে ভূতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়। রহস্যটা ধরতে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান সংগঠন হাজির হয়েছিল। উপদ্রুতদের কাছে শুনেছি, সংগঠনগুলোর মূল প্রশ্ন ছিল একটাই—এ বাড়িতে কোনও বালক বা বালিকা নেই? বালক-বালিকা ছিল না। অতএব তাদের আর ভূত ধরা সম্ভব হয়নি।

শিলিগুড়ির একটি বাড়িতে শুরু হল ভূতুড়ে-কাণ্ড। আপনা-আপনি হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে উঠছে আগুন। একটি বিজ্ঞান সংগঠনের তরফ থেকে একজন আমাকে ফোন করলেন। জানালেন, "পোড়া নমুনা প্লেটে রেখে জল দিচ্ছি, কিন্তু জল তো বেগুনি হচ্ছে না।"

শুনে হাসব, না কাঁদব? যেন আগুন জ্বালার একমাত্র উপকরণ গ্লিসারিন আর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মিশ্রণ।

(৪) স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে নিজেকে পালটাই। পালটে ফেলি 'বডিল্যাঙ্গুয়েজ'। কখনও বুদ্ধুরাম, কখনও বাচাল। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলেই সব্বাই বুঝে যান—আমি ধারে কাটি না, ভারে কাটি। কখনও তরলমতি, তো কখনও ভয়াবহ। মোদ্দা কথায় কাজ উদ্ধারের জন্য যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। কোথায় কেমন ভাবে নিজেকে হাজির করব, সেটা শিখেছি লড়তে লড়তে। আপনারাও আমার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে দেখতে পারেন।

(৫) চ্যালেঞ্জারের অশিক্ষিত-গরিব-বোকা বোকা কথা শুনে অথবা অল্প বয়স দেখে একটুও আত্মতুষ্ট থাকতে নেই। বিরুদ্ধ শক্তিকে আন্ডার-এস্টিমেট করাই পতনের কারণ হতে পারে। হয়ও।

(৬) কোনও চ্যালেঞ্জারকে নিজের তুলনায় বিশাল ভাবলে তা হবে আত্মহত্যার সামিল। হারার আগেই হেরে বসে থাকা। মনে রাখতে হবে—আমি কারও চেয়ে ছোটো নই। এই মনে রাখাটা প্রত্যয়ে পালটাতে হবে।

(৭) প্রতিটি চ্যালেঞ্জ নতুন লড়াই। কঠিন লড়াই। এটা মনে রেখে একশো ভাগ আন্তরিকতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে উজাড় করে না দিলে লাগাতার জয় ধরে রাখা অসম্ভব।

(৮) যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই যুক্তিবাদী নন। অনেকেই প্রগতিশীল সাজতে যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে করেন না যে, ঈশ্বর-আত্মা-জ্যোতিষ এ'সবই মিথ্যে ; অলৌকিক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। এমন দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আর যা-ই হোক 'অলৌকিক' নিয়ে সত্যানুসন্ধান করা যায় না।

বছর কয়েক আগের ঘটনা। যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় শাখার ফিস্ট ঠাকুরনগরে। শ'খানেক সদস্য-সদস্যা হাজির। প্রথামতো সকাল থেকে গান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, ম্যাজিক নিয়ে ফিস্ট জমে গেছে। আশিস সমিতির কট্টর যুক্তিবাদী। আমাদের কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানে ও হিরো। সোচ্চারে বলেন, "অলৌকিক" বলে কিছু নেই।" ফিস্টে আশিস অনেক বাক্স সাজিয়ে সহকারিণী নিয়ে গেছেন। ম্যাজিক দেখিয়েছেন। আমরা উপভোগ করেছি। কয়েকজন জ্যোতি মুখার্জিকে অনুরোধ করলেন ম্যাজিক দেখাতে। জ্যোতিদা শখে আমাদের একটু-আধটু ম্যাজিক দেখান। বয়স আর অসুস্থতায় কাবু। তাও সবার অনুরোধে উঠলেন। বললেন, একটাই ম্যাজিক দেখাবেন। দর্শকদের কাছ থেকে তিনটে কয়েন চেয়ে নিলেন। এক টাকা, পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার। তিনটে কয়েনেই পেনসিল দিয়ে স্বাক্ষর করলেন তিন বিশিষ্ট দর্শক। জ্যোতিদা কয়েনগুলো একটা ছোট্ট গোল ধাতুর বাক্সে রাখলেন। একটু পরেই খুললেন। বাক্স উপুড় করে দেখালেন, কয়েনগুলো ভ্যানিস।

এতটা পর্যন্ত দেখানো সম্ভব। ম্যাজিকের এ বি সি ডি জানা প্রত্যেকেই এই ম্যাজিক জানেন। কিন্তু তারপর যা হল, সেটাই গল্পের আসল অংশ। সেটাই ম্যাজিকের বাইরে বাড়তি কিছু।

জ্যোতিদা বললেন, এই কয়েনগুলো কার পকেটে চালান করব—আপনারাই ঠিক করে দিন। সকলেই একজন বিশিষ্ট অতিথির পকেটে কয়েনগুলো চালান করতে অনুরোধ করলেন। জ্যোতিদা ডান হাতটা মুঠো করে বিশিষ্ট অতিথির দিকে অদৃশ্য কয়েনগুলো ছুড়ে দিলেন। বললেন, "দেখুন, আপনার পকেটে চলে গেছে।" ভদ্রলোক কোটের ডান পকেটে হাত ঢোকালেন, নেই। বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে অবাক। তিনটে কয়েন। একটাকা, পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সা। যাঁরা কয়েনে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁরা কয়েন দেখে বললেন, হ্যাঁ এ তাঁদেরই স্বাক্ষর। মুহূর্তে সব আলো টেনে নিলেন জ্যোতিদা।

আশিস ছাড়াও কয়েকজন ম্যাজিসিয়ান হাজির ছিলেন। ওঁরা প্রত্যেকেই অবাক। কারণ ম্যাজিকের ব্যাকরণ অনুসারে এমনটা ঘটান অসম্ভব। অর্থাৎ সোজা বাংলায় অলৌকিক।

এরপর আশিস জ্যোতিদার পিছনে চিটেগুড়ের মতো লেগে ছিলেন বছরের পর বছর। উদ্দেশ্য, জ্যোতিদার কাছ থেকে সেই তন্ত্র-মন্ত্র শেখা, যা দিয়ে এমনটা ঘটান সম্ভব। আশিসের এমন মানসিকতার কারণ, ওঁর মনে 'অলৌকিক' নিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। জ্যোতিদার ম্যাজিক দেখে তাই এর পিছনের সত্যিকে খুঁজতে আন্তরিক চেষ্টা করেননি। কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে জ্যোতিদার কাছে ম্যাজিকের বিজ্ঞানটা জানতে চাননি আশিস। ঘটনাটা দেখলেন। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কারণ খুঁজে পেলেন না। আর কারণ খোঁজার চেষ্টা করলেন না। ধরেই নিলেন ব্যাপারটা অলৌকিক।

আসলে এই পুরো ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল। তবে প্রথাগত ম্যাজিক ছিল না। ম্যাজিকের সঙ্গে একটু মনোস্তত্ত্বের মজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দর্শকরা কাকে চিহ্নিত করবেন, আগাম বুঝে আমি এক সময় কয়েন তিনটে বিশিষ্ট মানুষটির পকেটে চালান করে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছিলাম। স্বাক্ষরিত কয়েনগুলো হাত ঘুরে আমার হাতে এসে গিয়েছিল—এটা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারছেন।

এমন দ্বিধা থাকলে সত্যি খোঁজা যায় না।

(৯) কোনও ভূতুড়ে রহস্যের সত্যানুসন্ধানে নামলে প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শী পাবেন। তাঁরা দেখেছেন, শূন্যে চেয়ার-টেবিল ভেসে বেড়াচ্ছে, সন্দেশ-রসগোল্লা ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। হাত থেকে চুড়ি আপনা-আপনি বেরিয়ে আসছে। অন্তর্বাস ছাড়তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ধারাল কিছু দিয়ে কাটা। অথচ পরার সময় ছিল গোটা। জিনিস-পত্তর নিজে থেকে আছড়ে পড়ছে, ইত্যাদি। ভূতের কাণ্ডকারখানা যত শুনতে চাইবেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা ততই শোনাবেন। এইসব প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের নারী-পুরুষ পাবেন। বিখ্যাত মানুষও পাবেন।

মনে রাখবেন, ওঁরা প্রত্যেকেই মিথ্যে বলছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় ওঁরা মিথ্যে বলেন। আজ পর্যন্ত পাওয়া কয়েক'শো ভূতুড়ে ঘটনার প্রতিটি সমাধান করে-ই এ'কথা বলছি।

বরং খুব মন দিয়ে মিথ্যেগুলোই শুনতে থাকুন। ওদের মিথ্যের ফাঁক দিয়েই সত্যির আলোর খোঁজ পেয়ে যাবেন।

(১০) অনেকে রহস্য ফাঁস করার মধ্যে শুধু উত্তেজনার আনন্দ অনুভব করেন। 'হিরো' হতে ভালোবাসেন। কিন্তু এইসব অলৌকিক ফাঁসের বড়ো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সাধারণ মানুষের কাছে এই সত্যকে তুলে ধরা যে, অলৌকিক-আত্মা-জন্মান্তর-নিয়তিবাদ-অবতারবাদ মিথ্যে। এ'সবই রাজাদের স্বার্থে পুরোহিতদের

তৈরি মিথ্যে। আমাদের কাজ বিজ্ঞানের সত্য খোঁজা, জনতাকে সত্যের খোঁজ দেওয়া। পরিবর্তে শুধু রহস্য ফাঁস করতে যাওয়া ভুল অ্যাপ্রোচ।

শত্রুর হাত যখন লম্বা ঃ

আমার নানা অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বইতে লিখেছি। কিছু কিছু কাহিনি পড়লে মনে হতে পারে, অ্যাডভেঞ্চার গপ্পো। স্বভাবতই কেউ কেউ মনে করতেই পারেন যে, কাহিনিকে উত্তেজক করতে, আকর্ষণীয় করতে কিছুটা রং চড়িয়েছি। বিশেষ করে প্রতিবেশী, সহকর্মী ও মধ্যবর্তী বাঙালিদের মধ্যে এমন ভাবার একটা প্রবণতা আমি লক্ষ্য করেছি।

এক দিনের ঘটনা। যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য সুপ্রিয়র অফিসে গিয়েছি। অনেকেই ঘিরে ধরলেন। অনেকের অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল। একজন ঠোঁটকাটা মানুষ জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, "অনেক সময় মনে হয়, হয়তো বা কাহিনিতে কিছুটা রং মিশেছে। কাহিনিকে আকর্ষণীয় করতে কি একটু রং চড়ান? নিশ্চয়ই পুরোপুরি সত্যিটুকু নিপাট তুলে ধরেন না?"

"সত্যি উত্তর দিয়েছিলাম, আংশিক সত্য লিখি। একটু রং কমিয়ে লিখি। যে'সব কীর্তিমান অবতার, জ্যোতিষী ও ফেরেববাজদের নাঙ্গা করে ছাড়ি, তাদের অনেকেই শতকোটি বা সহস্রকোটির মালিক। গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে থাকে। এই পোড়া দেশে টাকা থাকলেই সব আছে। দুর্নীতিবাজ জানলেও পাবলিক আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ধনী দেখলেই তাকে মাথায় তুলে রাখবে। স্বার্থের সম্পর্কে এইসব কুবেররা বেঁধে রাখে পাড়ার ক্লাব থেকে মাফিয়া ডন। পুলিশ থেকে প্রশাসনের বড়-মেজ কর্তারা কুবেরের আমন্ত্রণ পেলে বর্তে যান। হৃদ্যতা বজায় রাখতে তারকা রাজনীতিকরা হাঁকপাঁক করেন। এই একই ছবি সাঁইবাবা থেকে আম্মা সর্বত্র। এঁদের পিছনে লাগতে গেলে মৃত্যু নয়, মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

"এই ধরনের শক্তিধরদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামার আগে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির সীমাবদ্ধতা ভালোমতো বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। আক্রমণ সামলাবার ক্ষমতা থাকলে-ই নামানো উচিত।

"তারপর সত্যি যখন লড়াইটা হয়, তখন তার ভয়াবহতা পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ'সব ডিটেলে লেখা আমাদের পক্ষেও নানা কারণে অনুচিত বা বোকামো।

"এই সত্যিটা তো মানবেন যে, পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মস্তানি সামলাতে হলে নিজেরও পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখতে হয়।"

কয়েক বছর আগে সুপ্রিয়র অফিসে শত্রুর লম্বা হাত নিয়ে যেসব কথা

বলেছিলাম, বর্তমানে সেই অবস্থার গুণগত কিছু পার্থক্য হয়েছে। দেশ দুর্নীতিতে বহুগুণ এগিয়েছে। দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী—এ'কথা সাংবাদিকরা জানেন। ততটা না হলেও কিছুটা জানেন পত্রিকার পাঠক ও টিভি খবরের দর্শকরা। এখন অবতারমার্কা প্রতারকদের লম্বা হাত আরও লম্বা হয়েছে। তাদের খুল্লামখুল্লা স্পনসর করতে নেমে পড়েছে ভারতের বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে বিখ্যাত প্রসাধন নির্মাণকারী সংস্থা। এই তালিকাকে আরও দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তালিকা তৈরি নয়, উদাহরণ হাজির করা। বর্তমানে ক্ষমতাবান বুজরুকদের ধরা আরও বেশি বিপদ নিয়ে খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওদের বুজরুকি ফাঁস করলে ওরা প্রত্যাঘাত করবেই। প্রত্যাঘাত সামলাবার মতো ক্ষমতা না থাকলে চুপ থাকা ভালো। যদি মনে করে থাকেন, ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, তবে বলতেই হবে আপনি অতি বোকা।

ফাঁকা আস্ফালন যাদের বিরুদ্ধে করা, তারা কিন্তু ঠিক বুঝে ফেলে। ভয় করে না। উপেক্ষা করে। অথবা বাড়াবাড়ি দেখলে শেষ করে দেয়।

আবার কারও কারও কথায় অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। যাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা, তারা ঠিক বুঝে যায়—এ'বার থামতে হবে। পালটাতে হবে। নতুবা দিন শেষ।

অতি সম্প্রতি একটা ঘটনার দিকে তাকাই আসুন। ঘটনাস্থল বিহার, ঝাড়খণ্ড ও আশেপাশের এলাকা। এই এলাকার অরণ্যের গাছ রক্ষার জন্য রয়েছে বিশাল সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী। তবু অরণ্য-মাফিয়াদের নেতৃত্বে গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রক্ষীরা অবশ্য নীরব দর্শক নয়। ওরা হিসেব রাখে বিভিন্ন মাফিয়াদের কে কত গাছ কাটল। পাওনা কত হল। হিসেব কষে পাওনা আদায় করে। এই সব চোরাই গাছ প্রকাশ্যে বিভিন্ন হাটে বিক্রি হয়। সেখান থেকে লরিতে চেপে গাছগুলো যায় করাত কলে। চোরাই গাছের কল্যাণে করাত কলের সংখ্যাও রমরম করে বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর মন্ত্রী-সচিব-পুলিশ-প্রশাসন-পরিবেশ দপ্তর সব্বাই এ'সব খবর সুদীর্ঘ বছর ধরে জানেন। রাজ্যের মানচিত্র পালটেছে, সরকার পালেটেছে, কিন্তু জঙ্গল মাফিয়া-রাজ পালটায়নি। ওয়াকিবহাল মহল বলে, এ'এক বিরাট চক্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ সব্বাই। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার কাঠ লুঠ হয়ে যাচ্ছে, করার কিচ্ছু নেই।

সম্প্রতি নকশালরা আদেশ জারি করেছে—বে-আইনিভাবে গাছ কেটে যারা অরণ্য উজাড় করছে, তাদের এবার কেটে উজাড় করা হবে। রেহাই পাবে না এঁদের সঙ্গে যুক্ত অরণ্যরক্ষী থেকে করাত মালিক কেউ-ই। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। মাফিয়া-রক্ষী-কাঠ ব্যবসায়ীদের সুদীর্ঘকালের আঁতাত শিকেয় তুলে ত্রিমূর্তি এখন 'ধোয়া তুলসী পাতা'। গাছ কাটা, গাছের বাজার রাতারাতি বন্ধ।

মাফিয়া-রক্ষী-পুলিশ-প্রাসকদের শক্তিশালী আঁতাতও বোঝে কোনটা ফাঁকা আওয়াজ, কোনটা সারগর্ভ।

আমাদের শত্রুরাও জেনে গেছে আমাদের 'পাস্ট রেকর্ড'। কোনও লড়াই হারার রেকর্ড আমাদের নেই। শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। শত্রুদের মধ্যেও গোপন-বন্ধু আছে। তাই আক্রমণ নেমে আসার আগে খবর পেয়ে যাই। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। এক কোটিপতি জ্যোতিষী তার একান্ত বিশ্বাসভাজনদের নিয়ে গোপন বৈঠক করল। আমাকে হত্যা করার 'সুপারি' নিল এক 'টপ' উত্তর কলকাতাবাসী। টেপ বাজিয়ে ষড়যন্ত্রীদের কথোপকথন আমাকে শুনিয়ে দিলেন ওই জ্যোতিষীরই এক 'বিশ্বস্ত' সঙ্গী। খবর পেলাম, কয়েক দিন পরেই টপকাবার দায়িত্ব নেওয়া মানুষটির জন্মদিন। জন্মদিনের উৎসবে হাজির হলাম। রাজনীতিক থেকে মস্তানদের হুল্লোড়ে মজলিস জমজমাট। আমাকে দেখেই তার 'টপ'-এর থেকে বোতল গেল পড়ে। চোখ ছানাবড়া। গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানালাম। "আমাকে টপকালে যে বহুত ভোগান্তি আছে"—কানে কানে সে কথাটাও জানিয়ে দিলাম। তারপর ওর দিক থেকে সব ঠিক ঠিক।

আমরা গুরু পাকড়েছি আমেরিকাকে। আমাদের মতো সাম্যের সুন্দর স্বপ্ন দেখা মানুষগুলোর শত্রু আমেরিকাকে। আমেরিকাই প্রথম বুঝেছিল, অস্ত্রযুদ্ধের চেয়ে লক্ষগুণ কার্যকর মস্তিষ্কযুদ্ধ। মস্তিষ্ক যুদ্ধের প্রথম সফল প্রয়োগ করে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর। একটিও বোমা বা গুলি খরচ না করেই কমিউনিস্ট দেশটাকে ধসিয়ে দিয়েছিল।

আমরা একই ভাবে মস্তিষ্ক যুদ্ধ জিতে শেষ জয় ছিনিয়ে আনি। আক্রমণ প্রতিহত করি। ধস নামাই। শেষ কাহিনিতে তার-ই একটা স্পষ্ট চিত্র পাবেন। সে এক অসম্ভব জয়ের ছবি।

টিনের তলোয়ার অথবা রেড কার্পেট

মাদারকে 'সেন্ট' বানাতে পোপের দরকার একটা 'মিরাকেল'-এর। গরিব আদিবাসী একটি মেয়েকে দিয়ে বলানো হল, তার পেটের বিশাল টিউমার রাতারাতি সরিয়ে দিয়েছে মাদার টেরিজার লকেটের ছবি। বিনিময়ে মেয়েটি পেলেন আর্থিক নিরাপত্তা।

শেষ পর্যন্ত মিথ্যে ফাঁস হল। যুক্তিবাদী সমিতি সত্য উদ্‌ঘাটন করল। লড়াইটায় আমরা কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকারী বা যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল সংগঠনকে দেখতে পেলাম না। অথচ এই বঙ্গে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান সংস্থার তেমন অভাব নেই। শীতে বিজ্ঞান মেলা, মডেল প্রদর্শনী, ধূমহীন চুল্লি, অনেক কিছুতেই ওরা

থাকে। কিন্তু পোপ ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বুজরুকির বিরুদ্ধে ওরা চুপ কেন? গোলমালটা কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে যে সব বিজ্ঞান সংগঠন আছে, তাদের অনেকেরই নানা সীমাবদ্ধতা আছে। সি পি আই (এম)-এর একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। এস ইউ সি আই-এর বিজ্ঞান সংগঠনের নাম 'ব্রেকথ্রু'। সি পি আই এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠন আছে। কাজে না থাকলেও সাইনবোর্ডে ওরা আছে।

ওরা রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠন। রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু নির্বাচন নির্ভর দল, সে'হেতু ভোটারদের খুশি রাখার কথা ভাবতে হয়। ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব দিতে হয়।

পোপের বুজরুকির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে বিপদ দু-দিক থেকে। এক তো খ্রিস্টান ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে আঘাত দেওয়া। দুই হল, মাদার-আবেগে গা ভাসানো বাঙালির নরম মনে দুঃখ দেগে দেওয়া।

পোড় খাওয়া মার্কসবাদী নেতৃত্ব এত বছর বাঙালি ঘেঁটে বুঝে নিয়েছেন, আমবাঙালি কোনও কিছুই তলিয়ে বুঝতে চায় না। না বুঝেই সব বোঝে। ওদের বোঝানো মুশকিল যে—মাদারের সঙ্গে একটা প্রকট মিথ্যেকে জড়িয়ে যে ভাবে 'সেন্ট' বানাবার চেষ্টা পোপ করছেন, সেটা মাদারকেই অপমান করা। পোপের বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রচারে নামলে সেটাকে 'মাদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন' বলে ধরে নেওয়ার মত বাঙালি মধ্যবিত্তরা সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী। সুতরাং, এই বঙ্গের নির্বাচনে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে পোপ বিরোধিতায় নামাটা ছিল 'ঝুঁকি'র। ফলে তাদের বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর পক্ষে এমন একটা আন্দোলনে সামিল হওয়া ছিল অসম্ভব।

কিছু বিজ্ঞান সংস্থা আছে, যাদের ফান্ড আসে আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলো থেকে। মালিকরা ধর্মে খ্রিস্টান। এইসব বিজ্ঞান সংস্থাগুলো জানে, খ্রিস্ট ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে পেটে হাত পড়তে পারে। তাই অস্তিত্ব রাখতে নীরব। 'জনগণের জন্য বিজ্ঞান' ইত্যাদি স্লোগান সম্বল করে ধনীর ধনে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে আর যা-ই করা যাক, পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা যায় না।

তান্ত্রিক-জ্যোতিষী-বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এন জি ও'র সহযোগিতায় চলছে আরও একটি তথাকথিত যুক্তিবাদী সংগঠন। ওদের জন্ম দেওয়া হয়েছিল যুক্তিবাদী সমিতি ভাঙতে; যুক্তিবাদী আন্দোলনে দুর্বার গতিতে স্তব্ধ করতে। সুতরাং ওদের কম্ম পোপ-ভ্যাটিকান-মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ভণ্ডামির বিরোধিতা নয়। কর্তারা চায়নি, তাই পুতুলরা নাচেনি।

এইসব সংগঠনগুলোর সীমাবদ্ধতা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে ওদের নীরবতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

একই সঙ্গে এও সত্যি যে, এইসব সংগঠনে অনেক সদস্য আছেন যাঁরা লড়াকু, অকুতোভয়, সৎ। তাঁরাই ঠিক করতে পারেন সংগঠনের কর্ম-পদ্ধতি। সংগঠন টিনের তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের অভিনয় করবে, নাকি সত্যি লড়াইতে নামবে।

যাঁরা আপস করে আখের গোছানোকে জীবনের লক্ষ্য করেছেন,—তাঁদের চিনে নিন। জানবেন, আপস করে পাপোশ হওয়া যায়, বড়ো জোর রেড কার্পেট; কিন্তু যুক্তিবাদী হওয়া যায় না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনাদের সবাইকে আন্দোলনের সঙ্গী হতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সদস্য হতে বা কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে জবাবি খাম পাঠান। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হন। আনন্দ পাবেন। আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু করার আনন্দ।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

আট জানুয়ারি
(মিরজাফর-বিজয় দিবস)
দু'হাজার চার

সায়েব যখন রেইকি করে রাঘব বোয়াল চামচা ঘোরে

'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ভারতের সবচেয়ে বড়ো পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক। ৩০ আগস্ট ২০০৩, শনিবার। টাইমস-এর কলকাতা সংস্করণে একটা বিস্ফোরক খবর প্রকাশিত হল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় থাকে মোট আটটি কলাম। তার ছ'কলাম জুড়েই ক্লাইভ হ্যারিসের অলৌকিক ক্ষমতার 'আঁখো দেখা হাল'। সঙ্গে ছবি।

ক্লাইভ হ্যারিস একজন স্পর্শ চিকিৎসক। তবু পৃথিবীর তাবৎ স্পর্শ চিকিৎসকদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর চার থেকে দশ সেকেন্ড হাতের ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ সেরে ওঠে লিউকোমিয়া থেকে ক্যানসার রোগী। শেষ অবস্থা না হলে এডস রোগীকেও সারিয়ে তোলেন। কতটুকু বয়স থেকে হাতের ছোঁয়ায় রোগী সারাচ্ছেন? মাত্র দু'বছরের শিশুকাল থেকে। যিশু থেকে কৃষ্ণ— কেউই দু'বছর বয়স থেকে মুহূর্তের স্পর্শে রোগীকে আরোগ্য করেছেন, এমন কাহিনি আমাদের জানা নেই। বাস্তব অনেক সময় কাহিনিকে ছাড়িয়ে যায়—এ'কথা কে যেন লিখে গেছেন। তাই টাইমস-এর কথাকে স্বীকার করলে এই সত্যকেও স্বীকার করতে হয় যে, ক্লাইভ হ্যারিসের 'অলৌকিক' ক্ষমতা অভূতপূর্ব। অর্থাৎ আগে কখনও ঘটেনি। রেইকি-সায়েব এখনও পর্যন্ত ১২ কোটি রোগীকে সারিয়ে তুলেছেন। ভাবা যায়?

মাদার টেরিজাকে 'সেন্টহুড' দিতে যাচ্ছেন পোপ। কারণ—মাদার নাকি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় একজন না দু-জনের অসুখ সারিয়েছিলেন। সে গল্পের দুধে অনেক জল। অথচ হাতের সামনে হ্যারিস থাকতে পোপ তাঁকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। সাহেবদের কাছেও কী তবে 'ঘর কা মুরগী দাল বরাবর?' না কী মরা মানুষকে 'অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী' বলে ঘোষণা করায় অনেক সুবিধে আছে? দুষ্টু লোকেরা বলে, তা আছে। কারণ মরা মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয় না।

তিন মাসের ভারত সফরে এসেছেন হ্যারিস। ৩০ লক্ষ রোগী পাবেন বলে

THE TIMES OF INDIA

The Times of India, Kolkata Saturday, August 30, 2003

Healer cures diseases with a tender caress

By Sujata Dugar
TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: As a toddler, the caress of his tender fingers cured villagers of their illnesses. At 60, he finds curing cancer "easy". And this Tuesday, he is coming to town.

Clive Harris, a master of touch therapy, is arriving in Kolkata on a two-day visit on September 2. The Kenyan, who claims to have healed over 120 million people "since birth", wants to reach out to three million people in his three-month stay in India. And yes, he charges nothing from his patients.

"I want to reach out to all those who are suffering from any form of disease," said Harris, having completed a successful session in Mumbai.

TOUCH & CURE

"I decided to come to India only when I realised that I could devote enough time to reach out to the wide populace," said Harris.

A healer since the age of two, Harris realised his unique ability when neighbours who came to see him "felt cured of their problems after a pat".

As the word spread, he began to be considered a panacea for all diseases and was approached by people from all parts of the country.

He has since travelled to Europe, Canada and Africa, and runs almost 19 organisations

Harris's therapy is quite simple. He merely touches the affected part of the patient's body for four to 10 seconds and that apparently is cure enough.



Master of touch therapy Clive Harris.

"I perceive every individual's body as a glowing object. All those areas that appear as dark patches are removed by a simple touch," he said.

He resents the being termed Reiki or a form of psychological cure.

He claims to have cured all kinds of "external problems" and diseases, like leukaemia, blood pressure, diabetes, malaria and even cancer.

"It is easy to cure cancer as it is a localised growth and can be curtailed from turning malignant," he said. He claims that almost 87 per cent of the patients show instant results upon medical verification.

"He is quick to point out his inabilities, though. "I cannot replace amputated body parts, cure blindness or an AIDS patient in his last stages," said Harris.

আশা করা যাচ্ছে। মুম্বাইতে অসাধারণ সাফল্যের পর হ্যারিস কলকাতায় আসছেন ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মঙ্গলবার।

আমরা, যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা শনিবারই ঠিক করে ফেললাম, খোলা মনে হ্যারিসকে নেড়ে-চেড়ে দেখব। তাঁর ক্ষমতার কথা উঠিয়ে বানানো না হলে, আমরা হ্যারিসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য আন্দোলনে নামব। নোবেল পুরস্কার তাঁকে দিতেই হবে, তা সে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদানের জন্য দেওয়া হোক, বা নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হোক। কিন্তু দিতে হবে।

পোল্যান্ডের মানুষ ক্লাইভ হ্যারিস। কানাডায় তিনি জীবনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। দুটো দেশ হ্যারিসের নাম কেন যে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠাচ্ছে না কে জানে! দেশ দুটো কী তবে ভারতের চেয়েও দুর্নীতিতে এগিয়ে? তেমন হলে হ্যারিসকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি জানাব আমরা। আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতে তিনি স্বাগত। ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হ্যারিসকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া থাকবে— আগাম ঘোষণা রাখছি। হ্যারিসের ব্যাপারে বিদেশি ছুঁত মার্গের কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। কারণ আর্যরা যে বিদেশি—এ'কথা মুরলীমনোহর যোশী থেকে প্রবীণ তোগাড়িয়া প্রত্যেকেই জানেন। সোনিয়া গান্ধিকে 'বিদেশিনী' বলে চেঁচানোটা অবশ্য একেবারেই অন্য ব্যাপার। প্রধান প্রতিপক্ষ সোনিয়াকে ক্ষমতার গদি থেকে দূরে রাখতে এই নখরাবাজি। হ্যারিসকে ভারতীয় বানাতে পারলে বিজেপি ও ভি এইচ পি'র লাভ-ই লাভ। লাভ এক ঃ ভারতীয় নোবেল প্রাপ্তি। লাভ দুই ঃ বৈদিক স্পর্শচিকিৎসাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা। লাভ তিন ঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্পর্শচিকিৎসাকে পাঠ্যভুক্ত করে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উন্নত করা।

জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করার জোরালো চেষ্টা বিজেপি সরকারের তরফে ছিল। যুক্তিবাদী সমিতির চেষ্টায় জ্যোতিষী পেশাটাই-বেআইনি হয়ে যাওয়ায় বিজেপি সরকারের সে পরিকল্পনা ধাক্কা খেয়েছে। এখন ফেং শুই পড়াবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়ে দিয়েছে, ফেং শুই পড়াবে।

এর পরে আসবে রেইকি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের এক সচিব এ'কথা আমাকে বলেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে খবরটায় 'দম' ছিল। তা'হলে হ্যারিসের পিছনে শুধু দেশের বৃহত্তম পত্রিকাগোষ্ঠী নেই। তারও পিছনে বি জে পি, ভি এইচ পি আছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পত্রিকাগোষ্ঠীর গাঁটছড়ার ঐতিহ্য এদেশে অতি প্রাচীন।

হ্যারিসের আগমন-বার্তায় কলকাতার রেইকিওয়ালারা খুব খুশি। ধস নামা বাজার আবার উঠবে। কলকাতার প্রায় চ্যানেল-ই জ্যোতিষ, তন্ত্র, ফেং শুই ও রেইকি নির্ভর। ওদের টাকায় চ্যানেল মাজা সোজা রেখেছে। যুক্তিবাদীরা ওইসব বুজরুকদের একটা করে ধরে, অমনি মার্কেটে ধস নামে। চ্যানেলওয়ালাদের বুকে গুড়গুড়িয়ে ভয় নামে। হ্যারিসের খবরে ওরাও দারুণ উল্লসিত।

আরে বাবা, এতো আর এলেবেলে বাংলা পত্রিকার খবর নয়। এ'হল খোদ সাহেবদের ভাষায় লেখা জবরদস্ত পত্রিকার খবর। অতএব 'বুজরুকি' বলে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ইংরেজি খবরের কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে, বাঙালি হীনম্মন্যতাবোধকে বে-আব্রু করা। কলকাতার সভ্রান্ত মানুষগুলো 'ছ্যা-ছ্যা' করবেন।

ক্লাইভ হ্যারিস বিষয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। হ্যারিস এলেবেলে নন। তাঁর নামে একটা বিশাল সংস্থা গড়ে উঠেছে। 'দ্য ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন'। ঠিকানা ঃ বক্স ২৩। ৬৪-৪১০ সাইরাকো, পোল্যান্ড। ফাউন্ডেশনের সম্পত্তির পরিমাণ ৬০ হাজার কোটি স্টারলিং পাউন্ড। ভারতীয় টাকায় পরিমাণটা বুঝতে ৬০,০০০ কোটিকে ৭২ দিয়ে গুণ করতে হবে।

কী? মাথা ঘুরছে? আমাদের চিন্তার দৌড় টাটা, বিড়লা, আম্বানি পর্যন্ত। এদের সব্বাইকে বান্ডিল করলেও হ্যারিস ফাউন্ডেশনকে ছোঁয়া যাবে না। এমন ধনীর হাত বিশাল লম্বা হবে—এটা এখন শিশুও বোঝে। হ্যারিসের ভারত পর্যটনের পরিকল্পনার বিশালতা বুঝতে গেলে দু-একটি তথ্যই যথেষ্ট। ভারতের বিশাল পত্রিকাগোষ্ঠী হ্যারিসকে স্পনসর করতে এগিয়ে এসেছে। গড়ে উঠেছে একটি সংস্থা 'হ্যারিস এশিয়া ফাউন্ডেশন'। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ মেহতা মহল, ১৫ মাথুর রোড, অপেরা হাউজ, মুম্বাই। cliveharrisasia @ indiatimes.com হল e-mail যোগাযোগের ঠিকানা।

রোগী দেখতে হ্যারিস সাহেব কোনও ফি নেন না। তবে ডোনেশন দিতে হয় অন্তত দু'হাজার টাকা। মুম্বাইতে ৪০ হাজার রোগী দেখেছেন। অসাধারণ সাফল্য এসেছে। এমনটাই শুনেছি।

২ সেপ্টেম্বর ২০০৩। দক্ষিণ কলকাতায় সাদার্ন প্লাজায় আমন্ত্রিত সাংবাদিকদের এমনই সব তথ্য দিচ্ছিলেন 'হ্যারিস এশিয়া' ও 'ইন্ডিয়া টাইমস'-এর প্রতিনিধিরা। অসাধারণ টিমওয়ার্ক। যেসব সাংবাদিকরা ওঁদের কাছে 'পিওর ফর সিওর' নন, তাঁদের কাছে ওঁরা বিনয়ের সুখতলা। অনুরোধ—একটু দেখবেন। 'দেখা-দেখি'র হিসেবটা অনেক জায়গায় নাকি ব্রহ্মাস্ত্র। শুনছিলাম, দেখছিলাম, বোঝার চেষ্টা

করছিলাম। আমার উপরও নজর ছিল সাংবাদিক বন্ধুদের। এমন পরিস্থিতিতে আমার হাজির থাকা মানেই খবর তৈরির সম্ভাবনা।

ভারতের বিজনেস ক্যাপিট্যাল মুম্বাইতে রেইকি সাহেব ৪০ হাজার রোগী দেখেছেন, আমরা জেনেছি। কিন্তু একজন 'আমআদমি' হিসেবে আরও কিছু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। হচ্ছে না বলে এটাকে আমাদের অধিকারও বলতে পারি। মুম্বাইতে কী ডোনেশনের সর্বনিম্ন পরিমাণ ২ হাজারে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল? মনে হয় না। ৫-১০ হাজার না করে কলকাতার লেভেলে নামিয়ে আনলে ওঁদের দস্তুর মতো অসম্মান করা হয়। যদি ধরে নিই মুম্বাইয়ের রোগীরা ২ হাজার টাকা করে দিয়েছেন, তা হলেও হ্যারিস সাহেব রোজগার করেছেন কম করে ৮ কোটি টাকা। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে একটি টাকাও ট্যাক্স না দিয়ে পুরোটাই পকেটে পুরেছেন। ধুর্ততার সঙ্গে নিজের রোজগার 'দ্য ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন'-এর নামে দেখিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের পাওয়া ডোনেশন। অতএব আয়কর দেবার প্রশ্ন নেই। আমাদের দেশ থেকে এভাবে লুটে নিয়ে চলে যাবে, আর আমাদের দেশের সরকার নিদ্রা যাবে? এইসব বুজরুক অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে কড়া আইন আছে—'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪'। ব্যবস্থা নিতে পারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। অলৌকিক চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হয় কি না, এটা আদৌ আইনের বিবেচনার বিষয় নয়। কেউ এই ধরনের প্রচার করলে প্রচারক। প্রকাশক ও অলৌকিক চিকিৎসক দু-জনেই একই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি পাবে। আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। প্রয়োগ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রয়োগ করবে, এমন মাজার জোর কোনও সরকারের-ই নেই। এইসব মাজা ভাঙা খাজা সরকারকে মান্য করেই আমাদের চলতে হবে। আমাদের মানে—আপনার আমার মতো 'আমআদমি'কে।

২ সেপ্টেম্বর, ২০০৩, মঙ্গলবার, দুপুর ১১টা ৩০ মিনিট। আমরা এখন সাদার্ন প্লাজার চারতলায়। আঙুলে গোনা কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের মধ্যে একমাত্র ই টিভির টিম হাজির। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুরের এপিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কিছু ছাত্র আমাদের সমিতির সদস্য। প্রণব দত্তের নেতৃত্বে তাদের কয়েকজন ছদ্ম সাংবাদিক হিসেবে ঢুকে পড়েছিল। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল দুটি প্রধান ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের কাজকর্মের উপর নজর রাখা। আমার সঙ্গী দুজন। একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র গৌতম রায়। গৌতম সাইনাসের রোগী। এক্সরের রিপোর্ট ও প্লেট, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সবই সঙ্গে

আছে। দ্বিতীয়জন রানাপ্রতাপ হাজরা। এপিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, সাত বছর বয়স থেকে তোতলামিতে ভুগছে। ওর সঙ্গে আছে ই এন টি স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্ট।

আজকের অনুষ্ঠান-সূচি নিয়ে গতকাল রাত পর্যন্ত চলেছে অনেক চোর-পুলিশ খেলা। কয়েকটি প্রচারমাধ্যম শেষ মুহূর্তে জেনেছে রেইকি সাহেবের কর্মসূচি। মুম্বাইতে রেইকি সাহেব বসেছিলেন হেঁকে-ডেকে। মাফিয়ার স্বর্গরাজ্যে বুক ফুলিয়ে। কলকাতায় এমন চুপসে কেন? কোন্ জুজুর ভয়ে? সে জুজু যুক্তিবাদী সমিতি নয় তো? কলকাতায় আসার আগে প্রাথমিক হোম ওয়ার্কে বসলে এমন ভয় স্বাভাবিক। অন্তত যাঁদের ভরসায় আসা, তাঁরা কিন্তু আমাদের ভালোই চেনেন।

আমি চারতলায় পা দেওয়ার আগেই সেল ফোনে খবরটা পেয়েছি—আমার ছবিসহ ভিজিটিং কার্ড ব্যবস্থাপকদের এক প্রতিনিধির হাতে তুলে দিয়েছেন এক সাংবাদিক। বিষয়টা আমার কাছে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। অথচ ওই সাংবাদিক-ই দু'দিনে বহুবার আমাকে ফোন করেছেন। জানতে চেয়েছেন, আমি যাচ্ছি কি না? কীভাবে অ্যাকশন করব? ইত্যাদি অনেক কিছু। এও জানিয়েছেন, আমি বললে তিনি একজন হাত ভাঙা রোগী নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর কথা শুনলে মনে হতে পারে, হ্যারিসের বুজরুকি ধরতে তিনি উত্তেজনায় ফুটছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে মিডিয়ার সঙ্গে ঘর করছি। অভিজ্ঞতা অনেক কিছু শিখিয়েছে। বোধ বলল—এটা ফাঁদ হতেই পারে। সুস্থ মানুষের হাতে প্লাস্টার করিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ওই রোগীকে আমার স্বীকৃতি নিয়ে একবার হাজির করতে পারলেই কেল্লা ফতে। রেইকির পর হাতের এক্সরে করালে প্রমাণিত হবে, হাতের হাড় আর ভাঙা নেই। পরের দিনই প্রথম পৃষ্ঠার খবর হবে—"পৃথিবী কাঁপানো যুক্তিবাদী সমিতি হ্যারিসের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে হার মানল।"

সাংবাদিকদের খুশি করতে হ্যারিস ও ইন্ডিয়া টাইমস-এর তরফ থেকে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকরা একজন করে রোগী আনতে পারবেন। নো ফি। নো ডোনেশন। হ্যারিসের সিডিউল এই—১১-৩০ থেকে ১২ পর্যন্ত সাংবাদিকদের রোগী দেখবেন। ১২টা থেকে সাংবাদিক সম্মেলন। ৩ তারিখ থেকে ৬ তারিখ গোর্কি সদনে রোগী দেখবেন।

দুই সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্যে গৌতম রায় ও রানাপ্রতাপ হাজরার নাম রোগী হিসেবে নথিভুক্ত করিয়েছি। আমার নামও নথিভুক্ত করিয়েছি। রোগটা ব্লাডসুগার। কতকালই 'ব্লাড পি পি' করিয়েছি। রিপোর্ট আমার পকেটে।

আমার ছবিসহ ভিজিটিং কার্ড হ্যারিস অ্যান্ড কোম্পানির হাতে। আমি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে হাজির হলাম। হাত ভাঙা রোগী আনতে চাওয়া সাংবাদিক ছটফট করছেন। তিনি স্বভাব ছটফটে বলে ইতিপূর্বে কখনই আমার মনে হয়নি। তিনি এগোলেন এক ব্যবস্থাপকের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগোল কড়া নজর রাখা ছেলেটি। সাংবাদিক পিছোলেন। কারণ তিনি বোধহয় বুঝে গেছেন, নজর রাখা হয়েছে। তিনি মোবাইল খুললেন। কথা বলা হল না। পাশে কড়া মার্কিং। শেষে এটুকু বলি—আমার শরীরী ভাষা কাউন্টারের মানুষদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, আমি যুক্তিবাদী প্রবীর নই। বিভ্রান্ত করার কৌশল ফাঁস করতে চাই না, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমার কাছের মানুষরা জানেন। এটা প্রয়োজন। এতেই খুশি।

বিশাল ফ্ল্যাটের দরজায় ও দেয়ালে নানা পোস্টার। কোনওটায় নীরব থাকার অনুরোধ, কোনওটায় মোবাইল ফোনের সুইচ অফ রাখার কঠোর নির্দেশ। ভিতর দিকের একটা হলে সাংবাদিক সম্মেলন হবে। সামনের হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকরা। ইতিউতি ফিসফিস। একটা দরজা বন্ধ ঘরের সামনে উর্দি পরা স্মার্ট গার্ড। ও-ঘরেই আছেন হ্যারিস। 'মেহেতা টাইমস'-এর এক কর্মকর্তা ঠিক করে দিচ্ছিলেন, কার পর কে ও-ঘরে ঢুকবেন। গৌতমের সুযোগ মিলল। ঢুকতে ও বের হতে মিনিট দেড়-দুই বড় জোর। আমি আর রানাপ্রতাপই শেষ। আমার ডাক পড়তে রানাকেও ডেকে নিলাম। দুজনে একসঙ্গে ঢুকলাম। দুটো চেয়ার পাতা। ঘরে কোনও আসবাব নেই। আমি ও রানা বসলাম। আমি যে সাংবাদিক, সে কথা কর্মকর্তাটি জানিয়ে দিয়ে গেলেন হ্যারিসকে। আমার অনুরোধে রানাকে প্রথম শুরু করলেন। রোগটা কী জেনে নিলেন। 'তোতলামো' শোনার পর হ্যারিসের দু'হাতের আঙুল রানার গলা কপাল ও মাথায় নৃত্য করতে লাগল। রানাকে শেষ করে আমাকে ধরলেন। আমার পেট থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর আঙুলগুলো খেলা করে বেড়াতে লাগল। আমাকে সময় দিলেন এক মিনিটের বেশি। সাংবাদিক বলে হয়তো খাতিরটা বেশি।

আমাকে শেষ, আমার শুরু। হ্যারিসকে বললাম, "আমার একটা অনুরোধ। প্রচারের এমন সুযোগ ছাড়বেন না। আমাকে রেইকি করছেন, এটা আজকের টিভি আর কালকের পত্রিকায় বেরিয়ে গেলে ভালো প্রচার পাবেন। কারণ, আমি তো 'আমআদমি' নই। আমি সাংবাদিক।

আমার কথাটা সাহেব ও কর্মকর্তার মাথায় ধরল। দু'জন এ নিয়ে কী করবেন যখন আলোচনা করছেন, তখন আবার মুখ খুললাম, "শুধু ফোটোগ্রাফারদের ডেকে আনছি।"

বেরিয়ে গেলাম। ডেকে নিলাম শুধু ফটোগ্রাফারদের। আমার অনুরোধে হ্যারিস প্রথমে রানাকে, পরে আমাকে রেইকি দিলেন। প্রচুর ছবি উঠল।

ফোটো সেশন শেষ করে হ্যারিস ঘর ছেড়ে বের হলেন। ঢুকলেন পাশের ছোট হল ঘরে। শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন, প্রশ্ন করলেন ই টি ভি-র পারিজাত। প্রায় একাই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে হ্যারিস জানালেন, শতকরা ৮৭ ভাগ রোগীকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন। হ্যাঁ, তার মধ্যে ক্যানসার, লিউকোমিয়া, ম্যানিনজাইটিস ম্যালেরিয়া, এডস রোগীও আছেন। পারিজাতের আরও একটি প্রশ্ন ছিল, কত দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন? হ্যারিসের দ্বিধাহীন উত্তর—কয়েক সেকেন্ড থেকে দু-এক মিনিটের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে যান।

গৌতমকে ডেকে হ্যারিসের পাশে দাঁড়াতে বললাম। গৌতমকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যে সব সময় প্রবল মাথা ব্যথা অনুভব কর, সেটা কি এখন কিছুটা কমেছে?"

—"না। একই রকম আছে।"

গৌতমের এক্সরে ফিল্ম ও রিপোর্ট দেখিয়ে বললাম, "এটা দু-এক দিন আগের রিপোর্ট। আমরা আজই 'রায়-ত্রিবেদী' এবং 'সুরক্ষা' থেকে এক্সরে করাতে পারি। সেই রিপোর্ট আমাদের বুঝিয়ে দেবে রেইকির পর গৌতমের সাইনাস প্রবলেম একই আছে, না কমেছে, অথবা সেরে গেছে।"

"আসুন রানা।" রানাকে ডেকে নিলাম।

পারিজাত-ই রানাকে প্রশ্নটা করলেন, "আপনি কী সুস্থ হয়ে গেছেন?" রানা জানালেন, তিনি সামান্যতম উন্নতি অনুভব করছেন না। রানার কথাও সেটাই বুঝিয়ে দিল।

রানার 'হাতে গরম' উদাহরণ সাংবাদিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে দিল। শুধু একটি পত্রিকার দুই সাংবাদিককে দেখা গেল 'প্যাঁচা পানা মুখ খানা' করে শেষ পঙ্‌ক্তির দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আগামীকাল আমার ব্লাড পি পি টেস্ট করাব। টেস্ট রিপোর্টই বলে দেবে। ক্লাইভ হ্যারিস ব্লাডসুগার আদৌ কমাতে পারেন কি না?"

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ক্লাইভ হ্যারিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলাম, "পড়ুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জানান। খুব খুশি হব যদি চিঠিটি জোরে জোরে পড়েন।"

হ্যারিস জোরে পড়া শুরু করলেন। প্রথম প্যারার পর-ই তার মুখে সাইলেন্সার। উত্তেজনায় টগবগে সাংবাদিকদের হাতে ধরিয়ে দিলাম চিঠির প্রতিলিপি। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে লেখা হয়েছে :—

To
Mr. Clive Haris

Dial-(033)25590435
e-mail-prabir_rationalist@hotmail.com
Date : 2 Sep. 2003

Dear Sir,

As per your claim that you can cure diseases as critical as Cancer with the magic of touch with your hand. We have also heard that you have cured many patients including the 1st stage AIDS patients belonging to many overseas countries.

Sir, we have a few patients suffering from critical or minor diseases. We therefore request you to kindly consider them and sort out their problems with your miraculous touch.

If you prove to be successful then our association will pay you an amount of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty lakhs) and free advertisment will be provided in favour of you by the members of our association.

It is expected that you will accept our challenge and prove yourself. And if you fail to do so then it will be proved that you are a fraud and misguiding the common people.

With Thanks.

(Prabir Ghosh)
General Secretary
(Science and Rationalists' Association of India)

সরল চিঠি। মিস্টার ক্লাইভ হ্যারিস। তোমার দাবি, তুমি কঠিন ক্যানসারও হাতের জাদু ছোঁয়ায় ঠিক করতে পার। শুনেছি, অনেক রোগীকে সুস্থ করেছ। প্রথম অবস্থায় এড্‌স রোগী এলেও সুস্থ কর। আমাদের কাছে কিছু রোগী আছে। অনুরোধ, তোমার অলৌকিক স্পর্শে তাদের সমস্যা মেটাও। তুমি কৃতকার্য হলে প্রণামী দেব ২০ লক্ষ টাকা। আমাদের সমিতির সদস্যরা তোমার হয়ে প্রচারে নামবে। আশা করছি তুমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে ও তোমার ক্ষমতা প্রমাণ করবে। তোমার অক্ষমতা এটাই প্রমাণ করবে, তুমি একজন প্রতারক এবং সাধারণ

বেরিয়ে গেলাম। ডেকে নিলাম শুধু ফটোগ্রাফারদের। আমার অনুরোধে হ্যারিস প্রথমে রানাকে, পরে আমাকে রেইকি দিলেন। প্রচুর ছবি উঠল।

ফোটো সেশন শেষ করে হ্যারিস ঘর ছেড়ে বের হলেন। ঢুকলেন পাশের ছোট হল ঘরে। শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন, প্রশ্ন করলেন ই টি ভি-র পারিজাত। প্রায় একাই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে হ্যারিস জানালেন, শতকরা ৮৭ ভাগ রোগীকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন। হ্যাঁ, তার মধ্যে ক্যানসার, লিউকোমিয়া, ম্যানিনজাইটিস ম্যালেরিয়া, এডস রোগীও আছেন। পারিজাতের আরও একটি প্রশ্ন ছিল, কত দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন? হ্যারিসের দ্বিধাহীন উত্তর—কয়েক সেকেন্ড থেকে দু-এক মিনিটের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে যান।

গৌতমকে ডেকে হ্যারিসের পাশে দাঁড়াতে বললাম। গৌতমকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যে সব সময় প্রবল মাথা ব্যথা অনুভব কর, সেটা কি এখন কিছুটা কমেছে?"

—"না। একই রকম আছে।"

গৌতমের এক্সরে ফিল্ম ও রিপোর্ট দেখিয়ে বললাম, "এটা দু-এক দিন আগের রিপোর্ট। আমরা আজই 'রায়-ত্রিবেদী' এবং 'সুরক্ষা' থেকে এক্সরে করাতে পারি। সেই রিপোর্ট আমাদের বুঝিয়ে দেবে রেইকির পর গৌতমের সাইনাস প্রবলেম একই আছে, না কমেছে, অথবা সেরে গেছে।"

"আসুন রানা।" রানাকে ডেকে নিলাম।

পারিজাত-ই রানাকে প্রশ্নটা করলেন, "আপনি কী সুস্থ হয়ে গেছেন?" রানা জানালেন, তিনি সামান্যতম উন্নতি অনুভব করছেন না। রানার কথাও সেটাই বুঝিয়ে দিল।

রানার 'হাতে গরম' উদাহরণ সাংবাদিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে দিল। শুধু একটি পত্রিকার দুই সাংবাদিককে দেখা গেল 'প্যাঁচা পানা মুখ খানা' করে শেষ পঙ্‌ক্তির দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আগামীকাল আমার ব্লাড পি পি টেস্ট করাব। টেস্ট রিপোর্টই বলে দেবে। ক্লাইভ হ্যারিস ব্লাডসুগার আদৌ কমাতে পারেন কি না?"

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ক্লাইভ হ্যারিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলাম, "পড়ুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জানান। খুব খুশি হব যদি চিঠিটি জোরে জোরে পড়েন।"

হ্যারিস জোরে পড়া শুরু করলেন। প্রথম প্যারার পর-ই তার মুখে সাইলেন্সার। উত্তেজনায় টগবগে সাংবাদিকদের হাতে ধরিয়ে দিলাম চিঠির প্রতিলিপি। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে লেখা হয়েছে :—

To
Mr. Clive Haris

Dial-(033)25590435
e-mail-prabir_rationalist@hotmail.com
Date : 2 Sep. 2003

Dear Sir,

As per your claim that you can cure diseases as critical as Cancer with the magic of touch with your hand. We have also heard that you have cured many patients including the 1st stage AIDS patients belonging to many overseas countries.

Sir, we have a few patients suffering from critical or minor diseases. We therefore request you to kindly consider them and sort out their problems with your miraculous touch.

If you prove to be successful then our association will pay you an amount of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty lakhs) and free advertisment will be provided in favour of you by the members of our association.

It is expected that you will accept our challenge and prove yourself. And if you fail to do so then it will be proved that you are a fraud and misguiding the common people.

With Thanks,

(Prabir Ghosh)
General Secretary
(Science and Rationalists' Association of India)

সরল চিঠি। মিস্টার ক্লাইভ হ্যারিস। তোমার দাবি, তুমি কঠিন ক্যানসারও হাতের জাদু ছোঁয়ায় ঠিক করতে পার। শুনেছি, অনেক রোগীকে সুস্থ করেছ। প্রথম অবস্থায় এড্‌স রোগী এলেও সুস্থ কর। আমাদের কাছে কিছু রোগী আছে। অনুরোধ, তোমার অলৌকিক স্পর্শে তাদের সমস্যা মেটাও। তুমি কৃতকার্য হলে প্রণামী দেব ২০ লক্ষ টাকা। আমাদের সমিতির সদস্যরা তোমার হয়ে প্রচারে নামবে। আশা করছি তুমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে ও তোমার ক্ষমতা প্রমাণ করবে। তোমার অক্ষমতা এটাই প্রমাণ করবে, তুমি একজন প্রতারক এবং সাধারণ

মানুষকে বিভ্রান্ত করছ।

চিঠি পড়ে সায়েব রাগে কাঁপছেন। কাঁপারই কথা। যাঁর ঐশ্বর্যের কাছে দুনিয়া নতজানু, তাঁর কাছে এক তুচ্ছ বঙ্গভাষী....সহ্য হবে কেন? 'হ্যারিস' ব্র্যান্ডের সঙ্গে নাম জড়াতে যখন ভারতের পত্রিকা জগতের সম্রাট ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন হ্যারিসের সঙ্গে টক্কর দিতে এলে সহ্য হবে কেন?

ই টি ভি'র লোগো লাগানো বুম'টা পারিজাত এগিয়ে দিলেন হ্যারিসের সামনে, "আপনি কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন?"

"না। আমি বলিনি শতকরা একশো ভাগ রোগীকেই ঠিক করে দেব। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি না।"

বুম এবার আমার মুখের কাছে। বললাম, "১০ জন রোগী আনব। ৫ জনকে সুস্থ করে দিলেই হার মানব। ২০ লক্ষ টাকা দেব। কথা দিচ্ছি, হেরে গেলে যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।"

"মিস্টার হ্যারিস, আপনি তো শুনলেন। এ'বার গ্রহণ করছেন?" পারিজাতের প্রশ্ন।

জোর মাথা ঝাঁকালেন হ্যারিস। বুঝিয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপকদের একজন মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম?"

জানালাম, "প্রবীর ঘোষ।" ওই মহিলা মোবাইলে কাউকে জানালেন, প্রবীর ঘোষ এসে পড়েছে। এমন উত্তেজিত ভাবে বলছিলেন, যেন ডাকাত পড়েছে। ডাকাতের ঘরে ডাকাতি কী সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল?

"প্রবীরবাবু, উনি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না। আপনি কিছু বলবেন?" পারিজাতের প্রশ্ন।

"১০ জন রোগীর মধ্যে ৪ জনকে সুস্থ কলেই হার স্বীকার করে নেব।"

"হ্যারিস এবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সুবর্ণ সুযোগ আপনার কাছে।"

ধূর্ত হ্যারিস তাতেও রাজি নন। আমি ১০-এ ৩ এবং অবশেষে ২-এ পর্যন্ত নামলাম। অর্থাৎ ১০ জন রোগী দেব। ২ জনকে সুস্থ করে দিলেই হারবে যুক্তিবাদী সমিতি।

না, হ্যারিস তাতেও রাজি হলেন না। হ্যারিসকে উদ্ধার করতে ঝাঁপালেন ব্যবস্থাপকরা। এক মহিলা ও এক পুরুষ তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন—প্রমাণ চাইলে মুম্বাই থেকে রোগীদের চিঠি এনে দেখাতে পারেন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ক্যানসার রোগীও হ্যারিসের স্পর্শ চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন।

ই টি ভি-র ক্যামেরা এ'সব উত্তেজিত চিৎকার তৎপরতার সঙ্গে ধরে রাখছিল। আমাকে বলতেই হল—অমন চিঠি দেখিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। সাজানো

রোগীর চিঠি এনে দেখানো খুব সোজা। এই শহরটার নাম কলকাতা। এখানে এসে সব সাংবাদিকদের বোকা বানাবেন অথবা কিনে ফেলবেন ভাবলে ভুল করেছেন। সামান্য সততা থাকলে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। রোগী ও তাঁদের চিকিৎসকদের হাজির করে দেব।

হ্যারিস তখন উঠে দাঁড়িয়ে গুটিগুটি পায়ে সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে বাইরে

তলায় নামতেই অন্য সাংবাদিকদের সামনেই আক্রান্ত হলাম। আক্রমণটা খিস্তি-খেউড়ের। এক ইংরেজি পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিক 'শ'কার 'ব'কার তুলে বললেন, হ্যারিস রোজগার করছে তো আমার কেন জ্বালা ধরছে? আমার হিম্মত নেই, তাই নাকি রোজগার করছি না। অবতার সাজার মতো ক্ষমতা থাকলে আমিও নাকি লোক ঠকাতে নামতাম।

এই খেউড়ের মধ্যেই তলায় নেমে এসেছেন ব্যবস্থাপকদের দুই কেন্দ্রীয় নেতা, এক নারী ও এক পুরুষ। নারীটি মুখ নর্দমা করলেন। পুরুষটি চিৎকার করে হুমকি দিলেন, এঁদের ক্ষমতার সম্বন্ধে নাকি কোনও অনুমানই আমার নেই। আমার পিছনে ইনকাম ট্যাক্স লাগিয়ে দিয়ে 'লাইফ হেল' করে দেবেন। আমাকে জেলে পুরে ছাড়বেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বড়'দের শত্রুতা কী ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, তা আমি দীর্ঘ বছর ধরে দেখে আসছি। ওদের আঘাত হানলে ওরা নির্দয় প্রত্যাঘাত হানে। সে অতি ভয়ংকর নির্দয় প্রত্যাঘাত। বারবার চড়া মাশুল গুনতে হয়েছে আমাকে। তারপরও এইসব বুজরুকদের দেখলেই 'বোকা বুড়ো' বা 'পাগলা জগাই' হয়ে যাই। যত দিন আছি, এ'ভাবেই লড়ব। হয় মারব, নয় মরব। বোকা বলেই ফেললাম, "যা পারবেন, করবেন।"

সে দিন-ই 'ই.টিভি বাংলা' তাদের খবরে হ্যারিস-কিস্‌সা দেখাল। তাও আবার দীর্ঘ ৪ মিনিট ধরে। খবরে ৩০ সেকেন্ডই যখন যথেষ্ট, তখন ৪ মিনিট! যা যা ক্যামেরায় ধরেছিলেন, তার সব কিছু নিয়ে একটা কোলাজ।

সে রাতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন পেলাম শ'খানেক। সবই অভিনন্দন জানিয়ে। আপ্লুত হলাম।

আমজনতাকে সাথী পাওয়ার আনন্দ ও তৃপ্তিই আলাদা।

পরের দিনের 'আজকাল' ও 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর ছবিসহ প্রতিবেদন আমাদের কাছে বয়ে আনল খুশির হাওয়া। দুই ইংরেজি পত্রিকা একদম চুপ। তাদের যে ভূমিকা দেখেছি, তাতে এটা প্রত্যাশিত ছিল। এখন ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে প্রত্যাঘাতের প্রত্যাশায় আছি। প্রত্যাঘাত এলে আপনাদের সঙ্গে পাব—এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের সবাইকে আগাম সেলাম জানাই।

আজকাল

বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৬১ বুধবার ১৭ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩



স্পর্শে জাদু চিকিৎসা! মুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের সঙ্গে ক্লাইভ হ্যারিস। মঙ্গলবার। ছবি: রনি রায়

স্পর্শে নিরাময় : কানাডার ক্লাইভ রেগে আগুন যুক্তিবাদীর ওপর!

অমিতাভ সিরাজ: তাঁর পাঁচ আঙুলের ডগা তখন রোগীর ঘাড়ে-মাথায় নাচছে। তত্ত্বোধিক মৌন স্বয়ং চিকিৎসক। কথা বললে চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটে তাই। কানাডার ক্লাইভ হ্যারিস। মাত্র চার সেকেন্ডে যাবতীয় রোগের নিরাময় তাঁর স্পর্শের জাদুতে! এমনই দাবি ক্লাইভের। খেতকায় ড্যাম্বা-স্ট্রীড মানুষটি দুনিয়া ঘুরে এখন কলকাতায়। তাঁর সেই 'হিলিং টাচ' অর্থাৎ স্পর্শ-চিকিৎসা করতে গিয়ে সোমবার রীতিমত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন ক্লাইভ হ্যারিস। শেষমেশ। খেপেও ছেলেন যুক্তিবাদীদের ওপর। দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন প্লাজার চারতলায় একটি ফ্ল্যাটে এ দিন ক্লাইভ হ্যারিস চিকিৎসা করবেন বলে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। এনেছিলেন রোগীদের সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র গৌতম রায় এবং রানা প্রতাপ নামে আরও এক যুবক। ক্লাইভের দাবি, তাঁর স্পর্শ-চিকিৎসায় জ্বর, জ্বালা থেকে যক্ষ্মা, এইডস, এমনকি ক্যান্সারও সেরে যাবে। ক্লাইভ ইতিমধ্যে দুনিয়ায় ৪০ হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন এই পদ্ধতিতে। গোটা বিশ্বে তাঁর নিরাময় হওয়া রোগীর সংখ্যা ১২০ মিলিয়ন! ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন এই তথ্য জোগালেও যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষেরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বয়ং চিকিৎসককে বলেন, আমরা ১০ জন রোগীকে আনছি। আপনি প্রমাণ করুন সুস্থ হয়েছে। ২০ লাখ টাকা সাম্মানিক দেব। আমাদের সংগঠন ভেঙে দেব। না, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি ক্লাইভ হ্যারিস। টেন্টে রেগে গিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে বললেন। কিন্তু ক্লাইভের চিকিৎসা-ফি কত? রোগী পিছু ২০০০ টাকা। অবশ্যই 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে। তার জন্য সময়ে 'মাস হিলিং'। তখন কি লাগে না। জানালেন মেহতা চ্যারিটি ট্রাস্টের এক প্রতিনিধি। তাঁর ফাউন্ডেশন ৬০০ বিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ডের সম্পদের অধিকারী। পোল্যান্ডে জন্ম হলেও ক্লাইভ দীর্ঘদিন কানাডায় রয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাইভ নিজেই বললেন, সাংখ্যতত্ত্ব দিয়ে রোগ সেরেছে কি না বোঝা যাবে না। সব রোগের চিকিৎসা করি। আমি একশো ভাগ নিশ্চিত, সুস্থ হবেনই। কীভাবে? তার ব্যাখ্যা দিয়ে ক্লাইভ বোঝান, 'মানবশরীরে ১২০টি পয়েন্টে স্পর্শ করি। তাতেই ভাল হয়ে যায়।' যুক্তিবাদী নেতা প্রবীর ঘোষদের অভিযোগ, 'মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। এত টাকা দিয়ে যাঁরা চিকিৎসা করাচ্ছেন, তাঁরা সবাই সুস্থ হয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ উনি দেখাতে পারেননি।'

বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩, ১৭ ভাদ্র ১৪১০

সংবাদ প্রতিদিন

Periodicals Section
Book No.
Collected by Prasanta Ch.

শহরবাসীর পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়লেন প্রতারক সাহেব

কমলিকা মল্লিক

একেই বোধহয় বলে বাঙালির বুদ্ধি। না হলে, যে গল্প মুম্বইতে শো-এর পর শো হাউস ফুল হল। কলকাতায় এসে প্রথম দিনেই সুপার ফ্লপ! পোল্যান্ডের দ্য 'ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশনের' কর্ণধার ক্লাইভ হ্যারিস সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। উদ্দেশ্য? তাঁর স্পর্শের জাদুতে কলকাতাবাসীকে বুদ্ধু বানানো। কিন্তু পারলেন না। রানাপ্রতাপ হাজরা, এ পি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইনস্ট্রুমেনটেশনের ছাত্র। শিশুকাল থেকেই তাঁর তোতলামির সমস্যা। ক্লাইভ অনেকক্ষণ ধরে হাত বোলালেন। মাথায় চাপ দিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। রানাপ্রতাপ বললেন, "আমি এতটুকুও ভাল হইনি।" অথচ ক্লাইভ হ্যারিস ও তাঁর সংস্থার দাবি, এই টাচ থেরাপি শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট এমনকী, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রোগী সুস্থ বোধ করবেন। কোথায় গেল প্রতিশ্রুতি?

মুণ্ডিত মস্তক, ত্বকে ঈষৎ গোলাপি আভা। পরনে কালো স্যুট। ক্লাইভ হ্যারিস ধীর পদক্ষেপে সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন। এসেছিলেন সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের জবাব দিতে। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে চুপসে গেল ক্লাইভের প্রচারের ফানুস। এঁদের পরিকল্পনা ছিল আগামী এক সপ্তাহ কলকাতাকে এই হিলিং থেরাপির মূর্ছনায় আচ্ছন্ন রাখবেন। রোগী প্রতি পারিশ্রমিক দু'হাজার টাকা। প্রতিদিন গড়ে অন্তত একশো জনের নাম রেজিস্ট্রেশন হবে। তার মানে অঙ্কটা কত হল? ওফ্, ভাবা যায়। রবীন্দ্র সরোবরের বিপরীতে সাদার্ন প্লাজাতে এইভাবেই নিঃশব্দে চলত কলকাতাবাসীর পকেট ফুটো করার গেমপ্ল্যান।

কথায় আছে না, বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ। তাই হল। বেশি



প্রচারের আলোয় আসতে গিয়ে ডাকলেন সাংবাদিকদের। প্রচারও হল। কিন্তু ফল হল উল্টো। আসলে একেই বোধহয় বলে খাল কেটে কুমির আনা। তাও আবার বাঙালি কুমির!

ছবি : সুব্রত দত্ত

আজকাল

বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৭১ শনিবার ২৭ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

প্রিয় সম্পাদক

বুজরুকবাবা!



রনি রায়

বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার অসতর্কতায় ক্লাইভ বাংলায় ব্রিটিশ রাজ কায়েম করতে সমর্থ হলেও, তাঁর জাতভাই নবতম ক্লাইভ কিন্তু এবার কলকাতা তথা বাংলায় বুজরুকি-রাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হল। ইংল্যান্ড নয়, এবারের ক্লাইভ এসেছিল কানাডা থেকে। তার হাতের স্পর্শেই নাকি সব রোগ ছুটে পালায়! এই নয়া বুজরুকিবাবাকে চ্যালেঞ্জ করেন প্রবীর ঘোষ-সহ যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। যুক্তিবন্দী হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ক্লাইভ হ্যারিস। ধরা পড়ে গেল স্পর্শ-বাবা। ধন্যবাদ জানাই যুক্তিবাদী কর্মীদের সচেতন প্রয়াসকে। কেন্দ্রীয় বি জে পি সরকার ও তার গৈরিক বাহিনী ভারত-সহ সারা বিশ্ব জুড়ে যে জ্যোতিষবিদ্যা ও গো-সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে ক্লাইভ হ্যারিসরা যে সুদূর কানাডা থেকে বুজরুকির কুড়ি নিয়ে ছুটে আসবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। ভবিষ্যতে শহর কলকাতায় এরা আরও আসবে নবরূপে, নব-নব সাজে। যেমন ক'দিন আগেই এসেছিলেন যোশিজি। তিনি শিক্ষায় জ্যোতিষবিদ্যার কারবারি হলেও, এসেছিলেন মন্ত্রীর বেশে। আদবানি-তোগাড়িয়ারাও ত্রিশূল-রথটথ নিয়ে মাঝেমধ্যে অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন এখানে। লাভ হয় না। আসলে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি', ওঁরা ভুলে যান। মহামতি গোখলে সাহেব বাংলাকে ঠিকই চিনেছিলেন। চিনতে পারেননি গেরুয়া নেতারা কিংবা ক্লাইভ হ্যারিসের মত বুজরুকিবাবারা। জাতটার মগজকে মন্দির-মসজিদের তলায় চাপা দেওয়া যায় না। জাতটার মেরুদণ্ডের বনিয়াদ অন্য। তাই তো বুজরুক ক্লাইভ কিংবা তথাগতবাবুরা বাংলার মাটিতে দাঁত বসাতে পারেন না। আমরা গর্বিত। আমরা সতর্ক।

বরণ কান্তি। তমলুক। পূর্ব মেদিনীপুর

'স্পর্শে নিরাময়'

(আজকাল সংবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর)

রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কত দূর সহনীয় ও স্বাস্থ্যকর? সুদূর কানাডা থেকে ক্লাইভ রাইস এখানে স্পর্শে বুজরুকির দিব্যি ব্যবসা (সংবাদ: স্পর্শে নিরাময়, ৩ সেপ্টেম্বর) খুলে ফেললেন এমনই গণতন্ত্রের প্রশ্রয়ে। করবেন না-ই বা কেন? এখানে জ্যোতিষ চলছে রমরমিয়ে। পাথর-মাদুলিতে ডান-বাম ভেদ নেই। নররূপে তাই রেইকি (এও স্পর্শ-চিকিৎসা), ফেংশুই (এর স্পর্শে গৃহে কল্যাণ আসে!) জাঁকিয়ে বসছে। ঘরে-ঘরে শুধু গোয়াল খোলবার অপেক্ষা। হ্যারিস-মাচানবাবাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারবেন রাজনীতিবিদ্‌রা? মোটেই না। এদিকে টনটনে জ্ঞান।

আসলে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা অনেক। আমাদের প্রশ্রয় না পেলে হ্যারিস/রেইকি/ফেংশুই আসে কী করে? যুক্তিবাদীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। এই দুর্দিনে তাঁরা বিবিধ গণতান্ত্রিক ক্ষতিকর প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ করছেন সাহসের সঙ্গে। আরও সাহস ও সহযোগিতার দরকার। এ-সব ব্যাপারে চিকিৎসকেরা কেন এগিয়ে আসছেন না? আই এম এ-র বক্তব্য কী? এ-সব ব্যাপার তো তাঁরা ভাল বোঝেন।

তুষারকুমার রায়। ফটকগোড়া। চন্দননগর। হুগলি

কলকাতার রেইকি সম্রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী মিত্রের মোবাইলে ফোনটা আমিই করেছিলাম। সময়টা হ্যারিস পদার্পণের বছর খানেক আগে। যাজ্ঞসেনী আমার নাম ও পরিচয় শুনে এতো ঘাবড়ে যাবেন, ভাবিনি। তবে সেটা সাময়িক। আমার সঙ্গে মিনিট দু'য়েক কথা বলে বোধহয় বুঝে নিলেন—লোকটা গাঁইয়া ও সরল। ভয়ের কিছু নেই। বরং অজগরের মতো একটু একটু করে গিলে ফেলা যায়।

আমাকে উদার আমন্ত্রণ জানালেন—গড়িয়াহাট নার্সিংহোমে আজই বিকেল সাড়ে চারটেয় চলে আসুন। অপেক্ষায় থাকব। কলেজে পড়তে আপনার লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর থেকেই আপনি আমার হিরো। আপনার ফোন পেয়ে প্রথমটা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

গেলাম। যাজ্ঞসেনী ও নার্সিংহোমের দুই পার্টনার তলা থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওপরে নিয়ে গেলেন। এই নার্সিংহোমে যাজ্ঞসেনী বসেন। রোগী দেখেন। যাজ্ঞসেনীর চেম্বারে বসেই কথা হচ্ছিল। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, যাজ্ঞসেনী তাঁর নামের আগে যে 'ডাক্তার' লেখেন, তার আইনি বৈধতা কতটুকু? অ্যালোপ্যাথি নার্সিংহোমে তাঁকে দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, নার্সিংহোম কি আইন ভাঙছে না? আমার প্রশ্নগুলোতে এতটাই নরম ছোঁয়া দিয়েছিলাম, যাতে তিনজনই মনে করেন, আমি শত্রু নই, শুভানুধ্যায়ী। তবু এমন প্রশ্ন যে তিনজনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

যাজ্ঞসেনী নিজের আকর্ষণী ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখেন। তিনিই অনুরোধ করলেন, তাঁর রেইকি ক্ষমতা একবার দেখে যেতে। আমার কোনও শারীরিক অসুবিধে আছে কি না, দেখতে একটা ফুল রেইকি দেবেন।

নিয়ে গেলেন অবজারভেশন চেম্বারে। ধবধবে বেড। আমাকে ঘড়ি থেকে সার্ট-টার্ট সব খুলে শুয়ে পড়তে বললেন। শরীরে কোনও বন্ধন থাকলে না কি রেইকি শক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। শুলাম। তবে ঘড়ি ও সার্ট খুলে, প্যান্টের কোমর ঢিলে করে।

মানব শরীরে মস্তিষ্ক থেকে মূলাধার চক্র পর্যন্ত নাকি সাতটি চক্র আছে। সাতটি চক্রের আবার একুশটি পয়েন্ট আছে। এই প্রতিটি পয়েন্ট যদি স্পর্শ করেন রেইকি বিশেষজ্ঞ, তবে তাকে বলে ফুল রেইকি। আমাকে ফুল রেইকি দিলেন কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। তারপর জানালেন, আমার যৌনক্ষমতা খুবই দুর্বল। সবল করতে বার কয়েক মিটিং দিতে হবে।

এখানে যাজ্ঞসেনীর রেইকি বিদ্যে ডাহা ফেল। যাজ্ঞীসেনী ভাবতেই পারেননি, এমন অতিসক্ষম মানুষও থাকতে পারেন, যাঁর বিশেষ একজনের স্পর্শ ছাড়া ঘুম ভাঙে না। তবে এ'টা বুঝলাম, কিছু ম্যাসেজ পার্লারের মতোই রেইকি সেন্টারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

রেইকির ক্রেজ চলছে

রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসার একটা 'ক্রেজ' চলছে। মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতের অনেক তারকাই রেইকি শিখছেন 'সেল্ফ রেইকি' করে অসুখ-বিসুখ ও বার্ধক্যকে দূরে রাখতে। মুম্বাই ও দিল্লির টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, টপ একজিকিউটিভরা 'সেল্ফ রেইকি'তে সময় দিচ্ছেন। এটা নাকি মেডিটেশনেরই এক উন্নত প্রয়োগ বিজ্ঞান। এতে নাকি মেন্টাল ও স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়। যাঁদের 'সেল্ফ রেইকি' শেখার মতো সময় নেই, তাঁরা রেইকি নিতে সেন্টার বা ইনস্টিটিউটগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন।

রেইকি মাস্টার, গ্রান্ড মাস্টাররা স্পর্শের দ্বারা তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন নতুন এক জগতে। আনন্দের জগতে। উত্তেজনার জগতে।

কলকাতায় রেইকি তেমনভাবে জাতে ওঠেনি। তবে কলকাতায় রেইকির হুজুগ শুরু হয়ে গেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় রেইকি শেখাবার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে প্রায়ই। পত্র-পত্রিকায় রেইকি নিয়ে ছবি-টবি সাজিয়ে প্রচার-সর্বস্ব বড়ো-বড়ো লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। 'ড্যাডি-মাম্মি'দের স্নেহচ্ছায়ায় রেইকি দ্রুত বাড়ছে।

রেইকি' এলো কোথা থেকে

কলকাতার অন্যতম রেইকি সুপারস্টার পারুল দত্তের কথায়, রেইকির উৎপত্তি এই ভারতবর্ষ। বশিষ্ট মুনি স্পর্শের মাধ্যমে অসুস্থদের সুস্থ করতেন। বুদ্ধদেবও স্পর্শ দ্বারা রোগ সারাতে পারতেন। এরপর রেইকি বিদ্যা বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যিশু রেইকি জানতেন। তাঁর ছোঁয়ায় কুষ্ঠ রোগীরাও ভালো হয়েছে। তারপর যা হয় ; মানুষ চর্চার অভাবে রেইকি চিকিৎসা প্রায় ভুলতে বসেছিল। নতুন করে রেইকিকে আধুনিক মানুষদের কাছে তুলে আনলেন জাপানি অধ্যাপক মিকাও উসুই। ২১ দিন ধরে ধ্যানযোগে থাকার পর তিনি রেইকি নতুন করে আবিষ্কার করলেন। মিকাও-এর শিষ্য-শিষ্যাদের হাত ঘুরে রেইকি একসময় ভারতে এলো। এখন রেইকি শেখাচ্ছেন অনেকেই। প্রায় সকলেই ফার্স্ট ডিগ্রি রেইকি শেখান এক বা দু'দিনে। তারপর চলে ২১ দিনের 'পিউরিফিকেশন পিরিয়ড'। তখন শিক্ষার্থীকে শুধু নিরামিষ খেতে হবে। মদ, সিগারেট এমনকি কফি পর্যন্ত চলবে না। তারপর আবার দু দিনের ডিগ্রি কোর্স। সঙ্গে শেখানো হয় কিছু মন্ত্র ও সিম্বল। রোগীকে ফুল বডি রেইকি দিতে লাগে ২১ মিনিট সময়। শরীরের সাতটি চক্রের ২১ পয়েন্ট রেইকি দেওয়াকে বলে ফুল বডি রেইকি। আমাদের কাছে ২১ সংখ্যাটা খুব পবিত্র।

কলকাতায় আর এক রেইকি সুপারস্টার কে. মুরলিধরন। তাঁর গল্পটা একটু

ডিটেলে। মিকাও উসুই ছিলেন জাপানের কয়োটা শহরের এক ক্রিশ্চান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট। এক রবিবার যিশুর প্রার্থনা শেষে এক ছাত্র মিকাও উসুইকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কী সত্যি বাইবেলের প্রতিটি কথায় বিশ্বাস করেন? উসুই উত্তর দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই। ছাত্রটি বলল, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে যিশু তাঁর হাতের ছোঁয়ায় রোগমুক্তি ঘটাতে পারতেন? উসুই বলেছিলেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি। ছাত্রটি বলেছিল, আপনি অন্ধভাবে যুক্তিহীন এ'সব কথায় বিশ্বাস করতেই পারেন। আপনার সে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমরা প্রমাণহীন একটা গল্পকথায় কীভাবে বিশ্বাস করব?

উসুইয়ের কাছে এমন যুক্তির বিরুদ্ধে বলার মতো কোনও উত্তর ছিল না। উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিয়ে পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। সেখানে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা শুরু করলেন। বিষয়—যিশু কীভাবে শুধুমাত্র স্পর্শ করে রোগ সারাতেন। কিন্তু সেই গবেষণা তাঁকে চূড়ান্ত প্রত্যয় দিতে পারল না। ফিরে এলেন জাপানে।

উসুই এবার বুদ্ধের উপর গবেষণার কাজে ঝুঁকলেন। কারণ বুদ্ধদেবও স্পর্শের দ্বারা রোগ সারাতে পারতেন। গবেষণার স্বার্থে চিনা ও সংস্কৃত ভাষা শিখলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিশ্রম সার্থক হল। বিভিন্ন পুথি থেকে নতুন করে আবিষ্কার কলেন স্পর্শ চিকিৎসার নানা সূত্র।

এসব সূত্রের প্রয়োগ শিখতে তিনি যোগ সাধনায় বসলেন। ২১ দিন যোগ সাধনার পর তাঁর বোধদয় হল। আকাশ থেকে নেমে এলো আলোর মালায় সাজানো সূত্র ব্যবহারের সংকেত। উসুই'য়ের স্পর্শ চিকিৎসার এই আবিষ্কারই অলৌকিকের অস্তিত্বের প্রমাণ। বলতে পারেন, রেইকি এক অলৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি। রেইকি প্রয়োগে সব অসুখ সারে। ফ্রম কমন কোল্ড টু ক্যানসার—এনি ডিজিজ। নো সার্জারি। নো মেডিসিন। শুধু রেইকি-ই পারে প্রতিটি কঠিন রোগের ক্ষেত্রে এমন মিরাকেল ঘটাতে। পুরুষ ও নারীর ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে রেইকি।

এই লেখকের মতোই যাঁরা মনে করেন অলৌকিক বলে কিছু নেই ; সবের পিছনেই রয়েছে লৌকিক কারণ—তাঁরা রেইকি মাস্টার গ্রান্ড মাস্টারদের নেড়ে চেড়ে দেখতে পারেন। খুলতে পারে পরতে পরতে রহস্যের ভাঁজ। আসলে রেইকি এলো অজ্ঞানতা থেকে অথবা ধূর্ততা থেকে।

রেইকি কী?

রেইকি শব্দটা জাপানি শব্দ যুগল। কথাটা আসলে 'রেই-কি'। ইংরেজি হরফে Rei-Ki লিখলে ঠিক হত। যদিও Reiki-ই আমাদের কাছে বহুল প্রচারিত। 'Rai'

শব্দের অর্থ 'universal', বাংলায় বলতে পারি মহাজাগতিক। 'Ki' শব্দের অর্থ 'vital life force energy' অথবা 'cosmic energy', বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রধান জীবনীশক্তি' অথবা 'মহাজাগতিক শক্তি'।

রেইকিতে বিশ্বাসীরা মনে করে, আমাদের শরীরে রয়েছে প্রধান সাতটি শক্তিচক্র। এই শক্তিচক্রগুলো নিরন্তন cosmic energy বা মহাজাগতিক রশ্মি আহরণ বা শোষণ করে চলেছে। আমরা যে সুস্থ থাকি, শক্তিতে ভরপুর থাকি, তার কারণ সাতটা শক্তিচক্রে মহাজাগতিক রশ্মির নিরন্তন প্রবাহ বা continious flow of energy। যখনই কোনও শক্তিচক্রে রশ্মির প্রবাহ ঠিকমত ঢুকতে পারে না, তখনই সেই বিশেষ শক্তিচক্রের সঙ্গে যুক্ত গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। যাঁরা রেইকি প্রয়োগ করতে জানেন, তাঁরা হাতের স্পর্শ দ্বারা রোগীর শক্তিচক্রে মহাজাগতিক রশ্মি প্রবাহ বাড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

এটা একটা ধারণা। এমন ধারণার পিছনে কোনও সত্য আছে কিনা, জানাটা অবশ্যই জরুরি। তা না হলে তো পাগলা দাশুর পাগলামোতেও বিশ্বাস রাখার মতো আহাম্মক হতে হয় আমাদের।

রেইকির কসমিক রে নিয়ে ধারণার সত্যাসত্য

'Cosmic energy' বা মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে রেইকির জ্ঞানটাই আগাপাশতলা ভুলে ভরা। Cosmic energy মানুষের শরীরে শোষিত হয় না। Cosmic energy থাকে cosmic ray-র ভিতর। Cosmic ray হল একটা electro magnative wave। এই wave-এর উৎপত্তি universe বা মহাজগৎ। Cosmic ray আমাদের চারপাশেই রয়েছে। আমার যে চা পান করছি, সেই চায়ের পেয়ালাকেও ঘিরে রয়েছে Cosmic ray ব electro magnative wave। Cosmic ray-র কোনও রং নেই।

অতএব আমাদের শরীরে সাতটি শক্তিচক্রের যদি বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকত (এ বিষয়ে পরে আমরা আলোচনায় যাব), তবুও শরীরের সেই শক্তিচক্রের Cosmic ray শোষণ করার কোনও প্রশ্নই উঠত না। শুধু এই কারণেই আমরা রেইকি তত্ত্বকে স্রেফ 'আবর্জনা' বলে বাতিল করতে পারি।

রেইকি এবং হাতের অলৌকিক খেলা

রেইকি শাস্ত্র বিশ্বাস করে, হাতে তালু হচ্ছে হৃদয়েরই প্রসারিত অঙ্গ। মহাবিশ্বের থেকে আসা কসমিক রে আমাদের শরীরে শোষিত হয়ে হাতের তালুতে এবং আঙুলগুলোতে জমা হয়। সেই হাত যদি রোগীর শরীরের নানা শক্তিচক্রে আলতো

ভাবে রাখা যায় তাহলে হাতের তালু থেকে কসমিক রে সরাসরি শক্তিচক্রের মধ্যে দিয়ে রোগীর শরীরে ঢুকে পড়ে। এতে কসমিক রে বা কসমিক এনার্জির ফ্লো আবার ঠিকমতো হতে শুরু করে। ফলে রোগীও সুস্থ হয়ে ওঠে।

রেইকির আরো কয়েকটি জরুরি তত্ত্ব হল ঃ (১) শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার একমাত্র কারণ শরীরের কোনও শক্তিচক্রে কসমিক এনার্জি প্রবাহের ঘাটতি, তা সে যে রোগই হোক না কেন। (২) কসমিক এনার্জি হাতের তালুতে এসে জমা হয়। (৩) রেইকি মাস্টাররা তাঁদের হাতের আঙুল রোগীর শক্তিচক্রে ছোঁয়ালে কসমিক এনার্জির ফ্লো রেইকি মাস্টারের হাত থেকে রোগীর শক্তিচক্রে সঞ্চারিত হয়।

ভেবে দেখি আসুন

একসময় ভাবা হত পাপ থেকেই রোগ। এখন এক নতুন ভাবনা এসেছে— রোগে কারণ ভাইরাস নয়। কারণ হল শক্তিচক্রে কসমিক এনার্জি প্রবাহের ঘাটতি, তা সে যে রোগ-ই হোক না কেন।

কিন্তু কসমিক এনার্জির সঙ্গে রোগের সম্পর্ক কী? তাত্ত্বিকভাবে রেইকি শাস্ত্র তা যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে হাজির করতে পারেনি। কসমিক এনার্জির ফ্লোর ঘাটতিকে রোগের একমাত্র কারণ বলে ধরে নিলে জীবাণু থেকে অসুখ হয়, এই তত্ত্বকে বাতিল করতে হয়। রেইকিতে বিশ্বাস রাখলে 'অ্যানথ্রাকস জীবাণু ছড়ানো সম্ভব'— এমন সম্ভাবনাকে এক ফুঁ-য়ে বাতিল করতে হয়। বাতিল করতে হয় জীবাণু-যুদ্ধের তত্ত্বকে।

আরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে। রেইকির তত্ত্ব সত্যি হলে জীবাণু থেকে আদৌ কী রোগ হওয়া সম্ভব?

রেইকির শক্তিচক্র

"হিন্দুশাস্ত্রে বলে মানব শরীরে সাতটি চক্র আছে। এই সাতটি চক্র কোনও না কোনও গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সাতটি চক্র দিয়ে কসমিক এনার্জি শরীরে ঢোকে এবং প্রবাহিত হয়।"—এটা রেইকি সুপারস্টার পুতুল রায়ের কথা।

আরও দুই সুপারস্টার পারুল দত্ত, কে. মুরলীধরণ এবং স্টার রেইকি মাস্টার ডাঃ যাজ্ঞসেনী মিত্রের মূল বক্তব্য একই। ওঁরাও মনে করেন, হিন্দু যোগ দর্শনে মানবদেহের অ্যানাটমি বিশ্লেষণে শরীরে সাতটি চক্রের অবস্থান ও তাদের কাজকর্ম নিয়ে যা বলা হয়েছে, রেইকি সেই কথাই বলে।

রেইকির বিশ্বাস অনুসারে চক্রগুলো ও তার কাজকর্ম ঃ

(১) সহস্রচক্র (Crown chakra) ঃ এটি মস্তিষ্কের উপরিভাগ, ডান চোখ ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্পিরিচুয়ালিটি বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নেয়।
অবস্থান ঃ মস্তিষ্কে।

(২) আজ্ঞাচক্র (Third Eye chakra) ঃ নার্ভাস সিস্টেমকে পরিচালিত করে। ইনটিউসান পাওয়ার বা বিশেষ অনুমান ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কারক।
অবস্থান ঃ ভ্রু-যুগলের মধ্যে।

(৩) বিশুদ্ধ চক্র (Throat chakra) ঃ গলা, ফুসফুস, থাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষমতা ও সেল্ফ এক্সপ্রেশনের নিয়ন্তা।
অবস্থান ঃ কণ্ঠে।

(৪) অনাহত চক্র (Heart chakra) ঃ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, সার্কুলেটারি সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদি চিন্তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। সুকোমল বিষয়গুলোকে এই চক্র পরিচালিত করে।
অবস্থান ঃ বক্ষের মধ্যস্থলে।

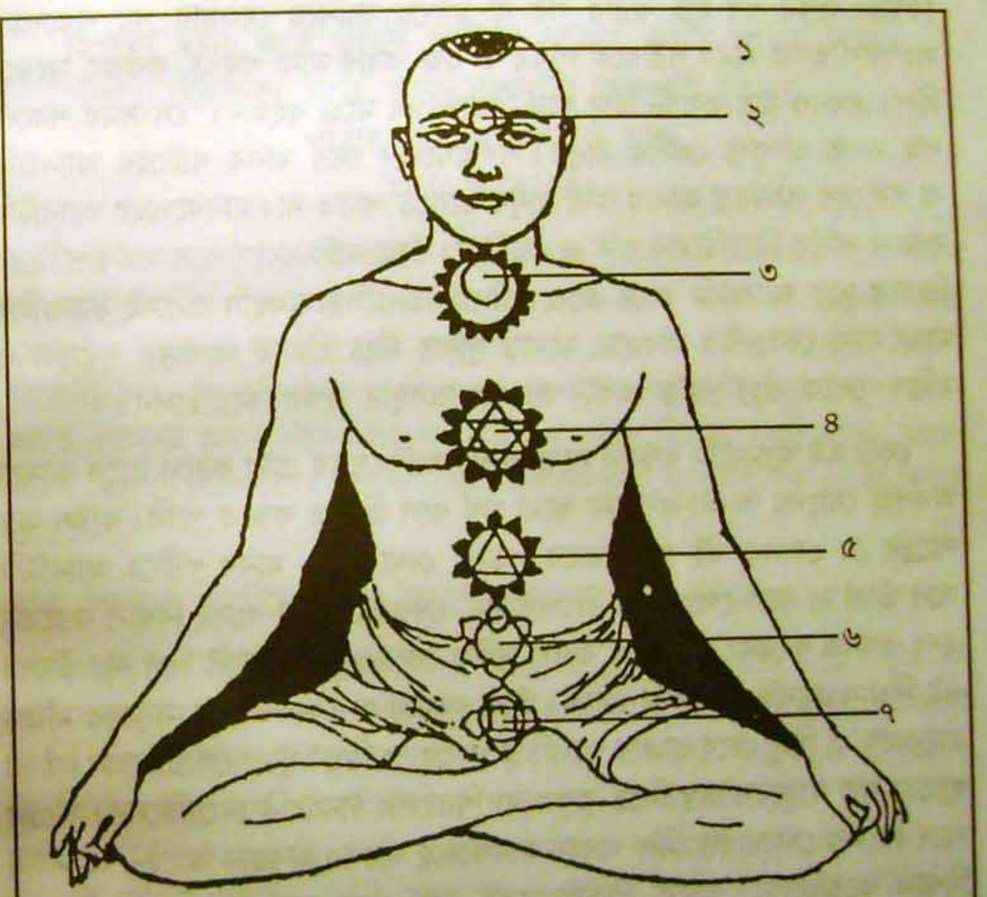
(৫) মণিপুর চক্র (Solar Plexus chakra) ঃ পাকস্থলী, যকৃত, গলব্লাডার ইত্যাদি পরিপাক তন্ত্রের কাজ দেখাশোনা করে। এটি ক্ষমতা ও জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ চক্র।
অবস্থান ঃ বক্ষ ও নাভির মাঝামাঝি।

(৬) অধিষ্ঠান চক্র (Sacral chakra) ঃ এটি জননতন্ত্রের কাজ দেখাশোনা করে। নারী-পুরুষের ইনফার্টিলিটি, মাসিক ঋতু, যৌন ক্ষমতা, যৌন অনুভূতি ও আবেগকে পরিচালিত করে।
অবস্থান ঃ শরীরের যেখান থেকে যোনি ও লিঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে।

(৭) মূলাধার চক্র (Root chakra) ঃ এটি রেচনতন্ত্র অর্থাৎ কিডনি, ব্লাডার ও শিরদাঁড়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এই চক্র সৃষ্টি, সৃজনশীলতা ও শারীরিক সক্ষমতার উৎস।
অবস্থান ঃ গুহ্যে।

রেইকি, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের চক্র চিন্তায় মিল-অমিল

হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বাস করে, মানুষের শরীরের ভিতরে রয়েছে ছ'টা চক্র, মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম কুঁড়ি। আর রয়েছে একটা সাপ। এই চক্রগুলো ও সাপকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। কুঁড়ির ওপর ফণা মেলে রয়েছে সাপ। ফণা মেলে থাকার জন্যই নাকি পদ্ম কুঁড়ি হাজার পাঁপড়ি মেলে ফুটে উঠতে পারছে না। অন্তত এমনটাই বিশ্বাস করে তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র। শরীরের ভিতরে অবস্থান করা এই সাপটির লেজ রয়েছে গুহ্যে।



রেইকির শক্তিচক্র

যোগ সাধনা বা তন্ত্র সাধনা হল একটা প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে চিন্তাকে একটু একটু করে তলার থেকে একটার পর একটা চক্র ভেদ করে ওপরে ওঠানো যায়। 'ষটচক্র' বা ছটি চক্র ভেদ করে মনকে সহস্রচক্রে নিয়ে যেতে পারলে সাপ তার ফণা গুটিয়ে নেয়। তারপর মস্তিষ্কের পদ্ম কুঁড়ি হাজারটা পাঁপড়ি মেলে ফুটে ওঠে। এই পদ্ম ফুটলে নাকি ঘটে ব্রহ্ম দর্শন, ঘটে যোগ সিদ্ধি। পতঞ্জলি তাঁর সূত্রে বলেছেন, এই সিদ্ধির ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান লাভ করা যায়,

আকাশে ভ্রমণ করা যায়, অন্যের দেহে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, ইষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। তন্ত্রের বিশ্বাস ছটি চক্রে ও হাজার পাঁপড়ির পদ্মে অবস্থান করছেন নানা দেব-দেবী।

এমন বিজ্ঞান বিরোধী বোকা-বোকা কথায় কেউ যদি বিশ্বাস করে, করতেই পারে। তাদের আমরা 'বোকা' বলতেই পারি। অথবা একটু শোভন করে 'সহজ-সরল' বলতে পারি।

একটা সময় মানুষের কাছে মানুষের দেহ ছিল পরম বিস্ময়। এক অজানা বিস্ময়। তখন শব দাহ করার পর বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর শবদেহের সংস্পর্শে আসা মানব শরীরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করার নানা পদ্ধতি, প্রকরণ, সংস্কার ছিল। এখনও যার তলানি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে বহমান। সে সময় শবদেহ দাহ করত অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ। শবব্যবচ্ছেদ করে মানব শরীরের অ্যানাটমি বা শরীরের গঠনতন্ত্র জানার কথা মানুষ ভাবতে পারত না। মানবদেহের অ্যানাটমি বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঋষি ও যোগীরা। তাঁরা নাকি যোগ বলে মানব শরীরের ভিতরে ঢুকে অ্যানাটমি দেখে এসে, শরীরে চক্রগুলির অবস্থান ও সেই চক্রগুলির মধ্যে নানা দেবদেবীর অবস্থান, মাথার খুলির নীচে হাজার পাপড়ির পদ্মফুল ও মস্তিষ্ক থেকে গুহ্য পর্যন্ত একটা সাপের অবস্থান বর্ণনা করেছিলেন।

কেউ এই অ্যানাটমি বর্ণনার মধ্যে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে তাকে আমরা অবশ্যই যোগের অ-আ-ক-খ না জানা মূর্খ বলে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ তন্ত্র শাস্ত্রের যে কোনও বই গভীরভাবে পড়লে দেখা যাবে, মানব শরীরে অ্যানাটমি বলে তাঁরা যা বলে গেছেন বা লিখেছিলেন, সেগুলো সত্যি বলেই বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন। এর মধ্যে রূপক সৃষ্টির কোনও চেষ্টা আদৌ ছিল না। তাঁদের এই বিশ্বাস এসেছিল অজ্ঞতা থেকে। তাঁরা হয়তো বা কোনওভাবে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা ঘিলু দেখে হাজার পাপড়ির পদ্মের 'অস্তিত্ব' খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো মৃত মানুষের অন্ত্র নিয়ে কুকুর বা শিয়ালের টানাটানি দেখেছিলেন। অন্ত্রের সঙ্গে সাপের চেহারাগত মিল থাকায় মানবদেহে সাপের অবস্থান আছে—এমনটাই বিশ্বাস করেছিলেন। অথবা শিড়দাঁড়াকেই সাপ বলে মনে করেছিলেন।

'যোগ' দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে মানবদেহের সম্পূর্ণ ভুল অ্যানাটমি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। নারী-পুরুষের দীর্ঘ দেহ মিলনের মধ্যে দিয়ে মোক্ষ বা সাধনসিদ্ধি ঘটার অদ্ভুতুড়ে কল্পনা তন্ত্রে আছে। তন্ত্র মানুষকে চূড়ান্ত যৌনভোগের নেশা ধরাতে পারে, কিন্তু কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে না।

বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে সামান্যতম আলোচনার আগে বলে নেওয়া ভালো, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে ভাগ হল। 'হীনযান' ও 'মহাযান'। হীনযানপন্থীরা বুদ্ধের

পঞ্চশীল বা পাঁচটা নীতিতে বিশ্বাস নিয়ে রইলেন। 'মহাযান' হিন্দুতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। মহাযান-ই নিয়ে এলো বৌদ্ধতন্ত্র। বৌদ্ধতন্ত্রে মানব শরীরে চক্রের অবস্থানের কথা আছে। বৌদ্ধতন্ত্র বিশ্বাস করে মানুষের শরীরের ভিতর তিনটি চক্র আছে। চক্রগুলো হল—নাভিমূলে 'নির্মাণচক্র', হৃৎপিণ্ডে 'ধর্মচক্র' ও গ্রীবার নীচে 'সম্ভোগচক্র'। খুলির নীচে রয়েছে উষ্ণীষকমল বা পদ্ম।

হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মহাযানপন্থীরাই ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে মানুষের শরীরে চক্রের ও সাপের উপস্থিতিতে বিশ্বাস করে। আর কোনও ধর্ম এমন অদ্ভুতুড়ে চিন্তাকে আমল দেয়নি। চক্র নিয়ে হিন্দু ও মহাযানপন্থীদের মধ্যে বিবাদও প্রবল।

হিন্দুরা মনে করে মানব শরীরে চক্রের মোট সংখ্যা সাত।
বৌদ্ধরা মনে করে সংখ্যাটা অবশ্যই তিন।
খুলির নীচের পদ্মকে চক্র
মনে করে না।

রেইকি কেন হিন্দুদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করল? বৌদ্ধদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করল না কেন? শরীর বিজ্ঞানের অ্যানাটমির জ্ঞানকে গ্রহণ করল না কেন? উত্তর বোধহয়—"আমরা যা খুশি তাই ভাবব। তাতে কার কী বলার আছে?" বিজ্ঞান বিরোধী, সত্য বিরোধী কথা বলার মতো পাগল, অথবা কূটবুদ্ধির মানুষ যেমন আছে, তেমনই আছে এইসব আবোল-তাবোল কথায় বিশ্বাস করার মতো 'সহজ-সরল' মানুষ। শিক্ষিতদের মধ্যেও এমন 'সহজ-সরল' মানুষের খুব একটা অভাব নেই।

জড় পদার্থে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে পরে রেইকি

রেইকি মাস্টার থেকে গ্রান্ডমাস্টার অনেকেই রেইকির ক্ষমতা নিয়ে অদ্ভুত সব দাবি করেন। রেইকি শক্তির সাহায্যে তালা খোলা যায়, পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার পরও শুধু রেইকি শক্তির জোরে গাড়ি চালানো যায়, খারাপ টেপ, খারাপ ট্রানজিস্টার চালু রাখা যায়, ব্যাটারিকে চার্জ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কলকাতার রেইকি মাস্টারদের কেউ কেউ এইসব ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন।

এই দাবির বিরুদ্ধে একটা জোরালো পালটা দাবি রাখছি। ওপরে উল্লিখিত দাবির কোনও একটি প্রকাশ্যে আমার ও সাংবাদিকদের সামনে দেখাতে পারলে দেব ২০ লক্ষ টাকা।

আমজনতার কাছে একটি জরুরি অনুরোধ—আপনারা রেইকি-দিদিমনি ও দাদাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে ওঁরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অথবা রেইকির পক্ষে মিথ্যে প্রচার বন্ধে বাধ্য হয়।

জড় পদার্থের ওপর শক্তি প্রয়োগ সম্ভব বলে মনে করে পরমনোবিদ্যা অর্থাৎ Parapshychology নামের একটি অদ্ভুত শাস্ত্র। স্পষ্ট বলে রাখা ভালো—পরামনোবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার কোনও সম্পর্ক নেই; যেমনটি নেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের

সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্পর্ক। পরামনোবিদ্যা স্পষ্টই বিজ্ঞান বিরোধী নানা চিন্তার ডাস্টবিন।

পরামনোবিদ্যা নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের বলা হয় পরামনোবিজ্ঞানী বা Parasychologist. পরামনোবিজ্ঞানীদের কাজ হল লোককে বোকা বানানো, অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আজেবাজে বোঝানো ও প্রতারিত করা।

পরামনোবিজ্ঞানীরা দাবি করে থাকে—জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব। তারা এই ধরনের শক্তি প্রয়োগের নাম দিয়েছে psycho-kinesis বা Pk।

চিন্তা হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ফল। চিন্তার ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে, ব্লাড সুগার বাড়তে পারে, স্ট্রোক হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, মাথা ধরতে পারে, মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ অর্থাৎ psycho-somaic disease হতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা কোনও ভাবেই জড় কোনও কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানসিক শক্তি দিয়ে নিজের নিজের শরীর-মনের অনেক কিছুকে প্রভাবিত করতে পারলেও এই শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি, চুম্বক শক্তি বা শব্দ শক্তির মতো কোনও শক্তি নয়।

জড় পদার্থের উপর রেইকির শক্তি প্রয়োগের দাবি একেবারে অসার বা ডাহা মিথ্যে।

রেইকির থার্ড-আই ও সিক্সথ-সেন্স

রেইকি আরও অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক কিছুই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং দাবি করে। রেইকির সাহায্যে নাকি তৃতীয় চোখ বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতায় অনেক কিছুই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। একজন মানুষকে দেখেই নাকি মানুষটির শরীরের বিভিন্ন অসুখ ও মানসিক স্বভাবের হদিশ পাওয়া যায়। বিখ্যাত একটি বাংলা পাক্ষিকের সাংবাদিক কলকাতার এক রেইকি স্টার ডাঃ মুরলিধরণ সম্পর্কে লিখেছেন, প্রথম দেখার পর মুরলিধরণ বললেন, "আজ আপনাকে প্রথম দেখছি। আপনার নাম ছাড়া কিছুই আমি জানি না। তবু আপনার শরীরের ভিতরটায় কী অসুস্থতা আছে তার কিছুটা আমি জানি। যেমন, আপনার মাথার ডানদিকে একটা সমস্যা আছে। সম্ভবত মাইগ্রেন জাতীয় যন্ত্রণায় আপনি মাঝে-মধ্যেই কাতর হন। এ-ছাড়া আপনার প্রবলেম প্যানক্রিয়াস এবং লিভারে। একটা ব্যথা, মাঝেমধ্যেই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যায়। তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিন। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুটোই ওষুধ খেলে সেরে যেতে পারে। যাইহোক, এবার বলুন ঠিক বললাম কি না? ভদ্রলোকের টানা কথায় আমি যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেলুম। বললুম, প্রায় ঠিকই বলেছেন। এই দুটোই আমার সমস্যা।"

পরামনোবিদ্যার পরিভাষায় এই ধরনের ক্ষমতাকে বলে 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' (clairvoyance)। এমন ক্ষমতার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এ শুধুই কল্পনা নির্ভর এক অলীক চিন্তা। অথবা মিথ্যে প্রচারের মিথ। নিরপেক্ষভাবে ডাঃ মুরলিধরণের এই ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে আগ্রহী। মুরলিধরণ পরীক্ষায় মানতে রাজি আছেন কি?

ফোটো রেইকি

ফোটো সম্মোহনের দাবিদার তান্ত্রিক গৌতম ভারতী ও হাওড়ার জানবাড়ির পীর যেমন ফোটো সম্মোহনে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুশকিল আসানের স্বপ্ন ফেরি করত, তেমনই আর এক ধরনের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রেইকি মাস্টাররা। ওঁরা দাবি করেন, দিল্লি, মুম্বাই বা লন্ডন বসেও কলকাতার রোগীকে রেইকির সাহায্যে সারিয়ে তোলা সম্ভব। স্পর্শ ছাড়াই দূর থেকে কসমিক এনার্জি রোগীর শক্তিচক্রে ট্রান্সফার করার বিজ্ঞান নাকি রেইকির আয়ত্তে।

এ'সবই গল্পের গরু গাছে ওঠার মতো বোকা বোকা বিশ্বাস।

রেইকি দিয়ে কি অসুখ সারানো যায় না?

রেইকিতে শুধুমাত্র সে'সব অসুখই সারতে পারে, যেগুলো মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ। আমাদের শরীরের অনেক অসুখই মানসিক কারণে হতে পারে। মানসিক কারণে যে সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে—ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, হাঁপানি, মাথায় যন্ত্রণা, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, বাত, শরীরের কোনও অংশে অবশতা, কামশীতলতা, পুরুষত্বহীনতা, পেটের গোলমাল, বুক ধড়ফড়, ক্লান্তি, অবসাদ, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, কাশি, মাসিক ঋতু জনিত অসুস্থতা ইত্যাদি অনেক কিছুই। নামি ডাক্তার দ্বারা ঔষধি মূল্যহীন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকসন ইত্যাদি প্রয়োগে মানসিক কারণে শারীরিক অসুখের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' Placebo। কথার অর্থ হল, 'I will please'। বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি, 'আমি খুশি করব'। ভাবানুবাদ করলে হওয়া উচিত, 'আমি সেরে উঠব'। 'প্লাসিবো'তে সেরে ওঠার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ওপর রোগীর বিশ্বাসই আসল কথা।

কোনও সাইকো-সোমাটিক ডিজিজের পেসেন্ট রেইকি, তেলপড়া বা জলপড়া ইত্যাদিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী হলে রেইকি, তেলপড়া বা জলপড়ায় ভালো হয়ে উঠতেই পারে। এই সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে কিন্তু রেইকি থেকে জলপড়ার মত কোনও কিছুর অবদান একেবারে শূন্য। এখানে রোগীর বিশ্বাসই একমাত্র ফ্যাক্টর বা গুণ। রোগীর অন্ধ-বিশ্বাস না থাকলে রেইকির মতো অন্ধ-বিশ্বাস নির্ভর বুজরুকির সাধ্য নেই রোগ মুক্তি ঘটায়। সাধ্য থাকলে ২০ লক্ষ টাকার ছুঁড়ে দেওয়া

চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দেব তিনজন রোগী। দেব ৬ মাস সময়। সারিয়ে তুলতেই পারলেই ২০ লক্ষ টাকা। না পারলে বা রোগীদের ওই রোগেই মৃত্যু হলে দায়িত্ব নিতে হবে রেইকি চিকিৎসককে। অথবা ইনফার্টিলিটি আছে এমন নারী তুলে দেব। তাঁকে ১ বছরে সন্তানসম্ভবা করতে পারলে হেরে যাব চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত দেখালে প্রমাণ করে দেবই—রেইকি বুজরুকি চিকিৎসা ব-ই কিছুই নয়। নেহাৎ আকাট বোকা না হলে এই চ্যালেঞ্জ ওদের পেশার কেউ গ্রহণ করবে না। কারণ ওঁরা খুব ভালোরকম জানেন—ভাইরাস ধ্বংস করার ক্ষমতা রেইকির নেই। তাই ভাইরাস থেকে হওয়া অসুখ সারাবার চ্যালেঞ্জ নেওয়া মানেই ভরাডুবি।

রেইকি ও সম্মোহনের মিল-অমিল

রেইকির সঙ্গে সম্মোহনের বা hypnotism-এর কিছুটা মিল আছে। আবার অমিলও আছে। সম্মোহনের বেলায় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে ধারণা সঞ্চারিত করে অর্থাৎ suggestion পাঠিয়ে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকেই প্রভাবিত করা যেতে পারে। রেইকি মাস্টাররাও আসলে রোগীর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে কিছু ধারণা পাঠাতে থাকেন। যদিও তাঁরা মনে করেন, বা বলেন, স্পর্শের দ্বারা রোগীর চক্রগুলোতে কসমিক এনার্জি সঞ্চারিত করছেন।

রেইকি ও সম্মোহনের পরিবেশগত মিল

রেইকি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ রোগীকে আবিষ্ট করে রাখার মতো করেই তৈরি। হালকা আলো, মৃদু বাজনা, ধূপের গন্ধ। দুধসাদা ফরাস পাতা। মিকাও উসুই-এর ছবি আর কিছু রেইকি মুদ্রার নামে হিজিবিজি ছবি দেওয়ালে সুন্দরভাবে প্লেস করা। উসুই-এর ছবির তলায় পিতলের সুদৃশ্য প্রদীপ অথবা বিদেশী মোম। প্রদীপ বা মোমের শিখা নিষ্কম্প—এয়ার কন্ডিশনারের কল্যাণে।

এই পরিবেশ সম্মোহনের পক্ষে আদর্শ। রোগী ধবধবে সাদা ফরাসে শুয়ে পড়েন, মাথার তলায় সাদা ঢাকনা পরানো বালিশ। রেইকি মাস্টার এসে চোখের সামনে বসলেন। সফল রেইকি মাস্টার মানেই সৌম্যদর্শন পুরুষ বা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না সুন্দরী। দু'চোখ বন্ধ করলেন। প্রণামের ভঙ্গিতে দু-হাত জড়ো করলেন নিজের বুকের সামনে। এইভাবেই থাকলেন দু-পাঁচ মিনিট। স্বপ্নময় পরিবেশে এ'সব দেখতে দেখতে রোগীর ঘোর লেগে যায়।

রেইকি মাস্টার তাঁর দশটা আঙুল ছোঁয়ালেন রোগীর কপালে। অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত এক শান্তি। অথবা উত্তেজনার শান্তি। কিংবা নেশার বিস্ফোরণ।

এমন অবস্থায় রেইকি মাস্টার যদি suggestion দিতে থাকেন, "আমার আঙুল থেকে কসমিক এনার্জি আপনার চক্র দিয়ে শরীরে ঢুকছে। আমার হাতে স্পর্শ যেখানে রয়েছে, সেখানটা একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে...."। এমন সাজেশন শুনে রোগীর মনে হতেই পারে তালুর স্পর্শে শরীর উত্তপ্ত হচ্ছে। এটা শুধুই মনে হওয়া। রেইকি মানসিকভাবে একজন রোগীকে উদ্দীপিত করতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। কিন্তু তারপরও আমাদের দেশের চিকিৎসকরা নানা ল্যাব থেকে নানা রকমের পরীক্ষা করিয়েও কখনও-সখনও রোগটিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারেন না। এই অক্ষমতার পিছনে ল্যাব বা ডাক্তারের গাফিলতি বা অন্য বহুতর কারণ থাকতে পারে। এটা অ্যালাপ্যাথি চিকিৎসার একটা সমস্যা। কিন্তু এটা রেইকির কাছে কোনও সমস্যাই নয়।

যেখানে রোগ ঠিকমতো চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না, সেখানে রেইকি 'ফুল বডি ট্রিটমেন্ট' করে। 'ফুল বডি ট্রিটমেন্ট' মানে শরীরের সাতটি চক্রের ২১টি পয়েন্ট স্পর্শ করে রেইকির সাহায্যে কসমিক রে নাকি পাঠানো হয়। একে রেইকি চার্জও বলে।

কোনও কোনও রোগী বিশেষ চক্রের স্পর্শে চার্জড হতেই পারেন। স্পর্শকাতর চক্রগুলোর বিপরীত লিঙ্গের কর স্পর্শে উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এই বিশাল সম্ভাবনাই আয়ের একটা দিক খুলে দিতে পারে, যেটা অবশ্যই অন্ধকার একটা দিক।

সম্মোহন চিকিৎসা কখনও সব রোগ সারিয়ে তোলার দাবি করে না। মানসিক বা শারীরিক কারণে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে সম্মোহনকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ডিসট্যান্ট হিলিং-এ অমিল

রেইকি মাস্টারদের দাবি—বহুদূর থেকেও রেইকি দেওয়া সম্ভব। এবং তাতে খুব ভালো কাজও হয়। রোগও সারে। এই ডিসট্যান্ট হিলিং-এর জন্য কোনও স্পর্শ বা ফোন জাতীয় কোনও মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

কোনও বাচ্চা হয়তো লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু পরীক্ষা হয়ে গেলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে। সেই বাচ্চার মা যদি রেইকি শিখে নেন, তাতে তিনি বাড়িতে বসেই ডিসট্যান্ট হিলিং দিয়ে বাচ্চার নার্ভাসনেসকে কাটিয়ে তুলতে পারেন।

একজনের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে suggestion বা ধারণা সঞ্চারিত করতে পারা না পারার উপর সম্মোহনের কার্যকারিতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। চিন্তার বা brain-এ

যেহেতু কোনও বা তরঙ্গ নেই, তাই এই suggestion বা ধারণা চিন্তাতরঙ্গের সাহায্যে একজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। বহু দূরে বসে সম্মোহন করতে হলে suggestion পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, সে মাধ্যম ফোন, রেডিও বা টেলিভিশন হতে পারে।

রেইকির 'ডিসট্যান্ট হিলিং' তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে চিন্তা তরঙ্গের থিওরির ওপর। শব্দ ও আলোক তরঙ্গের কথা বিজ্ঞান জানে। শব্দ ও আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও আলোক দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে।

যেহেতু চিন্তা তরঙ্গে অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, তাই এই চিন্তা তরঙ্গ ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র। চিন্তা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ফল। অতএব এ'কথা আমরা দ্বিধাহীন বলতে পারি যে, রেইকি চিন্তা শক্তির তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকা 'ডিসট্যান্ট হিলিং' শেষ পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান-বিরোধী তত্ত্ব।

উপসংহার

রেইকি নিয়ে এতক্ষণের পর আমরা নিশ্চিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই যে—রেইকি একটা হুজুগ। আগাপাশতলা বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার আজগুবি তত্ত্ব। আজগুবি অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে লোককে আজেবাজে বোঝানোর কুচেষ্টা। রেইকির প্রচার ও প্রসার বন্ধ হওয়া উচিত। স্পর্শ দ্বারা রোগ সারাবার সোচ্চার দাবি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিটি প্রচার করার সঙ্গে রেইকি মাস্টার ও প্রচার মাধ্যমগুলো ভাঙছে The Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act. 1954.

সরকার আর কতদিন নীরব থেকে রেইকিওয়ালাদের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবে?

রেইকিওয়ালাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রক

২২ জুন ২০০৩ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়ে দিল—রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁরা নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্পষ্ট করে এ'কথাও জানিয়েছে—ম্যাগনেটোথেরাপি, অ্যারোমা থেরাপি, জেম থেরাপি, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিই বে-আইনি এবং এইসব তথাকথিত চিকিৎসকরা কোনওভাবেই নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন না।

ভালো সিদ্ধান্ত। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আমরা প্রয়োগ দেখতে চাই। আমরা চাই, এইসব বে-আইনি ডাক্তার ও তাদের প্রচারের আলোয় তুলে ধরা চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

Personal Diary
Book No.
Collected by Prasanta

লক্ষ্মী মূর্তি কালী হলেন আপন খেয়ালে

খবরটা পেলাম ২২ অক্টোবর ২০০২। খবরটা দিলেন ই টি ভি'র সাংবাদিক দীপালি মিত্র। "প্রবীর দা, শুনেছেন, চেতলা রোডে'র একটা বাড়ির মাটির লক্ষ্মী প্রতিমা আপনা-আপনি কালী হয়ে গেছেন?"

"কালী হয়ে গেছেন মানে? প্যাঁচা কী শিব হয়ে গেছেন? আর লক্ষ্মী জিভ বের করে দিগম্বরী?"

"না তা নয়। তবে দুধে আলতা রং-এর লক্ষ্মীর মূর্তিটি না কী কালো হয়ে গেছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে।"

বললাম, "আজ তো যেতে পারছি না বোন। আজই আমি মালদায় রওনা হব। ওখান থেকে দিনাজপুর। অতএব মাপ করো।"

"কিছু অসুবিধে হবে না আপনার। আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছি।"

এড়াবার শেষ চেষ্টা করেও এড়াতে পারলাম না। তবু সময় যতটা সম্ভব বাঁচাতে বললাম, "আমি চান করেই রেডি হয়ে বেরচ্ছি। আপনাদের দেবীনিবাস পর্যন্ত আসতে হবে না। লেকটাউন ভি আই পি রোডের মোড়ে আমার গাড়ি থাকবে।"

লেকটাউন থেকে ই টি ভি'র গাড়িতে সওয়ার হলাম। সাংবাদিক দীপালি পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চির ঝক্‌ঝকে চেহারার তরুণী। সঙ্গে তরুণ ক্যামেরাম্যান অরিৎ বোস ও একজন লাইটম্যান। দীপালি জানতে চাইছিলেন, ঘটনাটা শোনার পর আমার কী মনে হচ্ছে? কীভাবে লক্ষ্মীর দুধে-আলতা রং কালো হল? ওরা কী রাতারাতি মূর্তিকে কালো রং করে দিয়েছে?

বললাম, "দেখিইনি, অতএব আন্দাজে কী বলি বল? আগে যাই। দেখি, তারপর মতামত দেব।"

ছোট্ট করে 'হোমওয়ার্ক' সেরে নিলাম। ই টি ভি নিউজ টিম যাবে তাঁদের মতো। ওঁরা ছবি তোলা, ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজ শুরু করে দেবেন। আমি ঢুকব মিনিট পাঁচ-দশ পরে।

চেতলা ব্রিজের কাছে 'লক্ষ্মী-কালী'র খবর জিজ্ঞেস করতেই রাস্তা বাতলে দিলেন স্থানীয় মানুষ। যত এগোচ্ছি, লোকের ভিড় বাড়ছে। প্রত্যেকেরই গন্তব্য পথই যে একই, বুঝতে অসুবিধে হল না। দ্রুত পায়ে চলা উত্তেজিত মানুষরাই আমাদের পথ চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

৮৫ নম্বর চেতলা রোড আর মিনিট চারেকের পথ—এটা শুনে গাড়ি থামিয়ে আমি নেমে পড়লাম। একা। আমার পরনে কালচে-নীল জিনসের পাঞ্জাবি। ঝুল প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে গোলা সিঁদুরের লম্বা টিপ। প্যান্টের রংও কালচে নীল। গাড়ি এগোল দীপালি, অরিৎদের নিয়ে।

৮৫ নম্বর চেতলা রোডে যখন পৌঁছলাম তখন বাড়ির সামনে কয়েকশো নারী-পুরুষের ভিড়। এলাকাটা ঘিঞ্জি, নিম্নবিত্তদের বাস। লাইন সামলাতে জনা কুড়ি-পঁচিশ কিশোর ও যুবক নেমে পড়েছে। অনেকের হাতে-ই ডান্ডা, মুখে চিৎকার। ওরা লাইন ছাড়া কাউকেই 'লক্ষ্মী-কালী'র বাসার দিকে এগোতে দিচ্ছে না।

কব্জিতে ১৪ ক্যারট গোল্ডের রিস্টওয়াচ, গলায় ঝোলানো মোবাইল, চোখে গোল্ড-প্লেটেড চশমা পরিহিত 'তান্ত্রিক' আমি ভলেন্টিয়ারদের মুখোমুখি হলাম। আমার শারীরী ভাষা যা বোঝাতে চাইছিল, তা বোঝাতে পেরেছিল। আমাকে সসম্ভ্রমে লক্ষ্মী-কালীর কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেতে কাড়া-কাড়ি লেগে গিয়েছিল বললে একটুও বাড়াবাড়ি করা হবে না।

একটা দশ বাই দশ ঘর। ঘরে এক কোণে হাত-খানেক লম্বা লক্ষ্মী-মূর্তি। মুখের রঙ কালো। ঘট-ফুল-মালা-চাঁদমালা—ধানের শিষের ভিড়ে মায়ের অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। ঘর তো নয়, যেন অফিস টাইমের ট্রেন কম্পার্টমেন্ট। মা লক্ষ্মীর সামনে একটা বড় কাঁসার থালা। তাতে উপছে পড়ছে খুচরো কয়েন, পাঁচ থেকে একশো টাকার নোট।

রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেছে। সোমবার মূর্তির বিসর্জন দেবার কথা। অভাবনীয় কারণে বিসর্জন হয়নি। বরং আজও পুজো চলছে। রবিবারের পুরোহিত তানু চক্রবর্তী পুজো করছিলেন। তবে এখন লক্ষ্মী ভাবে নয়, কালী হিসেবেই পুজো করছেন। ভিতরে ই টি ভি'র ক্যামেরা তখন ছবি তুলছে। শুনলাম, ঘণ্টা দু'য়েক আগে 'খাস খবর' ছবি তুলে গেছে। আলফা, আকাশবার্তাও নাকি এসেছিল। দৈনিক কাগজের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি কোনও পত্রিকাই নাকি বাকি নেই। সব্বাই ঘুরে গেছে।

দীপালির প্রশ্নের জবাবে গৃহকর্তা দীপ ঘোষ জানালেন, গত শুক্রবার বেহালার ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে সামনে থেকে মূর্তিটা কিনে এনেছেন। অনেক মূর্তিই ওখানে বিক্রি হয়েছিল। এই তল্লাটের মানুষরাই কিনেছেন। একই মাটি, একই রঙে তৈরি মূর্তি। কিন্তু আর কারও বাড়ির মূর্তি পুজোর পর, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর নিজে থেকে কালী হয়ে গেছে—আমরা শুনিনি। আপনারা সাংবাদিক, আর কোথাও এমনটা

ঘটলে নিশ্চয়ই খবর পেতেন। পেয়েছেন কী?"

দীপ সুন্দর গুছিয়ে কথা বলেন। হয় তো বেশ কিছু সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিতে দিতে বেশ তৈরি হয়ে গেছেন। দীপ রঙিন মাছের ব্যবসায়ী। পাশেই আর একটা আট বাই দশ ঘরে থাকেন দীপের দাদা সুদীপ। দু'জনেই জানালেন, এখন কালী মূর্তি হিসেবেই পুজো হচ্ছে। ঠাকুরের ইচ্ছে মেনেই হচ্ছে। পুরোহিত তানু চক্রবর্তীও মনে করেন—ঠাকুরের অপার লীলা। তিনি রং পালটে নির্দেশ দিয়েছেন কালী রূপে পুজো পেতে চান। প্রণামী ভালো-ই পড়ছে। প্রতি দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই থালা উপচে পড়ছে। থালা ফাঁকা করে আবার রাখছে মা'য়ের কাছে। পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে—জাগ্রত মা কালীকে বিসর্জন দেবেন না। প্রণামীর টাকাতেই মা'য়ের নিত্য সেবা হবে। মন্দির গড়ে তোলা হবে। পাড়ার ছেলেদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে ভক্তদের দেখাশোনার ভার। বিনিময়ে মা'র প্রণামী থেকে তাদের দেখভালের দায়িত্ব নেওয়া হবে।

স্বীকার করতেই হবে, পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানার ছাপ আছে তবে নতুনত্ব নেই। সব উপাসনা ধর্ম ব্যবসায়ীরা এভাবেই দিয়ে থুয়ে খায়। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, চাক্‌লা থেকে কচুয়া—সর্বত্র একই নিয়ম। ও'সব জায়গায় হিস্‌সা বা তোলা নেন রাজনীতিকরাও। চেতলার দেবী লক্ষ্মী-কালী তীর্থক্ষেত্রেও এ'সবেরে কোনও ব্যতিক্রম হবে না।

পুরোহিত তানু চক্রবর্তীকে বললাম, "বাবা তোমার দ্বারা হবে না। মন এক জায়গায়, মন্ত্র এক জায়গায়। মন না লাগিয়ে তোতা পাখির মতো মন্ত্র আউড়ে কিছুই হবে না। সরে এসো। আমার মা'কে একটু দেখি।

আমার কথা শুনে তানু চক্রবর্তী মন্ত্র পড়া থামিয়ে দিয়ে সসংকোচে সরে বসলেন। আমি লক্ষ্মী মূর্তির কাছে বসলাম। মিনিট খানেক কী মিনিট দুয়েক মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফুলের মালা, ফুলের স্তূপ, চাঁদ মালার ঘেরাটোপ থেকে মা'কে উদ্ধার করলাম। লক্ষ্মী-কালীর মূর্তি থেকে এ'সব যখন সরাচ্ছিলাম, তখন দীপের মা আমাকে বাধা দিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলাম, "আঃ চু-প।" উনি চুপ করে গিয়েছিলেন। এক ঘর দর্শক সব্বাই চুপ।

এখন লক্ষ্মী-কালীর গলা ও বাঁ হাত দেখা যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। গলায় ও হাতে কেউ যেন তুলি দিয়ে কালচে রঙ বুলিয়ে দিয়েছে। গলা ও হাতের যে অংশে তুলির পোচ লাগেনি, সেই অংশগুলোর রঙ দুধে-আলতা। তবে কি গোটা ব্যাপারটাই মোটা দাগের কারচুপি? অত্যন্ত সহজ-সরল চুরি? কালো রঙ তুলিতে নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে? হতেই পারে! আর এ'দিকে সব মিডিয়া কঠিন কঠিন কারণের কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে—

হাতেই পরে!

ই টি ভি'র লাইটম্যানকে বললাম, "ভাই, আলোটা খুব কাছ থেকে মায়ের উপর ফোকাস করো। অরিৎকে বললাম, "আপনি মায়ের ছবি তুলতে থাকুন। পরে বুঝবেন, যা তুললেন, তা এক বিরল ঘটনা।"

আগে থেকেই আমার সঙ্গে ই টি ভি টিমের বোঝাপড়া ছিল, ঘরে ঢোকার পর আমার নির্দেশ মতো কাজ করে যাবেন ওরা। অতএব লাইটম্যান মূর্তির ওপর আলো ফেলেই রইলেন। অরিৎ ছবি তুলতে লাগলেন।

আলোর ফোকাসিং আর ছবি তোলা শুরু হল। ছবি তোলা শুরু হবার ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে আমার ডান হাতের একটা আঙুল ঠাকুরের গালে রাখলাম। অমি যতক্ষণ না ছবি তোলা বন্ধ করতে বললাম, ততক্ষণ ছবি উঠছিল। মিনিট দশেক ছবি তোলার পর আমার মনে হল, মা লক্ষ্মী-কালী আরও গভীর কালো বর্ণ ধারণ করেছেন। অরিৎকে বললাম, "আমি মা'য়ের গাল থেকে এবার আঙুল সরাচ্ছি। ক্লোজ আপে ছবিটা তুলুন।"

আঙুলটা সরাতেই অবাক কাণ্ড! আঙুলের আড়ালে থাকা গালের অংশ হালকা কালো, বাকি গালে কে যেন আর এক পোচ গভীর কালি বুলিয়ে দিয়ে গেছে। আঙুলের আড়ালের কলাপে দু-অংশের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হাতের ও গলার কালো রং আরও কালো হয়েছে। গোলাপি অংশ গোলাপি-ই রয়ে গেছে।

আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এ'বার মুখ খোলার পালা। আমি ইশারা করতে দীপালি হাতের 'বুম'টা আমার মুখের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "সব দেখে আপনার কী মনে হল?"

গগলসের রুমাল দিয়ে কপালের গোলা সিঁদুর মুছে ফেলে বললাম, "মূর্তির গায়ে সিলভার নাইট্রেট কোটিং লাগানো হয়েছে। টিভি'র তীব্র আলো ও তাপ মূর্তির গায়ে ফেলতেই সিলভার নাইট্রেট বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই আরও বেশি করে কালো হয়েছে। সিলভার নাইট্রেট ব্যবহার করে এক ধরনের রোদ-চশমা তৈরি হয়। স্বচ্ছ কাচ রোদে কালো হয়ে যায়। তবে এই ধরনের রোদ-চশমা তৈরির সময় আরও অনেক জটিল প্রক্রিয়া থাকে। যার দরুন রোদে না থাকলে চশমার কাঁচ আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। ওই বিশেষ রোদ-চশমার কাচে এভাবে তীব্র আলো ফেললে একই ভাবে কালো হয়।"

আমার চোখের চশমাটা খুলে চশমার এক দিকের কাচের সামান্য অংশ দু'আঙুলে চেপে লাইটম্যানকে চশমার উপর আলো ফেলতে বললাম। ফেললেন। মিনিট পাঁচেক পরে আঙুলের আড়াল সরাতেই দেখা গেল—সেই একই ম্যাজিক। কাচের ঢেকে রাখা অংশ স্বচ্ছ। বাকি কাচ কালো।

দীপালি প্রশ্ন করলেন, "আপনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন যে একটা গোলমাল আছে?"

বললাম, "আমাকে যা দেখছেন, আমি তা নই। আমি তান্ত্রিক নই। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, যার চালু নাম 'যুক্তিবাদী সমিতি', আমি তার সাধারণ সম্পাদক। এসেছিলাম খোলা মনে সত্যানুসন্ধানে। সত্য খুঁজে পেয়েছি। আপনাদের হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখালাম যে, লক্ষ্মীর গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও ঈশ্বর মাহাত্ম্য নেই। হাজার হাজার মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসকে নিয়ে কোনও প্রতারক ছেলে-খেলা করছে। কিছু তরুণ সব কাজ ফেলে ভক্তদের ভিড় সামলানোর দায়িত্ব পালন করছিল—মহৎ কাজ ভেবে। এইসব ছেলেদের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে তাদের ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। দীপবাবুর উচিত এই ধাপ্পা এখুনি বন্ধ করা। মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া।"

পিন্ পড়লে তার শব্দ শোনা যায়, এমন অবস্থায় আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 'লক্ষ্মী-কালী' নিয়ে যে প্রবল ধর্মীয় আবেগের হাওয়া উঠছিল—তার অনেকটাই যে কেড়ে নিতে পেরেছি, বুঝতে অসুবিধে হল না। এও বুঝেছি আমার নামটা কারও কারও কাছে অপরিচিত নয়। দীপ ঘোষের কাছেও নয়।

স্তব্ধতা ভেঙে জড়তা নিয়ে ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন দীপ ঘোষের মা। তিনি আগোছালো ভাবে যা বললেন, তার মোদ্দা অর্থ হল—আমার কথা মেনে ঠাকুর বিসর্জন দেবেন না। দীপ প্রতারণা করেনি। সারা রাত ধরে নিজের চোখে ঠাকুরের রং পালটাতে দেখেছেন। আমি যা বলেছি, তা দিয়ে ঠাকুরের রং পালটানো যায়—এ'কথায় অবিশ্বাস করছেন না। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় যে রং পালটায়নি, এটা কি আমি প্রমাণ করতে পারব?

মা'র কথায় দীপ ও সুদীপ যেন কিছুটা জোর পেলেন। মা'র কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল তাঁদের মুখে।

আমি এবার সাফ জানালাম, "চেতলাতেই ন্যাশনাল টেস্ট হাউজ রয়েছে। মূর্তির গায়ের কালচে রং-এর একটু চেঁচে সেখানে আমরা দিয়ে আসি চলুন। আমি যাবো, আপনাদের পরিবারের দু-একজন যাবেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের মধ্যে থেকে দু-তিনজন যাবেন। ই টি ভি-র টিম যাবে। সেখানে টেস্ট করতে দিলে আমাদের প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে—সত্যিটা কী? অথবা ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা করালেও আমরা সত্যিটা জানতে পারব।"

আমার প্রস্তাব ঘরে পা রাখা ও উঁকি-ঝুঁকি মারা কিশোর-যুবকদের খুবই মনে ধরল। দীপ পরিবার যেন আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, তার জন্যে চাপ সৃষ্টি করল।

বুজরুকির সংকটে ঘোষ পরিবার এককাট্টা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আলাদা আলাদা হাঁড়িকে এক করল অর্থ লোভ।

ওঁদের তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই আমি ও ই টি ভি'র টিম ঘর থেকে বের হলাম। স্থানীয় যুবকদের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে টি ভি ক্যামেরার

সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম—দীপ ঘোষ পরিবার মূর্তির গায়ের রং পরীক্ষা করলে সিলভার নাইট্রেটের উপস্থিতি পাওয়া যাবে-ই।

সিলভার নাইট্রেট না পাওয়া গেলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দীপ ঘোষের পরিবারের হাতে তুলে দেব ২০ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।

সে'দিন সন্ধে থেকেই ই টিভি নিউজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কয়েক বার প্রচার করল খবরটি। ধর্মের নামে বুজরুকির খবর চ্যালেঞ্জসহ সন্ধে থেকেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে ভাবে ই টি ভি নিউজে প্রচারিত হতে থাকে, তাতে নড়েচড়ে বসে নিউ আলিপুর থানা। সে রাতেই দীপ ঘোষকে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। পরের দিন-ই বাসার দরজায় দীপ ঘোষ নোটিশ টাঙিয়ে দেন—'দর্শন বন্ধ'।

একটা বুজরুকি ব্যাবসা শুরুতেই বন্ধ করা গিয়েছিল প্রচার মাধ্যম ও স্থানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায়। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রচারিত হয়েছিল 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'আজকাল'-সহ আরও কিছু দৈনিকে।

আজকাল

বর্ষ ২২ সংখ্যা ২০৪ শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৮ অক্টোবর ২০০২

সফেদ ঝুট এবং কিছু কথা

প্রবীর ঘোষ

'মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা এই শতাব্দীর সেরা বুজরুকি' বলে চিহ্নিত করা হয়। মণিকার ঠিক কী অসুখ করেছিল, কোন কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছিলেন, ডাক্তারদের মতামত, সবই জানানো হল। সঙ্গে ছিল একটি সোজাসাপ্টা চ্যালেঞ্জ। আমাদের হাজির করা একজন অন্ধকে ভ্যাটিকান বা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে? পারলে আমাদের সমিতি অলৌকিক বিরোধী সমস্তরকম প্রচার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। প্রণামী হিসেবে তুলে দেবে কুড়ি লক্ষ টাকা। বি বি সি এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মতামত চায়। ওরা বলে, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে তারা নারাজ।

মাত্র কয়েক মাস আগে 'ভ্যাটিকান' জানাল— সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। অবশ্য তার জন্য এতকাল পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ বন্ধ ছিল না। ভ্যাটিকানের এই সত্যিটা বুঝতে সময় লেগেছিল। একটু বেশি সময়। মাদার টেরিজাকেও 'সেন্ট' ঘোষণা করতেও ভ্যাটিকানের একটু সময় লাগল, তবে সেটা খুব বেশি সময় নয়। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বুঝতে এদেশের ডাক্তার-সিস্টারদের ময়দানে নামিয়ে দিল। প্রবলপ্রতাপ টিভি চ্যানেল সি এন এন-এর টিম আমেরিকা থেকে উড়ে এল কলকাতায়। সিস্টার নির্মলা ওদের ক্যামেরার সামনে হাজির করলেন উত্তরবঙ্গের মণিকা বেসরা আর এক রয়েসয় ডাক্তার কোনও এক ভট্টাচার্যকে। সি এন এন-এর কল্যাণে গোটা বিশ্ব জানল, মণিকার এমনই এক অসুখ হয়েছিল, যার আরোগ্যর উঁপায় চিকিৎসাশাস্ত্রের জানা নেই। কিন্তু মাদরের অলৌকিক ক্ষমতায় মণিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ! এমন খবরের পর ভ্যাটিকান জানিয়েছে, মাদরের এমন অন্তত অলৌকিক রোগ সারাবার ক্ষমতার প্রেক্ষিতে তাঁকে 'সেন্ট' বলে ঘোষণা করা হবে।

আমরা যুক্তিবাদীরা সিদ্ধান্ত নিলাম: জানি না আরও কত বছর পরে ভ্যাটিকান সত্যিটা বুঝবে— পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবীর কয়েক হাজার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, রেডিও ও টিভি চ্যানেল সত্য প্রকাশ করল মণিকার অসুখ করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি সেরেও গেছেন। যে জেগে ঘুমায় তাকে কখনও জাগানো যায় না। 'সেন্ট'-এ বিশ্বাসী ভ্যাটিকান-এর সত্যতা নিয়ে কিছুটা দ্বিধা রোয়া ছিলাই। ট্রেরিজাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ঘোষণার পেছনে যিশু খ্রষ্টের মাহাত্ম্য প্রচারের কোনও কূট বা মহান উদ্দেশ্য নেই তো? মাদার টেরিজা নিজে অবশ্য কোনও দিনই অলৌকিক চিকিৎসার বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়েছেন। ডাক্তারের বেলাতেই, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি মার্সিডেসের চিকিৎসাও করিয়েছেন। সেই মাদারকে 'সেন্ট' ঘোষণার ব্যাপারে আলোচনা, আলোড়ন পাঁয়া ঘেঁটেছেন তাঁরা আর হাই হোক, মাদরের ভক্ত এ কথা একেবারেই সত্য নয়। এমন সময়ে মাদরের মূর্তির গায়ে রং কালা ঢাকছেন। যুক্তিবাদী সমিতি তার তাঁরিখ বাদে ছিল না। তার অক্টোবর বিভিন্ন বি বি সি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সমিতির পক্ষ থেকে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়। আট তারিখ সকাল থেকেই 'স্টার নিউজ' প্রচার করে আমাদের চ্যালেঞ্জ ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নীরবতার কথা।

নয় তারিখ সকালে এ এফ পি থেকে খবর পাই— গত রাতে ভ্যাটিকান থেকে জানানো হয়েছে, যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। তিন্ত তাদের সিদ্ধান্তে নড়চড় হবে না। মাদার অলৌকিক ক্ষমতায় মণিকাকে রোগমুক্ত করেছেন ধরে নিয়ে তাঁকে অবশ্যই 'সেন্ট' বলে ঘোষণা করা হবে।

ভ্যাটিকান তো আর অল্পে-চিমশেদের কথায় নিজেদের অভিজাত অহঙ্কার আর পরিকল্পনাকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না, তাই যুক্তি-বুদ্ধিকে এক ধাক্কায় বিদায় করতে চেয়েছে। অবশ্য এই দোষে সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই দোষী। তেউ-ই যুক্তি-বিজ্ঞানকে পাত্তা দিতে নারাজ। যুক্তি ও বিজ্ঞান মানলে ব্যবসার খুব ক্ষতি হয়। [redacted] সময়ের ধুলো পড়ে ঘটনাটা প্রায় ঢিমিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় এক বিস্ফোরণ ঘটালো পৃথিবীর নামী সাপ্তাহিক 'টাইম ম্যাগাজিন'। ১৪ অক্টোবর সংখ্যায় জানাল, মণিকার স্বামী সেলবু মুর্মু তাঁদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাফ জানিয়েছেন, মণিকার রোগ সারিয়েছেন ডাক্তাররা। মাদার টেরিজার অলৌকিক ক্ষমতা নয়। সেই সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে এই নিবন্ধ লেখকেরও একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আমাদের সোজা কথা, অলৌকিক চিকিৎসার একজন টিউমার থাকা রোগীকে ঠিক করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ কি সিস্টাররা নেবেন। তাঁরা কিছুলে কুড়ি লক্ষ টাকা প্রণামীর সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির কাঁপ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি থাকছে। টাইমের ওয়েবসাইটেও খবরটা রয়েছে। টাইম ম্যাগাজিন সি এন এন-এরই নিকট সম্পর্কের ভাই। সি এন এন ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সাক্ষাৎকার নিতে চায়। উড়ে আসবে এই শহরে। সমিতির পক্ষ থেকে একটি সরল প্রস্তাব দিয়েছি— সেই ডাক্তার ভট্টাচার্যকে আড়াল থেকে সামনে আনুন। সুস্থ হয়ে ওঠা মণিকাকেও আনুন। প্রেস কনফারেন্স হোক। প্রমাণ করে দেব ডাক্তার ভট্টাচার্যের মিথ্যাচারিতা। হুঁশিয়ার থাকব এমন মিথ্যাচারিতার জন্য ওই ডাক্তারের চিকিৎসার অধিকার কেন কেড়ে নেওয়া হবে না? কেন দেশি প্রতারকদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে না?

পাথর যখন কথা বলে

ধাক্কাটা খেলাম তরুণী সাংবাদিক দীপালি মিত্রের কাছ থেকে। "এই যে আপনারা এত বাঘ-সিংহ জ্যোতিষীদের টিভি ক্যামেরার সামনে নাস্তানাবুদ করছেন; তারপরও কিন্তু আপনাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে শিয়ালদা চত্বর থেকে মফস্বল স্টেশন এলাকায় রমরমিয়ে চলেছে গ্রহরত্নের ব্যাবসা। পাবলিক আপনাদের কথাকে পাত্তা দেবে কেন, যখন নিজের চোখে দেখছে পাথরের অদ্ভুত ক্ষমতা?"

দীপালি একটানে আমাদের আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন। দীপালি যে পাথর ব্যবসায়ীদের কথা বলছেন, তাদের জানি। পাথরগুলোর গুণের কথাও। কোন্ পাথরটা আপনার ধারণ করা উচিত, তা পাথর-ই বলে দেবে। ভাগ্য পাল্টাতে কোন্ পাথর পরবেন, তা বলে দিতে নেই কোনও জ্যোতিষীর। তাই জ্যোতিষীদের ভুলের প্রশ্ন নেই। সাত জ্যোতিষীর সাত রকম পাথর ধারণের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্ন নেই। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পাথর কিনতে পারেন।

অসাধারণ এই পাথরগুলোর বৈশিষ্ট্য বড়ই বিচিত্র। হাতের তালুতে এক চামচ পরিমাণ জল নিন। তারপর শ'য়ে শ'য়ে পাথরের মধ্যে থেকে একটি পাথর বাছুন। পাথরটা তালুর জলে রাখুন। জলের রং কী বেগুনি হয়ে গেছে? না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছেমতো পাথর তুলুন ও গণ্ডুষে রাখতে থাকুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য পাথর সাজিয়ে বসা মানুষটি আছে। সেই চামচে করে জল নিয়ে আপনার গণ্ডুষ তৈরিতে সাহায্য করবে। জল চলকে পড়ে শেষ হয়ে গেলে আবার জল দেবে। আপনার নির্বাচিত পাথরটাই তুলে হাতে বসাবে। সেটা নামিয়ে রেখে আরও একটা পাথর বসাবে। যতক্ষণ না জলের রং বেগুনি হয়, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

আপনি হয়তো ভাবছেন—এর পিছনে বুজরুকি আছে। ভাবতেই পারেন। চারদিকে এত বুজরুক, পাথরের জল রঙিণ করার মধ্যে বুজরুকি থাকতেই পারে। হতে পারে পাথরটা জলে রাখলে জলের রং পাল্টে যায়। সন্দেহ মিটিয়ে ফেলাই ভালো। অন্য কারো গন্ডুষে পাথরটা বসিয়ে দিন। দেখতে পাবেন, জল রং পাল্টায়নি।

সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম—দীপ ঘোষ পরিবার মূর্তির গায়ের রং পরীক্ষা করলে সিলভার নাইট্রেটের উপস্থিতি পাওয়া যাবে-ই।

সিলভার নাইট্রেট না পাওয়া গেলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দীপ ঘোষের পরিবারের হাতে তুলে দেব ২০ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।

সে'দিন সন্ধে থেকেই ই টিভি নিউজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কয়েক বার প্রচার করল খবরটি। ধর্মের নামে বুজরুকির খবর চ্যালেঞ্জসহ সন্ধে থেকেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে ভাবে ই টি ভি নিউজে প্রচারিত হতে থাকে, তাতে নড়েচড়ে বসে নিউ আলিপুর থানা। সে রাতেই দীপ ঘোষকে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। পরের দিন-ই বাসার দরজায় দীপ ঘোষ নোটিশ টাঙিয়ে দেন—'দর্শন বন্ধ'।

একটা বুজরুকি ব্যাবসা শুরুতেই বন্ধ করা গিয়েছিল প্রচার মাধ্যম ও স্থানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায়। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রচারিত হয়েছিল 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'আজকাল'-সহ আরও কিছু দৈনিকে।



আজকাল

বর্ষ ২২ সংখ্যা ২০৪ শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৮ অক্টোবর ২০০২

সফেদ ঝুট এবং কিছু কথা

প্রবীর ঘোষ

পাথর যখন কথা বলে

ধাক্কাটা খেলাম তরুণী সাংবাদিক দীপালি মিত্রের কাছ থেকে। "এই যে আপনারা এত বাঘ-সিংহ জ্যোতিষীদের টিভি ক্যামেরার সামনে নাস্তানাবুদ করছেন; তারপরও কিন্তু আপনাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে শিয়ালদা চত্বর থেকে মফঃস্বল স্টেশন এলাকায় রমরমিয়ে চলেছে গ্রহরত্নের ব্যাবসা। পাবলিক আপনাদের কথাকে পাত্তা দেবে কেন, যখন নিজের চোখে দেখছে পাথরের অদ্ভুত ক্ষমতা?"

দীপালি একটানে আমাদের আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন। দীপালি যে পাথর ব্যবসায়ীদের কথা বলছেন, তাদের জানি। পাথরগুলোর গুণের কথাও। কোন্ পাথরটা আপনার ধারণ করা উচিত, তা পাথর-ই বলে দেবে। ভাগ্য পালটাতে কোন্ পাথর পরবেন, তা বলে দিতে নেই কোনও জ্যোতিষীর। তাই জ্যোতিষীদের ভুলের প্রশ্ন নেই। সাত জ্যোতিষীর সাত রকম পাথর ধারণের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্ন নেই। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পাথর কিনতে পারেন।

অসাধারণ এই পাথরগুলোর বৈশিষ্ট্য বড়ই বিচিত্র। হাতের তালুতে এক চামচ পরিমাণ জল নিন। তারপর শ'য়ে শ'য়ে পাথরের মধ্যে থেকে একটি পাথর বাছুন। পাথরটা তালুর জলে রাখুন। জলের রং কী বেগুনি হয়ে গেছে? না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছেমতো পাথর তুলুন ও গণ্ডুষে রাখতে থাকুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য পাথর সাজিয়ে বসা মানুষটি আছে। সেই চামচে করে জল নিয়ে আপনার গণ্ডুষ তৈরিতে সাহায্য করবে। জল চলকে পড়ে শেষ হয়ে গেলে আবার জল দেবে। আপনার নির্বাচিত পাথরটাই তুলে হাতে বসাবে। সেটা নামিয়ে রেখে আরও একটা পাথর বসাবে। যতক্ষণ না জলের রং বেগুনি হয়, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

আপনি হয়তো ভাবছেন—এর পিছনে বুজরুকি আছে। ভাবতেই পারেন। চারদিকে এত বুজরুক, পাথরের জল রঙিণ করার মধ্যে বুজরুকি থাকতেই পারে। হতে পারে পাথরটা জলে রাখলে জলের রং পাল্টে যায়। সন্দেহ মিটিয়ে ফেলাই ভালো। অন্য কারো গণ্ডুষে পাথরটা বসিয়ে দিন। দেখতে পাবেন, জল রং পাল্টায়নি।

আপনি হয়তো কারও কাছে ঠকে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। কেউ আপনাকে ঠকিয়েছে—এটা সহ্য করতে পারেন না। আপনি সন্দেহ মেটাতে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, আরও কয়েকজনের বেলায় পাথর জলের রং দিল পালটে। এমন দেখার পর পাথরটার জন্য ২০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত নিশ্চয়ই দিতে পারেন। আজ পকেটে পুরো টাকা না থাকলে কিছুটা অ্যাডভান্স দিয়ে পাথরটা বুক করে যেতে পারেন। না, ওরা ঠকায় না। বাকি টাকা মিটিয়ে দিলে ঠিক পাথরটি পেয়ে যাবেন। অ্যাডভান্স দিয়েছেন। কোনও রসিদ নেননি। তারপরও ঠকেননি। পাথরটা পকেটে পুরে আপনার মন খুশি খুশি। খুশি মনে সারাদিন কাজ করে রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে সারাদিনের কাজ-কর্ম কেমন হল ফিরে দেখুন। অন্য দিনের চেয়েও যেন ভালো হয়েছে, তাই না? এ'সবের পর পাথরে অবিশ্বাস করাটাই বোকামি হয়ে যায়। নিকুচি করেছে প্রগতিশীল সাজতে জামার আড়ালে পাথর ঢাকতে। আপনি ভণ্ড নন, তাই পাথর দিয়ে আংটি করেন। আঙুলে পরেন।

এমন অদ্ভুত গুণের পাথর যারা বেচে, তারা কেন শহরেরর বুকে ঝক্‌ঝকে শো'রুম সাজিয়ে বসে না? ওদের-ই প্রশ্ন করুন। উত্তরটা কিন্তু শিয়ালদা থেকে বনগাঁ—সর্বত্র একই পাবেন। ওরা বলবে—আমাদের সে টাকা কই, যে বসব? বউবাজারে শোরুম করা মানে কোটি টাকার ব্যাপার। তার উপর রয়েছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ, কর্মচারীদের মাইনে, এসি আর আলোর বন্যার জন্য বড় অংকের বিদ্যুৎ-বিল, ফোন-বিল, জ্যোতিষীদের পাথর বেচার কমিশন, আরও কত কী। যে পাথর এখন বেচি ১০০ টাকায়, তাই তখন বেচতে হবে ১০,০০০-এ। এই যে আপনাদের সেবায় লাগতে পারছি, আপনারা ভালো বাসছেন, এতেই খুশি। লোককে টুপি পরিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ার চেয়ে, ইজ্জতের খুদও ভালো।

যে পাথর বিক্রেতা এত সুন্দর কথা বলেন, যে পাথরের এমন গুণ সে পাথর যে ঢেলে বিক্রি হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ক্রেতাদের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট সবাই আছেন। এরপর এইসব গ্রহরত্নকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেই হল? যুক্তিবাদীরা প্রমাণ করুক না, ওদের বুজরুকিটা কোথায়?

স্বীকার করছি নিজেদের অক্ষমতা। ফুটের স্টোন-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারিনি। কেন পারনি? উত্তর খুঁজতে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন।

আমাদের এই অক্ষমতার কারণ—দম্ভ। যে অলৌকিক রহস্য ভেদ করতে পৃথিবীর সব্বাই ব্যর্থ, সেখানে আমরা সফল। একবারের জন্যেও ব্যর্থতা আমাদের কালিমালিপ্ত করেনি। আমাদের নিয়ে ছবি করেছে বি বি সি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, লন্ডনের চ্যানেল ফোর। আমাদের নিয়ে পৃথিবী সব মিডিয়াই প্রচুর হই-চই করে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ কাউকে নিয়ে এক কলম লেখা প্রকাশিত হওয়া, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সামিল — এমনটাই মনে করে তাবৎ পৃথিবীর মিডিয়াগুলো। আমাদের কাজকর্ম নিয়ে গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছবিসহ খবর প্রকাশ করেছে ওরা। পৃথিবীর সবচেয়ে নামী ম্যাগাজিনের অন্যতম 'টাইম' আমাদের নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনি করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন দেশের কয়েক হাজার পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতির কর্মকাণ্ডের কথা প্রচারিত হয়েছে। এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শ'খানেক ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যাবে আমাদের নানা কথা, নানা ভেঞ্চার, নানা ভান্ডাফোড়ের কাহিনি। এইসব ওয়েবসাইটের অনেকগুলোই চালান পৃথিবীর বিভিন্ন নামী পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকরা।

এ'সব সত্যিই গর্বের কারণ। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথায়—"কারও কারও গর্ব মানায়।" আমাদের মানায় কি না—জানি না। তবে এটা জানি, গর্বের আর এক পিঠ দম্ভ। আমরা বাঘ-সিংহ জ্যোতিষীদের প্রতারণা ধরব, তাদের গ্রেপ্তার করাব, আর ফুটপাথের এই নিয়তির কারবারিদের তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দূরে ঠেলে রাখব—এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথাও গোলমাল আছে। আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওরা প্রতিদিন কত মানুষকে ভাগ্য-বিশ্বাসী করে তুলছে—কে জানে?

দীপালি মিত্রকে ফোন করলাম। জানালাম, কাল আমরা পাথরের রহস্য ভেদ করতে যাব। শিয়ালদায় জনা চারেক বসে। আমাদের টার্গেট তাদেরই একজন। আপনি আসুন দেড়টা নাগাদ। যুক্তিবাদী সমিতির ক্রিক রো অফিসের ঠিকানা দিলাম।

২৬ এপ্রিল শনিবার, ২০০৩। দুপুর ১টা। ক্রিক রো'র অফিসে আমরা অনেকেই হাজির। সবাইকে নিয়েই একটা টিমওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে। কার কী ভূমিকা, তারও একটা রিহার্সাল হয়ে গেল।

কোনও চ্যালেঞ্জ জিততে হলে দুটি বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এক ঃ প্রতিপক্ষকে কখনই হালকা ভাবে দেখতে নেই। ছোট করে দেখতে নেই। আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নেই। বিশ্ব পর্যায়ের অ্যাথেলেটরাও দৌড় ফিনিস করার চূড়ান্ত সময়ে স্লো হয়ে যান। একে অ্যাথেলেটের পরিভাষায় বলে 'ডেঞ্জার টাইম'। ফুটবলের শেষ দেড়-দু মিনিট 'ডেঞ্জার টাইম'। এই সময় আত্মতুষ্ট থাকার দরুন জেতা গেম ড্র হয়। তেমনই দুর্বল প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধে আত্মতুষ্টি হল 'ডেঞ্জার সিচুয়েশন'। দুই ঃ প্রতিপক্ষের তুলনায় নিজেকে কখনই ছোট বলে ভাবতে নেই। এমন ভাবনার অর্থ, লড়াইয়ের আগেই হেরে বসে থাকা।

ফুটবল টিম ময়দানে নামার আগে কোচ শেষবারের মতো পুরানো অনেক উপদেশ আবার নতুন করে প্লেয়ারদের মনে করিয়ে দেন, আমার মনে করিয়ে দেওয়াটা তেমনই কিছু। আজ পরিকল্পনা মতো আমি এই বুজরুকি ফাঁসে অংশ

নেব না। আমার ভূমিকা হবে নেহাতই দর্শকের। সে'জন্য হয় তো কিছুটা আশঙ্কা ছিল। শকুন্তলার দুষ্মন্তগৃহে যাত্রার সময় পালক পিতা ঋষি কণ্ব যেমন প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় পীড়িত হচ্ছিলেন, আমার অবস্থা তেমনই।

আজ সমিতির যারা অ্যাকশনে যাবে, তারা প্রত্যেকেই জানে পাথর বিক্রেতা পাথর ছাড়া আরও একটি জিনিস নিয়ে বসে। সেটা রাখে ক্রেতার চোখের আড়ালে। জিনিসটা হল এক ধনের রাসায়নিক দ্রব্য। নাম, ফেনলফ্থ্যালিন (Phenolpthalein)। ফেনলফ্থ্যালিনের গুঁড়ো দেখতে সাদা পাউডারের মতো।

অনুমান করতে পারি, জল রঙিন করার এই কেমিক্যাল দর্শকদের নজর এড়িয়ে রাখতে কিছু কৌশল নেয় পাথরওয়ালা। কী সে কৌশল? নিশ্চিত ভাবে তা বলা সম্ভব নয়। তবে এমন হতে পারে— পোশাকের ভাঁজে, হাত ও পায়ের ভাঁজে, ঘাড়ে ফেলে রাখে ফেনলফ্থ্যালিন পাউডার।

বাটিতে থাকে জল। একটা চামচ দিয়ে জল তুলে দেওয়া হতে থাকে। ওই জল কিন্তু সাধারণ জল নয়। বিশেষত্ব আছে। জলটা চুন জল। জলে চুন ডুবিয়ে রাখলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চুন কাদা কাদা হয়ে যায়। কাদা চুন জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকে। ওপরে থাকে টলটলে জল।

পাথর বিক্রেতা যখন জলে রং বেগুনি করতে চায়, তখন আঙুলের ডগায় তুলে নেয় ফেনলফ্থ্যালিন। তারপর পাথরটা ক্রেতার হাতের তালুবন্দি জলে রাখার সময় ওই বিশেষ আঙুলটি জলে ছুঁইয়ে দেয়। ব্যাস কাজ শেষ। চুন জলে ফেলনফ্থ্যালিন মেশার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের রং হয়ে যায় বেগুনি। ওখান থেকে আপনি পাথর কিনে থাকলে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করুন। গণ্ডুষে আপনার পাথরের আংটিটি রাখুন। দেখবেন জল রঙিন হচ্ছে না। গ্যারান্টি। কিন্তু কেনার সময় জল রঙিন হয়েছিল।

কোনও তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কটা জানা না থাকলে, ঘটনাটা দেখেই ধরে ফেলা খুবই কঠিন। আবার রহস্যের কারণটা জানলেই যে ধরাটা সোজা হবে—এমনটা ভাবলে ভুল হবে। গোটা অপারেশনের জন্য নেতা বাছা হয়েছে দীপক ব্যাপারীকে। ওকে সাহায্যের জন্য রইল রানা, অতীশ, বিশ্বজিৎ, মৃণাল, মুন্না, সঞ্জয়, জয়দেব, শৃঙ্খল ও আরও অনেকে।

দুপুর দেড়টা। দীপালি এসে পড়লেন ই টি ভি নিউজের গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে ফোটোগ্রাফার ও তাঁর সহকারী। দীপালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাদের টার্গেট শিয়ালদা ডেন্টাল কলেজের সামনে বসা পাথরওয়ালা। সমিতির ছেলেরা দু-চার মিনিট পর পর দু একজন করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। এই অপারেশনের জন্য ওদের প্রত্যেকেরই অঙ্গে শোভা পাচ্ছে তাগা-তাবিজ-আংটি। দীপালিও তাঁর টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শেষে শৃঙ্খল ও জয়দেব।

শৃঙ্খল ও জয়দেবকে দেখলেই বলে দেওয়া যায়—ব্যবসায়ী, জ্যোতিষে বিশ্বাসী,

বর্তমানে কাঁচা পয়সা আছে। মধ্যবয়স্ক মানুষদুটোর লম্বা-চওড়া চেহারা ও ঝাঁ চক্‌চকে মোটরবাইক দেখে মনে হয় ব্যাবসাটা প্রোমোটিং। প্রমোটররা মোটরের চেয়ে বাইকে ঘোরাটাই পছন্দ করে।

আমি যখন স্পটে পৌঁছালাম, তখন বেশ বড়-সড় জটলা জমে গেছে। ই টিভি ছবি তুলছে, ভিড় তো জমবেই।

দীপালি সুন্দর ম্যানেজ করেছেন। পাথরওয়ালা খুশ-মেজাজে ছবি তুলতে দিচ্ছে। খুশি পাথরওলার দুই সঙ্গীও। দীপালিকে নিজের নাম জানাল পাথরওয়ালা। কৃষ্ণ দাস।

কৃষ্ণ দাস একটা পিঁড়িতে বসে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। জটলা কৃষ্ণকে ঘিরে। ওদের কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। পিঁড়ির আশে-পাশের কিছুটা ফুটপাথ জল দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করা। বাঁ পাশে একটা পিতলের বিশাল রেকাবিতে কয়েক কিলো নানা রং-এর কাচের টুকরো বা পাথর ডাঁই করা। ফুটের রেলিংয়ে ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িয়ে কালীঘাটের কালীর একটা বাঁধানো ছবি। ছবিতে জবা ও অপরাজিতার মালা পরানো। ছবির সামনে এক গোছা ধূপকাঠি জ্বলছে। ছবি ও ধূপদানি বসানো রয়েছে একটা লাল শালুর ওপর। তারও পাশে দুটো বড়ো বড়ো ব্যাগ। ব্যাগের পাশে নামানো রয়েছে দুটো দশ লিটারের ও একটা চার লিটারের কন্টেনার। কন্টেনারগুলোর গায়ে লেগে রয়েছে জল। আমি নিশ্চিন্ত। এর অন্তত একটায় চুন জল রয়েছে।

একজনের ভাগ্য পরীক্ষায় কৃষ্ণ তখন ব্যস্ত। তার হাতের তালুর জলে একের পর এক পাথর রাখছে। মুহূর্তে পাথরটা তুলে নিয়ে আবার একটা ছোট রেকাবিতে রাখছে। বড় রেকাবি থেকে তুলছে আবার একটা নতুন পাথর। গোটা দশেক পাথর বসানোর পর একটা পাথর হাতে রাখতেই জল বেগুনি। ফোটোগ্রাফার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রং পালটানো গণ্ডুষকে ক্যামেরা বন্দি করতে। বুঝতে পারলাম না, কখন কোথা থেকে ফেনলফ্থ্যালিন নিল কৃষ্ণ। সত্যিই কৃষ্ণ নাম সার্থক। উপাখ্যানের কৃষ্ণের মতোই নিখুঁত জাদুকর।

রানা আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রিক রো থেকে বেরিয়েছে। আমারও সমিতির ছেলেদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে ও। রানা ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, এর আগে আরও তিন জনের হাতের জল রং পালটেছে। দীপকরা কী তাহলে এখনও ধরতে পারেনি, কোথা থেকে নিচ্ছে ফেনলফ্থ্যালিন? দীপক তো একা নয়। অনেকগুলো তৈরি চোখ নজর রাখছে। তাদের সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিচ্ছে? কৃষ্ণর এলেম আছে, স্বীকার করতেই হচ্ছে।

ততক্ষণে শৃঙ্খলকে নিয়ে পড়েছে কৃষ্ণ। শৃঙ্খলের একটা পাথর রং পালটালো। ছবি উঠছে। শৃঙ্খল জানতে চাইলেন, পুজোর আগেই চার-চাকা হবে তো? ইনস্টলমেন্টে তো এখনই কিনতে পারি। ক্যাশে কিনতে চাই।

শৃঙ্খলের হাতের তালু মেলে ধরতে বলল কৃষ্ণ। হাতের রেখায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি আছে?"

—হ্যাঁ, রিসেন্টলি ফ্ল্যাট কিনেছি।

—টাকা আসছে। রাখতে পারছেন না, খরচ হয়ে যাচ্ছে। শনি ভোগাচ্ছে। দাঁড়ান, একটা অ্যামিথিস্ট দিচ্ছি। লেগে গেলে ভাবতে হবে না। তিন মাসের মধ্যে গাড়ি হবেই।

শৃঙ্খলের হাতের তালুর ঘেরাটোপে এক চামচ জল ঢালল কৃষ্ণ। একটা নীল পাথর নিয়ে বসাতেই জল বেগুনি। হ্যাঁ বুঝেছি। দীপকদের অপেক্ষায় রইলাম। ওরাও কি বুঝেছে?

না। ধরা যাচ্ছে না। দীপকদের আরও সময় দিতে শৃঙ্খল আরও একটা পাথর কেনার ফাঁদ পাতলেন। আবার একটা পাথর। আবার জলের রঙিন হওয়া। তিনটে পাথরের মোট দাম ১৬০০ টাকা। শৃঙ্খল তো পাথর কিনতে আসেননি। তাই টেনে সময়কে বাড়াতে চাইছিলেন। "পাথর যে খাঁটি, তার গ্যারান্টি কোথায়? জি এস আই-কে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে যদি দেখি পাথরগুলো পাথরই নয়, কাচ তবে কী হবে?" ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন শৃঙ্খল। এই শেষ সুযোগ—মনে করে দীপকরা কয়েকজন কৃষ্ণর ঘাড়ে, হাতের ভাঁজে, পায়ের ভাঁজে আঙুল বুলিয়ে বাটির জলে আঙুল ডোবার খেলায় মেতেছে। না, কিচ্ছু হচ্ছে না। জল জলেই আছে।

কৃষ্ণ বিপদের গন্ধ পেয়েছে। সতর্ক ওর দুই সঙ্গী। শৃঙ্খলের হাতেই ছিল পাথর তিনটে। কৃষ্ণ এক ছোঁতে পাথর তিনটে তুলে নিল। বলল, "যান মশাই, আপনাকে পাথর বেচবো না। এই সব গুটিয়ে ফেল তো।"

আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ। মুহূর্তে সাজানো দোকানপাট বেবাক ফক্কা। সব গুটনো হয়ে গেছে। অত্যন্ত নিরাশ দীপালিও গুটোতে শুরু করলেন। ক্যামেরা থেকে খোলা হয়ে গেছে বুমের কানেকশান।

আমি প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে ধমক দিলাম শৃঙ্খলকে। "আপনি ইয়ারকি পেয়েছেন? উনি ফুটপাথে পাথর বেচতে বসেছেন বলে কী ওঁকে কোনও মর্যাদা দেবেন না? পাথরগুলো নীলা, নাকি চুনী—তার গ্যারান্টি দিয়ে উনি আপনাকে পাথর গছাতে যাননি। জি এস আই-এর গ্যারান্টি দিচ্ছেন—এমন কথাও বলেননি। সুতরাং ফালতু কেন ও'সব কথা টানছেন? কেন তবে ওঁকে খাটালেন? ফুটপাথে বসেছেন বলে, তাই না?"

আমার দাপুটে কথার সামনে শৃঙ্খল তোতলাচ্ছিলেন। যারা কৃষ্ণের ঘাড়ে, হাতের ভাঁজে হাত বোলাচ্ছিলেন, তাদেরও ধমক দিলাম "আপনাদের লজ্জা করে না, একজন খেটে খাওয়া মানুষের পেশা নিয়ে চ্যাংড়ামো করতে?"

দীপকরা কাচুমাচু। কৃষ্ণের প্রাণে বল। আমি প্রায় ধমকে উঠে দাঁড়ানো শৃঙ্খলকে

আবার বসালাম। কৃষ্ণ আবার তার গুটনো কারবার খুলে বসল। টিভি ক্যামেরার সামনে হৃত গৌরব ফিরে পেতে চাইল। আমার অনুরোধে এক উবু দর্শক হাত এগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তাঁর তালুতে জল দিল। জলে দিল শৃঙ্খলের হাতের পাথরটাই। শৃঙ্খলের হাতের জল যে পাথরকে রঙিন করছে, সে পাথর এখন চুপ মেরে আছে।

দীপালি বুঝে গেছেন—কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ফোটোগ্রাফার এখন অতিমাত্রায় সপ্রতিভ। দীপালি অতি-তৎপর। দীপালি তাঁর হাতের বুম এগিয়ে ধরলেন কৃষ্ণের দিকে। প্রশ্ন, "এই যে একই পাথর কারও হাতের জল গোলাপী করছে, কারও বেলায় করছে না—এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? আপনি কী কোনও কেমিকেলের সাহায্য নিয়ে রং পাল্টে দিচ্ছেন? অর্থাৎ ম্যাজিক? তেমন হলে তো আপনি লোক ঠকাচ্ছেন?"

—"না না। এ কোনও ম্যাজিক নয়। এসবই পাথরের গুণ। এ পাথর যার নসিব পালটাবে, শুধু তার হাতের জলই রঙিন করে।" কৃষ্ণ প্রচণ্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চলেছে।

—"কোন জায়গা থেকে এ পাথর আনেন?"

—"আজমির থেকে।"

—"আপনি কী বলতে চাইছেন, এর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।"

—"যে পাথর জীবনের রং পালটে দেয়, যে পাথর ভাগ্য পালটে দেয়, তাকে আপনি যদি অলৌকিক পাথর বলতে চান, বলতে পারেন। কৃষ্ণ এখন ফুল ফর্মে। ও এখন আত্মতুষ্ট। এটাই ঠিক সময়।

আমার অনুরোধে শৃঙ্খলের হাত থেকে তুলে নেওয়া আরও একটা পাথর নিয়ে খেলা দেখাতে গেল কৃষ্ণ। আমার অনুরোধে ফোটোগ্রাফার ছবি তুলতে 'অতি যত্নবান' হলেন।

এবার আবার নতুন মানুষ। মানুষটির হাতের তালুতে প্রথমে জল, তারপর পাথর রাখল কৃষ্ণ। জল রং পালটালো না। আমি লোকটির হাত থেকে পাথর তুলতে যেতেই অবাক কাণ্ড! জলের রং বেগুনি।

এবার একজন উবু বসে থাকা মানুষের হাত টেনে নিলাম। এক চামচ জল দিলাম। একটা পাথর তুলে জলে রাখলাম। জল জলই আছে। জলে ভেজা ফুটপাতে একটা আঙুল ঠেকিয়ে পাথর রাখা জলে ছোঁয়াতেই জল বেগুনি। অর্থাৎ ফুটপাথে ফেনলফ্থ্যালিন আছে। তবে গুঁড়ো নয়। তরল, যা দিয়ে ধোয়ানো হয়েছে ফুটপাথ।

গোটা প্রক্রিয়াটাই খুব ধীরে সুস্থে করে দেখালাম, যাতে ফুটে জমে যাওয়া শ'খানেক মানুষ বুজরুকিটা কোথায়, তা বুঝতে পারেন। আমাদের সমিতির ছেলেরা মেতে উঠেছে সাধারণ মানুষকে বিষয়টা হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাতে। ব্যাখ্যা করতে। মানুষ বুঝছেন, মানুষ প্রতিবাদ করছেন। মানুষ ওদের মারতে যাচ্ছেন। পাবলিকের আড়ং ধোলাই থেকে বাঁচতে কৃষ্ণ তখন আমাদেরই হাতে-পায়ে ধরছে। অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে পাশের পর্ণোবই বিক্রেতা বইয়ের পসরা ফেলে হাওয়া।

মুচিপাড়া থানায় ফোন করলাম। থানা থেকে পুলিশ ভ্যান এলো মিনিট দশেকের মধ্যেই। সব জিনিস-পত্তর সমেত কৃষ্ণকে ভ্যানে তুললেন পুলিশ অফিসার নীলাদ্রি রায়। শ্যামনগরের সুরজিত বড়ুয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। আই.পি.সি. ২৪০ ও ১২০বি ধারায় মামলা রুজু হল। পরের দিন রবিবার। সেদিনই কৃষ্ণকে হাজির করা হল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। পুলিশ আরও ১০দিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের হেফাজতে রাখলেন।

এখন অক্টোবর। ৬টা মাস পেরিয়ে এসেছি। শিয়ালদা চষে ফেলেও অদ্ভুত পাথর ব্যবসায়ীদের দেখা পাইনি আমরা। আপনি?

যদি কোথাও পান, ওদের বুজরুকি ফাঁস করুন। থানায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন। একার বদলে অনেকে নিয়েই প্রতিরোধ গড়তে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারেন এককে দুই ও দুইকে বহু করতে।

আপনারা সবাই আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইতে না নামলে আমাদের মিশন অধরা থেকে যাবে। আপনাকে-আপনাদের তাই বড়-ই প্রয়োজন।

ফাঁদে পড়ে জ্যোতিষী শ্রীঘরে

আজ ২ মার্চ, ২০০২, শনিবার। প্রতি শনিবার দুপুর দুটো থেকে যদিও কলকাতার মৌলালির কাছে ক্রীক রো'তে আমাদের স্টাডি ক্লাস, তবু আমি ক্লাশে যেতে নাচার। সাড়ে তিনটের মধ্যে আমাকে পৌঁছাতে হবে হোটেল 'পিয়ারলেস ইন'এ। গাড়ি ঢুকতে যিনি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, বলবন্ত মহারাজজি'কে কোথায় পাব? বললেন—থার্ড ফ্লোরে উঠলেই মালুম হয়ে যাবে।

উঠতে সত্যিই মালুম হয়ে গেল। একটা স্যুটের সামনে দু-তিনজন অবাঙালি চোখে পড়ল। দরজার মুখেই একজন দাঁড়িয়ে। তবু লিফট থেকে বেরিয়ে উর্দি পরা পিয়ারলেসের যে রুম-সার্ভিস বয়কে পেলাম, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, "বলবন্তজি?"

ইশারায় দেখিয়ে দিলেন সেই স্যুটটাই। দরজা আগলে দাঁড়ানো মানুষটি আমাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, মেয়ের সমস্যা নিয়ে আসা। মেয়ে সোনালির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জানিয়ে দিলেন, তিনটে প্রশ্ন তিনশো টাকা। তিনের বেশি হলে এক হাজার। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। প্রবেশাধিকার মিলল।

দেয়াল ঢেকে দেওয়া হয়েছে বজরংবলীর বহুবর্ণের বিশাল বিশাল একগাছা পোস্টারে। অবাক হলাম এই ভেবে যে, একটা স্টার হোটেল এসব করতে দিয়েছে। আবার দু-চার দিন লেগে যাবে দেয়ালের রঙ ফেরাতে। স্বীকার করতেই হচ্ছে জ্যোতিষী তান্ত্রিক বলবন্ত মহারাজের ক্ষমতার হাতটা খুব-ই লম্বা।

ঘরে তখনও জনা'দশেক কৃপাপ্রার্থী বসে। আমি আর সোনালি ছাড়া আর কেউ বাঙালি নন। ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা পত্রিকায় বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে গত মাস আড়াই-তিন ধরে। কলকাতার সব জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের মতোই একই নিয়ম এখানেও। প্রশ্ন করার মূল্য ঢুকেই জমা দিতে হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা খরচ। যার যেমন সমস্যা তার কাজ-কর্মের জন্য তেমন খরচ। দেখলাম, এগারো হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নির্বিকার-চিত্তে দাবি করছেন বলবন্তজি। আবার কেউ কেউ টাকার বান্ডিল বলবন্তজির পায়ের কাছে রেখে ভক্তি করে প্রণাম

করে তাবিজ-কবচ নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের পালা আসতেই আমরা দু'জনে পালা-গান শুরু করলাম। বলবন্তজি একটা নিচু খাটে বসে। দু-পাশে তাকিয়া। পরনে চিনে সিল্কের লাল লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। কুস্তিগিরের মতো চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ এপাশ-ও পাশ হবে। দু-জনেই বলবন্তজির পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। শুরু করলাম আমি।

"এই আমার একমাত্র সন্তান। নাম সোনালি, ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোবাসার বিয়ে। দুজনের গভীর ভালোবাসা ছিল। দু-বছর খুব ভালো ছিল। গত এক বছর হল আমার মেয়েকে জামাই দেখতে পারে না।"

সোনালিকে ভালো করে আপাদ-মস্তক একবার জরিপ করলেন বলবন্তজি। এম টিভি'র অ্যাঙ্কার-মার্কা চেহারা। আর পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে, এটা আমাদের দেখে ওস্তাদজি বুঝেই নিয়েছিলেন। মারুতি থাউজেনে এসেছি, সে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমার হাতের হিরের আংটি, ১৪ ক্যারট সোনার ঘড়ি। পরনের দামি শেরওয়ানি-কুর্তা, গোল্ড ফ্রেমের চশমা—সব-ই আমার বিত্তের বিজ্ঞাপন। সোনালির কানের হিরে থেকে পাঁচ হাজারি শাড়ি, হাতের ঘড়ি থেকে পায়ের জুতো—সব-ই ঝক্কাস। পোশাক-হাতঘড়ি-জুতো থেকে একজনের আর্থিক সঙ্গতি অনুমান করাটা অন্যায় নয়। ট্রেনের যাত্রী হলে আমিও এক একজনকে দেখি, আর অনুমানের খেলায় মাতি। এতে অনুমান শক্তি বাড়ে। যে জ্যোতিষীর অনুমান শক্তি, অভিনয় ক্ষমতা ও বাকচাতুর্য যত বেশি, সে-ই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দেওয়ার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী, অশিক্ষিত ব্যবসায়ী ও গলা অবধি কুসংস্কার পাঁকে ডুবে থাকা বিজ্ঞান-পেশার মানুষদের গাদা লাগিয়ে দেয়। এ'সব করতে প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্কুলের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে থুবড়ে পড়া জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকরা মাস গেলে তিন লাখ থেকে তিরিশ লাখ—যা খুশি কামায়। এসব-ই তো চোখের সামনে দেখছি।

এই যে আমি বা সোনালি পোশাক-আশাকে জেল্লা দিয়েছি, এও তো নিজেদের ঠাট-বাট জাহির করতেই করা। এর ফলে তাবিজ-কবচের দাম যে বাড়তে পারে, জেনেও নিজেদের জাহির করার ব্যাপারটা সামলাতে পারলাম কই? তবে এও ঠিক, বলবন্তজি সুন্দর বলেন। বললেন, "জামাইয়ের ছবি এনেছেন?"

সোনালি ওর ব্যাগ থেকে কয়েকটা ছবি বের করে দিল। তার মধ্যে সোনালির বিয়ের ছবি গোটা পাঁচেক। একটা অন্যরকম ছবি। ছবিতে সোনালি, পাশে হিন্দি সিরিয়ালের এক নায়িকা, যিনি সম্প্রতি একটি বাংলা সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পাশে আমার জামাইবাবাজি। তার পাশে নায়িকার মা, যিনি উত্তম যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন পাশে আমি। প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখলেন। বেশি সময় দিলেন আমাদের গ্রুপ ছবিটা দেখতে।

উঠতি নায়িকার ছবিতে আঙুল ঠেকিয়ে জানতে চাইলেন, হিন্দি সিরিয়াল করেন না?

বললাম, হ্যাঁ।

পাশের জেনানা?

জানালাম, নায়িকার মা। উনিও এক সময় বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন।

বলবন্তের এ'বার জিজ্ঞাসা, জামাই কী করে?

ব্যবসা করে। জানালাম।

বলবন্ত এবার জানতে চাইলেন, গ্রুপ ছবিতে নায়িকা ও তাঁর মা কেন? কীভাবে এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

এবার সোনালি মুখ খুলল। "আমার হাজবেন্ড এখন আবার ফিল্ম প্রডিউজ করতে নেমেছে। ওঁর ফিল্মে নায়িকা নিয়েছে এঁকে।"

—"হ্যাঁ, হাঁ, ছবি দেখেই বুঝেছি যে তোমার দেওয়ানা ছিল, এখন সে এই নতুন পঞ্ছির দিওয়ানা হয়েছে। তোমার হাজবেন্ড নয়া হিরোইনকে একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করেছে না?"

সোনালি কঁকিয়ে উঠল, "হ্যাঁ একটা মারুতি প্রেজেন্ট করেছে।"

—"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একটা ফ্ল্যাট ভি প্রেজেন্ট করেছে?" বলবন্তজির এমন দিব্যদৃষ্টি সোনালির কাটা-ঘায়ে নুন ছিটল। শোকে ডুকরে উঠল—ঠিক বলেছেন।

বলবন্তজি এবার শুধু বললেন—হুঃ। তারপর পাক্কা এক মিনিট চুপ করে রাজভোগ সাইজ চোখ করে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। সম্ভবত প্রাক্তন নায়িকার দিকে। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে জানিয়ে দিলেন, নায়িকার মা আমার জামাইকে বশীকরণ করেছেন।

সোনালি তো তাই শুনে কেঁদেই ফেলল, আমার অবস্থাও কাহিল। শত হলেও একমাত্র মেয়ের বাবা হিসেবে এত বড় আঘাত সহ্য করি কী করে?

বলবন্তজি সত্যিই হতবাক করার মত ক্ষমতার অধিকারী। কী অদ্ভুত ক্ষমতায়, অবলীলায় এ'সব বলে গেলেন। বলবন্তজি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা দু-জনেই জানিয়ে দিলাম, আপনি যা করার করুন। জামাইকে ফেরান।

বলবন্তজি বললেন, তিনি আজ রাতে বজরংবলির কাছ থেকে জেনে নেবেন জামাইয়ের ওপর কী ধরনের বশীকরণ করা হয়েছে। বশীকরণ দু'কিসিমের হয়। হিন্দুতন্ত্র মতে বশীকরণ, ইসলাম ধর্ম মতে বশীকরণ। হিন্দু মতে বশীকরণ করা হয়ে থাকলে, কাটাতে তাবিজ তৈরি করার খরচ পড়ে যাবে বিশ হাজার টাকা। ইসলাম ক্রিয়াকরমে বশীকরণ করা হয়ে থাকলে তা কাটাবার মতো ক্ষমতা রাখে এরকম তান্ত্রিকের খোঁজ পাওয়া মুশকিল।

আমরা দু'জন ভয় পেয়ে যাওয়া মানুষ। শেষ ভরসা হিসেবে বলবন্তজিকেই ধরে বসলাম, যা করার আপনাকেই করতে হবে।

আমাদের দু-জনের আকুতি আর চোখের জলে বলবন্তজি টললেন। বললেন,

বহুত কঠিন ক্রিয়াকরম, হাঙ্গামাওয়ালা কাজ, বহুত খরচাভি হবে।

এখন আর খরচের কথা ভেবে লাভ নেই। জামাই খরচ হয়ে যাওয়ার চেয়ে, জামাইকে ফিরে পাওয়ার জন্য খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বলেই ফেললাম, খরচার জন্যে ভাববেন না। যা লাগবে দেব।

—ঠিক আছে। কাল সকালেই মেয়েকে নিয়ে চলে আসুন। নিজের হাতে তাবিজটা বেঁধে দেবো। তারপর দেখবেন, জামাই আপনার মেয়ের পায়ের চারপাশে কুকুরের মতো ঘুরঘুর করছে।

বলবন্তজির কথায় আমরা গলে গেলাম। আমরা হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ পেলাম। আমি তো সত্যি বলতে কী, যা কখন করি না, তাই করলাম। চাটুকারের মতো হাত কচলাতে লাগলাম।

এ'বার আমার সমস্যার কথাটা বলে ফেলা উচিত। লজ্জা না করে-ই বলে ফেলা উচিত। রামকৃষ্ণ না কে যেন বলে গেছেন—"লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়।" বলে-ই ফেললাম, "বিশ হাজার হলে কাল-ই চলে আসতে পারি। যদি আপনি কৃপা করেন তো কালই মেয়েকে নিয়ে চলে আসি?"

বলবন্তজি যা বললেন, তার পিছনেও জোরালো যুক্তি আছে। বললেন—কৃপা তো নিশ্চয়ই করব, কিন্তু খরচা কী পড়বে, তা বজরংবলির সঙ্গে কথা না বলে বলি কী করে।

বললাম, "দু'লাখ হলে পরশু ব্যাংক থেকে তুলতে হবে।"

বলবন্তজি বললেন, সোমবারই চলে আসুন। বেলা বারোটার আগে মেয়েকে নিয়ে আসবেন। তবে আপনার তাবিজ বিশ হাজারে হলে, এক আশি ফেরত নিয়ে যাবেন।

পিয়ারলেস ইন থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিসে। সেখান থেকে তুললাম সাংবাদিক তন্ময় ঘোষকে। উদ্দেশ্য দেখা—সাধারণ মানুষ ধনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ কী ধরনের ব্যবহার করে। তালতলা থানায় ঢোকার আগেই আমার হিরের আংটি পকেটে। ঘড়ি গেছে পালটে। পালটে গেছে চশমা। সোনালির হিরের গয়না একই ভাবে ভ্যানিস। বন্ধুর মারুতি থাউজেন ছেড়ে গিয়ে এখন আমরা মারুতি এইট হান্ড্রেড-এর সাওয়ার।

থানায় অফিসার ইনচার্জ মহঃ আক্রম-এর ঘর ফাঁকা। শুনলাম দোতলায় ওঁর কোয়াটারে 'রেস্ট করছেন'। উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন, অতএব আমরা ওঁর চেম্বারে বসতে পারি না। বসতে গিয়ে এ'কথা জানলাম। তিনজন এদিক-ওদিক ঘুরছি। একটু কথা বলার সুযোগ পেলাম অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর নন্দলাল পালের সঙ্গে। তাঁকে সংক্ষেপে জানালাম বলবন্তজির গপ্পোটা। বললাম, তাঁর বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন লজ করতে চাই। আমি ও আমার পুত্রবধূ কমপ্লেন কম্পিউটারে কমপোজ করে দুটো প্রিন্টআউট

নিয়ে এসেছি। আমরা দুজনে সিগ্‌নেচার করে দিচ্ছি। এক কপি রিসিভ করে আর একটা কপিতে 'রিসিভড' লিখে থানার ছাপ মেরে আমাদের দিন।

নন্দলালবাবু আমার কথা শুনলেন, চিঠিটা পড়তে লাগলেন। এই সময় একগুচ্ছ রমণী কণ্ঠের কর্কশ চেঁচামেচি আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের বহু কণ্ঠের বক্তব্য একই—ধরে এনেছেন। যা টাকা নেবার নিয়ে ছেড়ে দিন। টাইমটা চলে গেলে আজ সন্ধে রাতের রোজগারটা মাঠে মারা যাবে।

সোনালি জিজ্ঞাসু ভুরু নাচালো তন্ময়কে উদ্দেশ্য করে।

"কলগার্ল হিসেবে ওদের ধরে এনেছে।" তন্ময় বললেন।

পড়া থামিয়ে নন্দদুলালবাবু তন্ময়ের দিকে তাকালেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

তন্ময় জানালেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক। আমাদের পরিচিত হিসেবে তাঁর এখানে আসা।

ছোট্ট চিঠি। তাও দু-তিনবার পড়লেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ইতিমধ্যে রমণীকণ্ঠগুলো আর রমণীয় নেই। চেঁচামেচি আর খিস্তির বান ডেকেছে।

সম্ভবত তন্ময়ের পরিচয় পাওয়ার পর পুলিশের তোলা আদায়ের চিত্রকে ঢাকতে আমাদের তিনজনকে অফিসার ইনচার্জের চেম্বারে বসালেন। 'বড়বাবু' কে খবর দিতে নন্দদুলালবাবু নিজেই উদ্যোগী হলেন।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে ও সি মহঃ আক্রম ঘরে ঢুকলেন। আমার কথা শুনলেন। আবেদনে চোখ বোলালেন। আমাকে বললেন—কমপ্লেনে অনেকেই অনেক কিছু লিখে ফেলেন। লিখে ফেলা সোজা। কিন্তু প্রমাণ করা খুব কঠিন। আপনারা দু-জনে যা যা লিখেছেন, তা তা প্রমাণ করতে পারবেন কী?

বললাম—তা পারবো। আমাদের পুরো কথা-বার্তাই ননস্টপ ধরা আছে অডিও ক্যাসেটে। ওঁর প্রতারণা ধরতেই পুত্রবধূকে মেয়ে সাজিয়ে ছিলাম। সাজিয়ে ছিলাম সমস্যার গপ্পোটা।

—ঠিক আছে, ক্যাসেটটা আর কোন্ কোন্ ছবি বলবন্ত মহারাজজিকে দেখিয়েছেন, দিন। তারপর কমপ্লেন আর তার কপিতে আপনারা দু'জনে সিগনেচার করুন,

—হ্যাঁ, সিগনেচার করছি। তবে ক্যাসেট বা ফটো এখুনি দিচ্ছি না। কপি করে আপনাকে দেব। অ্যাভিডেন্স হিসেবে কোর্টে যাতে এগুলো প্রডিউজ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। আশাকরি এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে বলবন্তকে অ্যারেস্ট করতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই।

কিন্তু তার পরেও অসুবিধের কথা এলো। আক্রম সায়েব জানালেন—তিনি একজন মুসলিম। এতবড় একজন হিন্দু সাধুকে অ্যারেস্ট করলে অনেক রং চড়তে পারে। অনেক গোলমাল হতে পারে।

আমার নাছোড়বান্দা অ্যাটিচুডে আক্রম সায়েব বললেন—ঠিক আছে, আপনাদের কমপ্লেন নিচ্ছি। দেখি কী করা যায়।

তালতলা পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে তন্ময়কে ধন্যবাদ দিয়ে দৌড়লাম সমিতির ক্রীক রো'র অফিসে। আজ ওখানে স্টাডি ক্লাস চলছে। সঙ্গে চলছে আমার জন্যে গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা। অবশ্য ইতিমধ্যে বার তিনেক ফোন করে আমাদের অগ্রগতি জানিয়েছি। এখান থেকেও আমার মোবাইলে খবর এসেছে—তাড়াতাড়ি আসুন, আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি।

আমি নামলাম ক্রীক রোতে। সেখানে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলাম। এবং এও বললাম, কমপ্লেন অবশ্য যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে করিনি। নিজের যে একটা বিশেষ পরিচয় আছে, তাও জানাইনি। আমজনতার একজন হিসেবে অভিযোগ দায়ের করা। সরকার তো গলা ফাটিয়ে প্রচার করছে, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পুলিশ আপনার বন্ধু। পুলিশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।'' আমাদের তরফ থেকে সবই করলাম। এবার দেখার পালা।

ফ্ল্যাটে পৌঁছেই সোনালির ফোন পেলাম ''তালতলা থানা থেকে এখুনি ফোন করেছিল। বলেছেন, এখুনি আপনার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে থানায় আসুন। সঙ্গে কমপ্লেনের রিসিভ কপি আনবেন। কমপ্লেন উইথড্র করতে হবে। এখুনি চলে আসুন। কোনও বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না। মিডিয়া টিডিয়াকে জানাতে যাবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।''

সোনালির স্বরে উত্তেজনা ও ভয় স্পষ্ট।

কেউ কারও বিরুদ্ধে থানায় ডাইরি করতে গেলে বা অভিযোগ জানাতে গেলে থানা সেটা নিতে বাধ্য। আসামিকে পর্যন্ত থানা ভয় দেখাতে পারে না। ভয় দেখানোটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তালতলা থানা তো আবার অভিযোগকারীকেই ভয় দেখাচ্ছে। ওরা ঠিক-ই বলে—''মেরা ভারত মহান, শও মে নিরানব্বই বেইমান!''

জিজ্ঞেস করলাম, ''কে ফোন করেছিলেন? নাম জিজ্ঞেস করেছিলি?''

—''বললেন তো তালতলা থানার ওসি বলছেন? মোস্ট অ্যাগলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছিলেন। বললেন, 'আপনার শ্বশুর না হয় বুড়ো ভাম। আদর্শের খুজ্‌লি চুলকে উঠেছে। কিন্তু আপনি তো একজন মডার্ন মেয়ে। এই সমাজের হাল-হকিকৎ সব-ই জানেন। বুঝতে পারলাম না, আপনি কী করে ওই বুড়োর কথায় নাচলেন। জানেন কার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন? জানেন ওঁর রিচ কতদূর? আপনার বিপদ হলে কে সামলাবে? আপনার বুড়ো শ্বশুর?' আমি জানিয়ে দিয়েছি—আমরা যাচ্ছি।''

সোনালি ফোন দিল আমার ছেলে পিনাকীকে। সোনালিকে এমন একটা উটকো বিপদে ফেলায় বিরক্ত পিনাকী সরাসরি আমার উপর ক্ষোভ উগরে দিল। আমি বললাম, ''যেতে হবে না। দেখছি।''

ও সি বা ওসি'র নাম করে থানা থেকে এমন ফোন আসতেই পারে। এর চেয়েও নোংরা ভাষায় খিস্তি দেওয়া ফোন আমি পেয়েছি দমদম থানা থেকে। ওসি'র

নাম করে-ই বারবার ফোন এসেছিল মাত্র বছর কয়েক আগে। ওদের কথা না শুনলে আমার একমাত্র ছেলেকে গুলি করে মারবে—এমন ফোন পেয়েছি, সে ফোনের টেপের কপি সে সময়কার পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত অভিযোগও টেপের সঙ্গে দিয়েছি। লিখিত অভিযোগ ও টেপের কপি দিয়েছি রাজ্যসভার সাংসদ ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত, উত্তর ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার ও রাজ্যের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে। সেই ভয়ের দিনগুলো আমি অতিক্রম করেছি—যখন এঁদেরই কেউ কেউ আমাকে ভালোবেসে বলেছেন, আমি ও আমার ছেলে যেন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিই। কারণ—ও সি'র ক্ষমতা আছে যে কোনও সময় আমাকে গ্রেপ্তার করার। গ্রেপ্তার তো করবে, জামিন তো তারপর। গ্রেপ্তারের বদলে যদি এনকাউন্টারের গপ্পো ওসি বাজারে ছড়ায়? ছড়াতেই পারেন শুধু কয়েকটিদিন একটু গা ঢাকা দেওয়া। তাঁরা আশ্বস্ত করেছিলেন—বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন।

সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা দেখেছিলেন। তাই আমি আছি, আমার ছেলে আছে। কিন্তু সে' সময় আমাকেও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে। এ'সবের ফল ছেলেকে সে'সময় ভোগ করতে হয়েছিল। ঘর পোড়া গরু। সিঁদুর মেঘ দেখলে ভয় পেতে-ই পারে। বারবার আমি ঘুঘুটি থানার বড়বাবুদের ধান খেয়ে যাব, তাঁরা বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষবেন—এমন কথা ভাবা বোকামো। এক সময় ঘুঘুর পরাণ বধ হতেই পারে। রাজনৈতিক ও পুলিশদের গুণ্ডারাজ সমাজে জাঁকিয়ে বসে আছে। এই সামাজিক পরিবেশ ভুক্তভোগীকে ভীতু করতে পারে। আবার সাহসীও। ভীরুতা ও সাহসিকতা দুই-ই একটু একটু করে হয়ে ওঠার ব্যাপার। ভীরু মানুষ দেখতে দেখতে, তাদের সঙ্গে সকাল থেকে রাত মেলামেশা করতে করতে একজন মানুষ ভীতু হয়ে পড়বে—এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। সাহসী মানুষ দেখতে দেখতে মানুষ সাহসী হয়। এই যে একজন মানুষের চিন্তার দ্বারা একজন মানুষের প্রভাবিত হওয়া—একে আমরা আরও একটি নামে ডাকতে পারে—'গ্রুপ থেরাপি'। একটা দলের সঙ্গে মিশে তাদের মতো হয়ে যাওয়া।

এ জীবনে তো কম দেখা হল না? খ্যাতিমান তরুণের সুন্দরী স্ত্রী'কে ঠকিয়ে কোনও এক তান্ত্রিক নিয়েছেন প্রায় লাখ খানেক টাকা। তন্ত্র সাধনা করলে অপ্সরা সুন্দরী প্রায় কুবেরের ঐশ্বর্য পাবেন বলে প্রলুব্ধ করেছেন। তারপর তন্ত্রক্রিয়ার নামে দেহ-মিলন ঘটিয়েছেন। অপ্সরা আমার কাছে এসব বলে আবেদন রেখেছেন—আমি যেন ভণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করি। বলেছি, আপনি ওর বিরুদ্ধে থানায় কমপ্লেন লজ করুন। আপনার হয়ে মামলা স্টেট গভর্নমেন্ট করবে। আপনি এক কদম এগোলে আমরা আপনার জন্য দশ কদম এগোব। ভণ্ডদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু আপনার নয়, আমাদেরও।

না, তিনি এগোননি। সম্মান ও জীবন বাঁচাতে এগোননি। এমন উদাহরণ একটি

নয়। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতেই এই সংখ্যা বহু শত। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের যুক্তিবাদী সমিতি ও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে খেলাটা শুরু করেন। গুটিয়ে আনেন সাহায্য প্রার্থনার আবেদন রেখে। ঝুঁকির সবটুকু আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চান। বাঙালি মধ্যবিত্ত চতুর মানুষদের এটাই মূলস্রোত। কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে অবস্থান-ই মূলস্রোত। পিনাকীর ভীরুতা নিয়ে সোচ্চার হওয়ার মানুষ অনেক পাব, তাদেরকেই যখন অনুরোধ করব, একজন প্রভাবশালী ভণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে, তখন দেখব ময়দান ফাঁকা। আমার অভিজ্ঞতা এ'কথাই বলে। এমন মুখে বাঘ-সিংহ মারা একশো জনের মধ্যে একজনের দেখা পাওয়াও ভার যিনি অকুতোভয়ে। বাঘ-সিংহের মুখোমুখি হতে রাজি। সৎ ও সাহসী মানুষদের জন্য যুক্তিবাদী সমিতি শ্রদ্ধার আসন পেতে বসে আছে, বসে থাকবে। ভণ্ডদের ভিড়ে সৎ ও প্রতিবাদী মানুষের খোঁজ পাওয়া খড়ের গাদায় সূচ পাওয়ার সামিল।

সোনালি ও পিনাকীর সঙ্গে কথা শেষ করে তালতলা থানা ধরলাম। ও সি'কে পেয়ে গেলাম। ও সি অবাক—এখনও আপনি বেরিয়ে না পড়ে বাড়ি থেকে আমাকে ফোন করছেন?

আমার ফোন পেয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এই। বললাম, আপনার আদেশ মানছি না। থানায় যাচ্ছি না। কমপ্লেন উইথড্র করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। সোনালিও থানায় যাবে না। বারণ করেছি। আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু অসম্মানকর উক্তি করেছেন। তাতে আপনি আপনার রুচির পরিচয় দিয়েছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সোনালিকে ভয় দেখিয়ে ফোন করার ব্যাপারটা মানা যায় না। এটা গুরুতর অন্যায়। আইন অমান্য করা। আপনি যদি বলবন্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তার হয়ে দালালি করতে থাকেন, সোনালিকে ভয় দেখাতে থাকেন, তবে পুলিশ কমিশনারের কাছে আপনার বিরুদ্ধে আজই অভিযোগ জানাব ফ্যাক্সে। কপি-টু চিপ মিনিস্টার করে তাঁর কাছেও একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে দেব। আমি এর শেষ দেখতে চাই।

ও সি সাহেব কী বুঝলেন কে জানে, কিন্তু তাঁর হিটলারি মেজাজ পালটে মুহূর্তে সুরেলা লতা মঙ্গেশকর। প্রায় পুলিশ-ই বেড়াল। নরম মাটি পেলেই আছড়ে ফালা ফালা করে ছাড়ে।

এক ঘণ্টাও কাটেনি, তালতলা থেকে ফোন জানাল—বলবন্তকে ধরে আনা হয়েছে থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আধ ঘণ্টা পরে আমি-ই ফোন করলাম—জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কাল-ই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্রডিউস করব,

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ওঃ লড়াইয়ের একটা পর্যায় শেষ হল।

৩ মার্চ রবিবার। মনে হয়েছিল আজকের কোনও খবরের কাগজেই খবরটা প্রকাশিত হবে না। কারণ কাল বলবন্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাতে। তার আগেই পত্রিকাগুলো লালবাজারে ফোন করে বিভিন্ন থানা এলাকার ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করে নিয়েছে। শনিবার প্রায় সন্ধে রাতেই থানাগুলোর খবর সংগ্রহ হয়ে যায়। কারণ, রবিবারের কাগজ মানেই বিজ্ঞাপনে ঠাসা। খবরের চেয়ে বিজ্ঞাপন দামি। রবিবার খবর থাকে অন্যান্য দিনের অর্ধেক। অবাক হলাম 'আজকাল'-এ গোটা খবরটা প্রকাশিত হতে দেখে। শিরোনাম, 'জ্যোতিষী শ্রীঘরে'।

৩ মার্চ-ই একাধিক টি ভি চ্যানেল যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে খবরটা পরিবেশন করল।

৪ মার্চ সোমবার। কলকাতা থেকে প্রকাশিত যে ভাষার-ই দৈনিক খবরের কাগজ খুলি, তাতেই দেখি বিশাল করে খবরটা ছাপা হয়েছে। আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমস—কে নেই? হিন্দি ও উর্দু পত্রিকাও পিছিয়ে নেই।

দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার 'কলকাতা টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় রঙিন ছবি সহ বলবন্তের গ্রেপ্তারের খবরটা ছাপা হয়েছে ছ'কলাম জায়গা জুড়ে। এই কাগজটির উল্লেখ করার কারণ, এখানে অ্যাডিশনাল ইনসপেক্টর নন্দদুলাল পাল আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসারের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বলবন্ত সম্পর্কে শ্রী পালের বক্তব্য হিসেবে পত্রিকায় বলা হয়েছে, "He is a genuine Babaji. He's told me certain things which even my wife does not know." এরপর পত্রিকায় আরও কয়েকজনের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। "Pal was not the only one to be charmed by Babaji. other officers were also convinced that he was not a "fake sadhu". খুবই ইঙ্গিতবহ মতামত। তালতলার থানার পুলিশ অফিসাররা একজন প্রতারক আসামিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, "ও একজন খাঁটি বাবাজি", "ভণ্ড সাধু নয়" বলে। সত্যিই—"মেরা ভারত মহান..."

৩ মার্চ রবিবার বলবন্তকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারক আশিস মৈত্রের এজলাশে তোলা হয়। বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

খবরের মধ্যে খবর—বলবন্তকে গ্রেপ্তার করলেও গত ৩ মাস ধরে লোক ঠকিয়ে আসা টাকার কোনও হদিশ পুলিশ পায়নি। 'আজকাল' পত্রিকায় ৫ মার্চ ২০০২-এ এ'খবর প্রকাশিত হয়েছে।

টাকাগুলো কোন্ সাদা হাঙরে গিলল—কে জানে?

বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী'র বিস্ময়কর পরাজয় এবং...

আপনি বেকার? সরকারি চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে? স্কুলের চৌকাঠ পেরুতে পারেননি? বিগত যৌবনা কলগার্ল বা রক্ষিতা? সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে মাসে ৩ থেকে ৩০ লাখ টাকা রোজগার করুন।

জ্যোতিষী হবার কিছু টিপস্

(১) নিজের চেম্বার নিজে খুলুন। রত্ন-ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়বেন না। ওরা পাথর বিক্রির ওপর শুধু কমিশনটুকু ধরিয়ে আপনার হাড়-মাস চিবিয়ে খাবে। চেম্বার খুলুন কলকাতায়। কোনও কারণে সে স্বপ্ন সফল করতে না পারলে চেম্বারের জন্য বেছে নিন এইসব শহরের যে কোনও একটি। যথা—শিলিগুড়ি, মালদা, আসানসোল, বারাসত বা হাওড়া। কালো টাকা উড়ছে। ডন, স্মাগলার ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা খলবল করছে। খেপলা জাল ফেলুন আর ধরুন। ওরা ঠকার জন্য, ধরা দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করছে। একটু ঢপ দিলেই কালো টাকার কুমির বনে যাবেন।

(২) জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক হওয়ার জন্যে কোনও বিদ্যের দরকার হয় না। একটু বুদ্ধি থাকলেই চলবে। ধূর্ত হলে চলবে কী মশাই, দৌড়বে।

প্রথমে কোনও জ্যোতিষ সংস্থা থেকে ইচ্ছেমতো ডিগ্রি, স্বর্ণপদক, পি. এইচ. ডি. বা উপাধি কিনুন। এসমস্ত কিনতে পাওয়া যায় নগদ দামে। এরজন্য ওইসব সংস্থায় পড়াশুনোর কোনও দরকার নেই।

(৩) কিছুই না শিখে জন্মছক বানাবেন কী করে—ভাবছেন? এরও ব্যবস্থা আছে। ৫০ থেকে ১০০ টাকায় ছক করে দেবার মতো লোকের অভাব নেই। তাদের কোথায় পাবেন? আপনার চেম্বারে তারাই আসবে কাজের খোঁজে। শুধু চেম্বার খোলার ওয়াস্তা।

(৪) অলৌকিক মাতা, তন্ত্রসিদ্ধ, কামাখ্যাসিদ্ধ, বাকসিদ্ধ, মামলাসিদ্ধ, বশীকরণসিদ্ধ, মহামৃত্যুঞ্জয়সিদ্ধ, গজলক্ষ্মীসিদ্ধ, নীলসরস্বতীসিদ্ধ— কোনটায় স্পেশালিস্ট হতে চান? আজকাল স্পেশালিস্টদের যুগ। স্পেশালিস্টদের পিছনে ছুটছে পাবলিক। আপনার পিছনে পাবলিককে দৌড় করাতে হলে আপনাকে স্পেশালিস্ট হতেই হবে। আপনিই ঠিক করুন কোনটায় স্পেশালিস্ট হতে চান।

এ'বিষয়ে আমার একটা পরামর্শ আছে। শিলিগুড়ি হল স্মাগলার, ড্রাগ মাফিয়া ও আর্মস মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল। আসানসোল, রানিগঞ্জে কোল মাফিয়াদের রাজ। হাওড়ায় লোহার ছাঁট নিয়ে ডনদের আকচা-আকচি। ভারত-বাংলাদেশ চোরাকারবারিদের মিলনক্ষেত্র হল বারাসাত। এইসব জায়গায় মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের হেভি ডিমান্ড। পুলিশ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে মাফিয়াদের বন্দোবস্ত করা আছে। ঝাড়টা আসে পাল্টা মাফিয়া গ্রুপের কাছ থেকে। লড়াইটা এলাকা দখলে রাখা নিয়ে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ করলে অপঘাতে মৃত্যু নেই জানলে হিরের দামে কবচ কিনবে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওইসব এলাকায় বসলে মাসে দশ-বিশ লাখ আয় বাঁধা।

সরস্বতী কবচের মার্কেট সিজিনাল। পরীক্ষার সময় চাহিদা বাড়ে।

বশীকরণ কবচের চাহিদা শহর কলকাতায় দারুণ। বৃদ্ধ বস থেকে হরিপদ কেরানি, অভিনেতা থেকে মডেল গার্ল, কলকাতায় কলেজ পড়ুয়া থেকে প্রফেসার, তিন সন্তানের মা থেকে মন্ত্রী সবাই আসেন বশীকরণ কবচের টানে। এঁদের কেউ 'অন্ধপ্রেম'এ মশগুল, কেউ বা বশ করে ক্যারিয়ার গোছাতে চান।

অলৌকিক মাতাজি হয়ে বসতে পারলে দশ হাতে লুটে-পুটে খাওয়া যায়। মন্ত্রী থেকে মস্তান, ডাক্তার থেকে ফিল্মস্টার সবাই আপনার শ্রীচরণের স্পর্শ পেলে ধন্য হয়ে যাবে। এই শর্মা একটুও মিথ্যে বলছে না।

অনেক জ্যোতিষী বড়োবাজার থেকে গ্রোস দরে হোয়াইট মেটাল বা অ্যালুমেনিয়ামের তাবিজ-কবচ কেনে। আপনি প্লিজ একটু খরচা করুন। সোনা-রুপোর ছোট দোকান থেকে মাল কিনুন, কর্মচারিকে দিয়ে বেলপাতা বা জবাফুল ঠ'সুন। মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করুন। মোট খরচ ২০ থেকে ৩০ টাকা। নেবেন ২ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা। চিন্তা করবেন না। পাবলিক দেবেও।

স্পেশালিস্ট হতে আপনার ইচ্ছেই শেষ কথা। এই অধমের পরামর্শ—আপনি কোন্ শহরে বসবেন, সেটা মাথায় রেখে ইচ্ছেটা ঠিক করুন। তারপর ঢেলে বিজ্ঞাপন দিন। পত্র-পত্রিকায়, চ্যানেলে, পোস্টারে, ব্যানারে, হোর্ডিং-এ, সিনেমায় সর্বত্র বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করে দিন। প্রচারের বান ডাকলেই দেখবেন, চেম্বারের বাইরে কাঙালি ভোজনের ভিড়।

(৫) ঝড় তোলা বিজ্ঞাপন কী করে লিখবেন ভাবছেন? লিখতে গেলে কলম ভাঙে? এতো প্রায় সব জ্যোতিষীদেরই সমস্যা। প্রায় সব্বাই স্কুলের চৌকাঠে হোঁচট

খাওয়া। জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন লেখার বিশেষজ্ঞ লোক আছে। আপনাকে তোয়াই দিয়ে এমন লিখবে যে পড়ে লজ্জা পেয়ে যাবেন। বিজ্ঞাপনে আপনার কাছে উপকার পাওয়া মানুষের বিরাট তালিকা দেখে আপনার চোখ কপালে উঠতেই পারে। ভাবছেন এরা কারা? এরা কেউ নয়। অস্তিত্বহীন। প্রথম প্রথম আগাপাশতলা মিথ্যে প্রচার দেখে একটু লজ্জা পেতেই পারেন। পরে দেখবেন চোখের চামড়া পুরু হয়ে গেছে। "ইসি কা নাম জিন্দাগী।"

(৬) টিভিতে নিজের ঢাক পেটাতে চান? হবে। নিজের গ্যাঁটের টাকায় কোনও চ্যানেল থেকে টাইম-স্লট কিনতে হবে। নিজের টাকায় স্যুটিং করতে হবে। চ্যানেলে ক্যাসেট পৌঁছে দিতে হবে।

ভাবছেন টিভি চ্যানেলে সময় কিনতে চাইলেই পাবেন কি না? আলবাৎ পাবেন। একটায় না পান আর একটায় পাবেন। একগাদা টিভি চ্যানেল বেশ্যা মাগির মতো দরজা খুলেই বসে আছে। ওদের নীতি— "ফেল কড়ি, মাখ তেল। কেউ কী আমার পর?" একবার চেম্বারের সাটার খুলুন, দেখবেন বিভিন্ন চ্যানেলের দালালরা আপনাকে জপাতে হাজির হয়ে গেছে। (তাইতো ভালো প্রোগ্রামের এত আকাল। বিজ্ঞান-প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে জানতে হলে খুলতে হবে 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক', 'ডিসকাভারি'র মতো বিদেশি চ্যানেল।)

সরাসরি ফোন লাইনে প্রোগ্রাম করতে চান? চ্যানেল আপনাকে এক ঘণ্টা সময় দেবে। সঙ্গে গ্যারান্টি দেবে, উল্টো-পাল্টা ফোন এলে কেটে দেবার। আপনি 'বাকসিদ্ধ' হতে চান। তা বানাবার ব্যবস্থাও রেখেছে চ্যানেল। তবে খরচা বেশি পড়বে। চ্যানেলের স্টুডিওর পাশের ঘরেই হাজির রাখবে একগাদা নারী-পুরুষ। তারাই পাশের ঘর থেকে ইন্টারকমে আপনাকে ধরবে। শোনাবে, আপনার নিখুঁত ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে কতটা অভিভূত— তার ফিরিস্তি। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। রাতারাতি পসার জমে কুলপি।

(৭) আপনার টিভি প্রোগ্রাম তৈরি করতে ডিরেক্টর চাই? পাবেন। তারাই আপনার চেম্বারে এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে কথা বলবে। আপনি 'জল উঁচু' বললে ওরাও বলবে, 'জল উঁচু'। 'জল নিচু' বললে বলবে, 'জল নিচু'। ওরা জানে ডিরেক্টর, হওয়ার প্রথম শর্তই হল—প্রডিউসরের চামচা হতে হবে।

(৮) আপনার প্রোগ্রামের সঞ্চালক বা অ্যাঙ্কার কাকে করা যায়, এই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন? চেম্বারে বসার আগে এ'নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ডিরেক্টরই অ্যাঙ্কার যোগার করে দেবেন। দেখবেন আবৃত্তি জগতের কত রথি-মহারথি লাইনে দাঁড়িয়ে।

(৯) এত কিছুই যখন না ভেবেই হয়ে গেল, তখন ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক নিয়েও ভাবনার কিছু নেই। হই-চই ফেলে দেওয়া গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কাকে চাইছেন— শুধু ঠিক করুন। বাকিটা টাকা ঠিক করে দেবে।

(১০) স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা ভালো। আজকাল যুক্তিবাদীর বড্ড বেড়েছে। কিছু পাবলিক ওদের কথা খাচ্ছেও ভাল। তাই তো অনেক চ্যানেল প্রায়ই জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের লড়িয়ে দিচ্ছে। যুক্তিবাদীদের নাম শুনলেই প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন, যতই চ্যানেল সাধাসাধি করুক না কেন। কিন্তু তাতেই যে যুক্তিবাদীদের আক্রমণ এড়াতে পারবেন, এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। কখন যে আপনাকে ৪২০ বলে প্রমাণ করে পুলিশের হতে তুলে দেবে, আর মিডিয়া তা দেখাবে, বুঝতেই পারবেন না। বাঁচতে থানা ও স্থানীয় ক্লাবকে 'দেখুন'। বিপদে ওরাও দেখবে।

(১১) 'বিফলে মূল্য ফেরত পাবেন'—বিজ্ঞাপনে এমন চমক দিন। দেখবেন, পাবলিক দারুণ খাবে। হয় ফল পাব, নতুবা টাকা খরচ হবে না—এমন ভাবনা-ই খদ্দেরদের রান্নাঘর থেকেও টেনে আনবে।

ওই স্লোগান শুধু কথার কথা। আপনাকে কোনও মূল্যই ফেরত দিতে হবে না। যারা দাম ফেরত চাইতে আসবে, তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাট্টু বানিয়ে দিন। একসময় ঘোরা থামিয়ে কাত হয়ে পড়বে। পার্টি একটু টেঁটিয়া হলে ভিজিয়ে কথা বলুন। জিজ্ঞেস করুন, 'যন্ত্রম ধারণের পর তিন দিন আমিষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খেয়েছিলেন তো?' অথবা পরনারী/পরপুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছিলেন তো? এই ধরনের প্রশ্নেই রয়েছে বাজিমাত করার সব মশলা। আমিষের স্পর্শ বাঁচাবেন কী করে? বাজার থেকে চাল-ডাল-আনাজ আনবার সময় কোনও মাংস বা মাছের ব্যাগের ছোঁয়া লাগেনি—এর গ্যারান্টি কোথায়? না, এর কোনও গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। শহরে বা মফস্‌সলে থেকে ছেলে-মেয়ে বেছে স্পর্শ বাঁচিয়ে বাসে-ট্রেনে-রাস্তায় চলা বিলকুল না-মুনকিম। অতএব আপনার মূল্য ফেরতের গ্যারান্টি রক্ষা পেল। প্রয়োজনে এমনি আরও অজুহাত বানান।

টাকা ফেরত না পেলে দেখে নেবে বলে শাসাচ্ছে? থানায় ফোন করুন, ক্লাবকে খবর দিন। আপনার ওইসব আপনজনরাই অবস্থা সামলে দেবে।

হ্যাঁ, এই শর্মার একটি উপদেশ মনে রাখবেন। বড় মাপের পুলিশ-কর্তাদের ফোন মাঝে-মধ্যে পাবেন। আত্মীয়র কাজ হয়নি। টাকা ফেরত চাই, এই হল ফোনের মোদ্দা কথা। টাকা ফেরত দিতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

(১২) 'বিনা রত্নে স্থায়ী প্রতিকার' স্লোগানটা খুব জমেছে। অনেকেই দিচ্ছে। কামাচ্ছেও দারুণ। গ্রহরত্নের পরিবর্তে যা খুশি দিন। কেজি দরে কড়ি কিনে ফুটো করিয়ে নিন। কড়ি পিছু খরচ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সা। 'ধনদা কবচ', 'মহালক্ষ্মী' কবচ বলে কড়িগুলো তিন থেকে দশ হাজারে বেচুন। রুপোর কবচ বানিয়ে তার উপর কতকগুলো যা খুশি জ্যামিতিক চিহ্ন আঁকিয়ে নিন। তারপর ওগুলোকে তারা যন্ত্রম, সরস্বতী যন্ত্রম ইত্যাদি বলে বেচে দিন। সবাই এখন cult সংস্কৃতি নিয়ে মেতেছে। এই তো সুযোগ!

(১৩) বিখ্যাত জ্যোতিষী হতে ভালো ভবিষ্যৎ বক্তা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। আপনাকে বিখ্যাত করতে পারে শুধু প্রচার। প্রচারের আলো নিজের উপর ফেলুন। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন।

FULL REFUND ON FAILURE

For rapid success in business use
MAHASHAKTI SHIDDHI YANTRAM

Special Treatment for
DIABETES, ASTHMA & ARTHRITIS

Permanent Solutions Without Stones
For any problem :

Marriage • Business • Service • Education • Family • Legal matters in LIFE

Internationally Famous

Dr. Shrabani Debnath

"Jyotish Shiromony", "Jyotish Bharati", "Jyotish Mahavidyarnava" (Gold Medalist)

KOLKATA • DELHI • CHENNAI

* BF 199, Salt Lake, Tel : 2359 5726
Mon & Sat 9am-2pm, Tue-Thur 4-8pm,
Sun 1-5pm

* G6, Gariahat Market, Tel:2440 1475
Mon & Sat 3-8pm, Wed 12-3pm

A6, Saharan Market, Baguihati
Tel : 2576 7278
Tue & Thur 10am-2pm

5B, Raja Rajnarayan Street, Kolkata-9,
Tel: 2350 3734
Fri 10am-2pm, Sun 10am-12pm

Chennai : 2825 2803 Delhi : 2648 3279/2622 8968

(১৪) বিজ্ঞাপনে দেখবেন কেউ ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর কথা আগাম ঘোষণা করেছিলেন। কেউ বা রাজীব গান্ধির। আপনিও এমনি বাজার গরম করা বিজ্ঞাপন ছাড়তে পারেন। এর জন্য আপনাকে একটা ছোট ম্যাগাজিনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সম্পাদককে করতে হবে আপনার দাস। তারপর সব কিছু সহজ সরল। এই ধরুন, সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী সরকারের পতন ঘটল। ঘটনা ঘটার পর শুরু হবে আপনার খেলা।

লিটিল ম্যাগাজিন যখন, তখন নিশ্চয়ই বছরে দু-চারটের বেশি সংখ্যা প্রকাশিত হয় না এবং সময়েও প্রকাশিত হয় না। আর পাঁচটা ছোট পত্রিকার মতো এই পত্রিকাটির একই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই এবার আপনার কাজে লাগবে মায়াবতী সরকার পড়ে যাওয়ার পর বের করুন জুলাই বা আগস্ট সংখ্যা। তাতে লিখে ফেলুন—সেপ্টেম্বরের গোড়াতে মায়াবতী সরকারের পতন ঘটবে।

সব ভবিষ্যৎ বক্তাই এমন করে। আপনিও করুন। পসার আরও বাড়বে।

(১৫) পসার জমে গেলে নিজেও একটা জ্যোতিষ শিক্ষাকেন্দ্র খুলে ফেলুন। আপনাকে কিছুই শেখাতে হবে না। এখান থেকে শুধু সোনার চেয়ে বেশি দামে 'স্বর্ণপদক', নানা উপাধি ইত্যাদি বিক্রি করা হবে। স্টেডি ব্যবসা। ভালো টাকা।

(১৬) গত মাস ছ'য়েকের জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে লক্ষ রেখেছেন? নিশ্চয়ই ভালো করে লক্ষ রাখেননি। দৈনিক পত্রিকাগুলোর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন তলানিতে নেমেছে। প্রায় সবাই রাতারাতি 'তান্ত্রিক' বনে গেছে। জ্যোতিষীরাই গোত্রান্তর ঘটিয়ে তান্ত্রিক হয়েছে। কেন জানেন না? জেনে

নিন। জ্যোতিষীদের পেশাটা বে-আইনি। তাই জ্যোতিষচর্চাকে পেশা দেখিয়ে 'বৃত্তিকর' দিতে গেলে সরকার নিচ্ছে না। এই পুরো গোলমালটাই ঘটিয়েছে যুক্তিবাদী সমিতি। সুতরাং আইন বাঁচিয়ে পকেট কাটতে আপনিও তান্ত্রিক হয়ে বসে জ্যোতিষীর কাজকর্ম চালিয়ে যান।

(১৭) তান্ত্রিকদেরও ধরে ধরে যেভাবে যুক্তিবাদীরা গ্রেপ্তার করাচ্ছে, তাতে একটু ভয়ের তো কারণ আছেই। কিন্তু চুরি করব অথচ গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেব না—এ হয় নাকি? তাই ভালো ক্রিমিনাল ল্য ইয়ারের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে।

(১৮) তান্ত্রিক হয়ে বসে নিজের রক্ত জল করে মাসে মাত্র দশ-বিশ লাখ রোজগার করছেন, তাতেই থাবা মারবে ইনকাম ট্যাক্স। অবশ্য ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ারও ফুল প্রুফ ব্যবস্থা আছে। আপনার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে একটা ধর্মীয় ট্রাস্ট তৈরি করে ফেলুন। আপনি থাকুন নৈবেদ্যের চূড়োয় কলার মতো, সবার উপরে। ট্রাস্টের নিয়ম-কানুন এমনভাবে তৈরি করবেন, যাতে ট্রাস্টের টাকা যথেচ্ছ খরচ করার পুরো অধিকার আপনার থাকে। ট্রাস্টই আপনার স্কচের বোতল থেকে বিদেশে মৌজ-মস্তির খরচ জোগাবে। এই চালে চলছে অনেক মিশন থেকে আশ্রম। অধুনা এই চালে পা মিলিয়েছে কিছু তান্ত্রিক। ইনকাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে একেবারে কিস্তি মাত চাল।

(১৯) রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। সুযোগ আসবেই। অনেক রাজনীতিকই আপনার কাছে আসবে। ডান, বাম বাছবিচার না করে সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করুন। আখেরে লাভ হবে। অথবা নিজেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এটাই এখন সর্বাধুনিক হাওয়া। শুধু গেরুয়া হাওয়া নয়, লাল হাওয়াও।

দেশ যখন চরম বেকার সমস্যায় ধুঁকছে, তখন বেশ্যাবৃত্তি, জ্যোতিষবৃত্তি, ও তন্ত্রপেশার মতো স্বনির্ভর পেশাকে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই সুরে সমাজবিজ্ঞানীদের দিয়ে বলাতে হবে। মন্ত্রীরা শুধু জ্যোতিষ সম্মেলন উদ্‌বোধন করেই তাঁদের দায়িত্ব খালাস করতে পারেন না। জ্যোতিষ পেশাকে স্বনির্ভর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। জ্যোতিষীদের আজ বড় দুঃসময়। এই সময় রাজনীতিকদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করার বড়োই প্রয়োজন। যুক্তিবাদীদের দাবিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন।

জ্যোতিষীদের দেখভালে-রাজনীতিকরা

অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। রাত দুপুরে একটি ফোন এলো। ফোন করলেন এই বঙ্গের গব্বর সিং। তিনি বামফ্রন্টের মহাক্ষমতাবান এক মন্ত্রীর শক্তির উৎস। নো ধানাই-পানাই। সরাসরি জানিয়ে দিলেন, ওমুক জ্যোতিষী মন্ত্রী মহোদয়ের খুব

কাছের লোক। আমি যেন দেখি। ওইটুকু বলেই লাইন কেটে দিলেন। বুঝলাম জ্যোতিষীর সঙ্গে মন্ত্রীর লাইন ভালোই আছে।

যে ভাবে মাঝে-মধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিকদের পুলিশ ধড়পাকড় করছে, মিডিয়া টিভিতে দেখাচ্ছে, তাতে মন্ত্রী আশ্রিত জ্যোতিষী ভয় পেয়েছেন, বুঝলাম। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে নির্লজ্জ দালালিতে নামবেন মার্কসবাদী মন্ত্রী ও তাঁর মস্তান? এই মার্কস বাদ দেওয়া মার্কসবাদীদের সত্যিই বুঝি না।

জ্যোতিষী ও অবতারদের পিছনে লেগে থাকাটা আমাদের সমিতির চরম কোনও লক্ষ্য নয়। জ্যোতিষী ও অবতারদের ক্ষমতার গল্পটা যে পুরোপুরি গল্প—এই সত্যটা মানুষ বুঝতে শিখুক, এটা আমরা চাই। চাই—কারণ আজও বেশির ভাগ ভারতীয় মনে করে, মানুষের বঞ্চনার কারণ ভাগ্য, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি। অথচ এই ধারণা আদৌ সত্যি নয়। সত্যি হল—এই সমাজ কাঠামো এ'ভাবেই তৈরি, যেখানে বেশির ভাগ মানুষকে বঞ্চিত না করলে কিছু মানুষ সুইস ব্যাংকে টাকা জমাতে পারে না।

জ্যোতিষী ও অবতারদের 'মিথ' ভাঙতে ওদের বুজরুকি ফাঁসের একটা প্রক্রিয়া আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমিতির কাজ এই নয় যে, সব বুজরুকদের নাঙ্গা করতে হবে। কারণ কুসংস্কার মুক্তি আমাদের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। লক্ষ্য কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে যে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকে আছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে আঘাত করা।

পিলু ভট্টাচার্য পেশায় গায়ক। সমাজসেবার পাগলামি আছে। একটি গরিব মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টাকার অভাবে। শুনে নিজে মেয়েটির গয়নার খরচ যুগিয়েছেন। বন্ধুদের কাছ থেকে গাড়ি, বরের পোশাক, আসবাব ইত্যাদি জোগাড় করেছেন। তারপরও পড়ে আছে অনেক খরচ। সমস্যা শুনে পিলুর এক বন্ধু পিলুকে নিয়ে গেলেন হবু বউয়ের ফ্ল্যাটে। হবু বউ নামী জ্যোতিষী। মাস গেলে রোজগার নাকি পনেরো থেকে পঁচিশ লাখ।

পিলু অবশ্য সাহায্য পাননি। কিন্তু নতুন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন। মহিলা পিলুকে নাকি বলেছিলেন, রক্ত জল করে আয় করতে হয়। এ'টাকা যাকে খুশি দান-খয়রাতের জন্য নয়। আরও নাকি বলেছিলেন—আপনার বন্ধুকে পরের ধনে পোদ্দারি করতে বারণ করবেন। যাওয়ার আগে জেনে যান, আমি ভিক্ষে দিই না।

পিলু রাজনীতি করা মানুষ। সুতরাং এমন অপমান সহ্য হবে কেন? একটু গরম হয়েছিলেন। মহিলা তাঁর পাশে দাঁড়ানো একজনকে দেখিয়ে নাকি বলেছিলেন—একে চেনেন?

না চেনার কোনও কারণ ছিল না। একই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত দু-জনেই।

ভদ্রলোক প্রাক্তন এম এল এ। কিন্তু এবার পিলুকে যা শুনতে হল, তার জন্য বেচারা আদৌ তৈরি ছিল না। মহিলা না কি বলেছিলেন—গরম দেখাবেন না। আমি একবার বললে উনি আপনার গরম ভেঙে দেবেন।

প্রাক্তন এম এল এ'র শরীরী ভাষা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছিল—আমি ওর পাশে আছি।

মার্কসবাদী মন্ত্রীরা আগে প্রকাশ্যেই জ্যোতিষ সম্মেলনে যেতেন। প্রশংসা করতেন এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসকে। কোনও কারণে যেতে না পারলে সরকারি প্যাডে গদ্গদ ভাষায় চিঠি কম্পোজ করে পাঠাতেন। অমূল্য ও'সব দলিল জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থে ছাপতেন।

যুক্তিবাদীদের চেল্লামিল্লিতে মার্কসবাদী মন্ত্রীরা এখন প্রকাশ্য ছেড়ে নেপথ্যে গেছেন। কিন্তু জ্যোতিষীদের সঙ্গে রাজনীতিকদের ফেবিকলের জোড় অটুট রয়েছে।

হ্যাঁ, একটা সাবস্টোরি মনে পড়ে গেল। পিলুর সঙ্গী ছিলেন জ্যোতিষীর হতে যাওয়া বর—সে কথা তো আগেই বলেছি। যা বলিনি তা হল—জ্যোতিষী আবার প্রজাপতিসিদ্ধ। অর্থাৎ বিয়ে দেওয়ায় স্পেশালিস্ট। পিলুকে অপমানিত করার হপ্তা তিনেক আগের একটা ঘটনা। রাত ১১টা। পিলু এলেন। আবদার—ওঁর একটি অনুরোধ রাখতে হবে। না শুনে কথা দিই কী করে। শেষ পর্যন্ত অনুরোধ শুনলাম। ওঁর এক বন্ধু বিয়ে করতে যাচ্ছেন এক জ্যোতিষীকে। আমি যেন বন্ধু পত্নীর পিছনে না লাগি। জ্যোতিষীর নাম শুনলাম। শুনে কথা দিলাম, "ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। যত দিন জ্যোতিষীটি তোমার বন্ধু পত্নী থাকবে, ততদিন পিছনে লাগব না। খুশি তো? ওই মাস ছয়েক আমি না হয় ওকে ছেড়ে অন্য দিকে নজর দেব?

পিলু রসে টইটম্বুর ছেলে। বড় বড় চোখ করে বললেন, "কী বলতে চাইছো গুরু? ওদের বিয়ে ছ'মাসের বেশি টিকবে না?"

"আর ধু-র। ছ'মাস টিকে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। এর আগের দুটো বিয়ে তিন মাসও টেকেনি।"

পিলুর বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগেই সম্পর্ক সম্ভাবনা ভেঙে যায়।

এই জ্যোতিষী সম্পর্কে তাঁরই বান্ধবী রেইকি সম্রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী বলেছিলেন—ও বাবা, ওতো বিয়ে পাগলি হয়ে গেছে। নিজের একটা স্টেডি হাসবেন্ড জোগাড় করতে পারছে না, অন্যদের প্রজাপতি কবচ দিচ্ছে?

জ্যোতিষীদের ধসাতে ফাঁদ চাই ফাঁদ

একবার পরীক্ষায় নামাতে পারলে পর জ্যোতিষীদের নাক ঘষে দেওয়া খুব সোজা। নামানোটা অবশ্য একটু কঠিন। 'বাংলা এখন' চ্যানেল 'নারদ নারদ' একটা অনুষ্ঠান

করতে চায়। এক ঘন্টার 'লাইভ' প্রোগ্রাম। আমি তো রাজি হলাম। কিন্তু সমস্যাটা হল আমার বিরুদ্ধে বসাবার মতো জ্যোতিষী পাওয়া নিয়ে। জ্যোতিষীর যেন আকাল পড়েছে। শেষে একজন পাওয়া গেল। প্রিয়াংকা। তাঁর আবার এক বায়নাক্কা আছে। আগে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর জানাবেন নারদ নারদে অংশ নেবেন কিনা।

আমাকে ফোন করলেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন। ভালোমতোই বুঝে গেলেন আমার দৌড়। অতএব ফুরফুরে মেজাজে রাজি হয়ে গেলেন।

ওই সরলতায় ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

যাঁরা আমার নাম শুনেই জানিয়ে দেন—"আমি নেই", তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা আমার বিরুদ্ধে তাল ঠোকার আগে আমাকে একবার মেপে নিতে চান তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে দ্রুত পড়ে নেন। বুঝে ফেলেন আমার 'দৌড়'। অতএব দুর্বল মাটিতে আঁচড়াবার লোভ সামলাতে পারেন না। আমার 'দৌড়' বোঝানোটা সেই ফাঁদ।

টিভি অনুষ্ঠানে হার স্বীকার করার মূল্য হিসেবে আমি কত টাকা চাই—এই মোদ্দা কথাটা কোনও জ্যোতিষী সোজাসাপটা জিজ্ঞেস করেছেন, কেউ জিজ্ঞেস করেছেন দালাল মারফত। এক ভারী মহিলা জ্যোতিষী আমার সঙ্গে কথা-টথা বলে একটা টিভি অনুষ্ঠান করতে রাজি হলেন। অনুষ্ঠানের শ্যুটিং ডেটের দিন দুয়েক আগে আমাকে একটা আংটি উপহার দিলেন পরম ভালোবেসে। সোনার ওপর চুনী বসানো আংটি। কে জানে, কী ছিল মনে। হয়তো বা আশা করেছিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি হেরে যাবো। যে তিন জনের হাত দেখিয়ে প্রশ্ন করব, তাদের উত্তরগুলো জানিয়ে দেব, এমন প্রত্যাশা হয়তো ছিল। রেকর্ডিং শেষে যখন বুঝলেন 'হেরে ভূত কিম্ভূত', তখন তাঁর সে কী রাগ? রাগ হবার-ই কথা। ব্যাটা আংটি নেবে, আবার হারিয়েও দেবে? আমাকে ফোন করেও এই ক্ষোভ জানালেন ভারী জ্যোতিষী। বলেছি—কী মুশকিল আপনি আমাকে বলবেন তো, 'আমি আপনাকে আংটি দিলাম, বিনিময়ে আপনি আমাকে জয় দেবেন।' তাহলেই ল্যাঠা চুকে যেত। আপনাকে আর এমন মনকষ্ট নিয়ে থাকতে হত না। আংটি নিতাম না। আংটি নেওয়াটা ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

আর এক জ্যোতিষী অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর দিন কয়েক আগে আমার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। অফারটা ভালোই—একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে করতে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমি আবার পরের পয়সায় মদ খাই না। সুযোগ পেলেই বিনেপয়সায় আকণ্ঠ মদ্যপানের মধ্যবিত্তসুলভ আচরণ আমার অসহ্য ঠেকে। আমি রাজি না হওয়ায় ঘাবড়ে গিয়ে তিনি আমার বিপরীতে টিভিতে নামলেন-ই না। তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন, আমি ঘুষ নিলাম না। স্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

আজ অবধি ১৬০ জনের উপর জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি। মুখোমুখি হয়েছি রেডিওতে, টিভিতে, মঞ্চে। সব জায়গায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে—জ্যোতিষশাস্ত্র আসলে স্রেফ বুজরুকি। পকেট কাটার মতো, প্রতারণা শিল্পের মতোই একটা শিল্প। এদের থাকার সঠিক জায়গা হল জেলখানা।

চ্যালেঞ্জগুলোতে জ্যোতিষীদের সামনে হাজির করেছি দু-চারজন লোক—যাদের হাত দেখে অতীত জীবন নিয়ে কিছু বলতে হবে। এইসব জ্যোতিষীদের জ্ঞানের বহর আমজনতার কাছে তুলে ধরতে চ্যালেঞ্জ করেছি অত্যন্ত সহজ শর্তে। কাঁটায় কাঁটায় কিছুই মেলাতে হবে না। বিয়ের বয়স বলতে গিয়ে পাঁচ বছর কম, বা পাঁচ বছর বেশি বললেও হারবো। আয়ের বেলায় পাঁচ হাজার টাকা কম বা বেশি বললেও হার হবে আমার। এত সুবিধে পাওয়ার পরও কোনও জ্যোতিষী আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জিততে পারেনি। কারণ, জ্যোতিষীরা যে সাধারণ জ্ঞান থেকে মানুষের সম্বন্ধে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে, তা আমি জানি। জানি এসব বলতে কোনও শাস্ত্র লাগে না। ওদের ভুল করাতে আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সাধারণ জ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছি। আর মুখোমুখি বসাতে পেতেছি ফাঁদ।

নাকে খত দেওয়া এইসব জ্যোতিষীরা আমার মুখোমুখি হওয়ার আগে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন, দ্বিধায় ভুগেছেন। লোকটার বিরুদ্ধে নামব কি? জিততে পারলে অচিন্ত্যনীয় লাভ। সব জ্যোতিষীদের টেক্কা মেরে এক লাফে কুবের। এই ধরনের চিন্তা থেকে আমার সঙ্গে একটু কথা বলে আমাকে কিছুটা বুঝতে চেয়েছেন। তারপর, ফোন করেছেন। একাধিকবার অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা হয়েছে। তারপর অবাক হয়ে ভেবেছেন—এই ব্যাটার কাছে কী করে যে জ্যোতিষীরা হেরেছেন, ভগবান জানেন? এর কাছে তো হারাই কঠিন। জয় সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমার বিরুদ্ধে টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।

এই রাজি করানোটাই কঠিন। রাজি করানোর স্বার্থে নিজের অহমিকার গলা টিপে কিছুক্ষণের জন্য বোকা হয়ে যান। পারবেন।

বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার ঝঞ্ঝাট

যুক্তিবাদী আন্দোলন আমার প্রথম প্রেম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। জ্যোতিষী, বুজরুক বাবাজি-মাতাজিদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছি। নামলেই বাঘ আমাকে খাবে। যতক্ষণ জিতব, ততক্ষণ বাঁচব। হারলেই একগাদা লোক আমার পিছন পিছন কালি ছিটোতে ছিটোতে যাবে। বলবে, ঘুষ খেয়েছি। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শেষ করতে হামলে পড়ার মতো স্বার্থান্বেষী, হুজুগে, কানপাতলা, ঈর্ষাকাতর কাঁকড়ার অভাব নেই।

এ'সব লিখতে গিয়ে একটা ভয়ংকর স্মৃতি ভেসে উঠল। ২১ এপ্রিল ১৯৮৯ সাল। আনন্দবাজার ও আজকাল পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল। ছবিটি

করতে চায়। এক ঘণ্টার 'লাইভ' প্রোগ্রাম। আমি তো রাজি হলাম। কিন্তু সমস্যাটা হল আমার বিরুদ্ধে বসাবার মতো জ্যোতিষী পাওয়া নিয়ে। জ্যোতিষীর যেন আকাল পড়েছে। শেষে একজন পাওয়া গেল। প্রিয়াংকা। তাঁর আবার এক বায়নাক্কা আছে। আগে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর জানাবেন নারদ নারদে অংশ নেবেন কিনা।

আমাকে ফোন করলেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন। ভালোমতোই বুঝে গেলেন আমার দৌড়। অতএব ফুরফুরে মেজাজে রাজি হয়ে গেলেন।

ওই সরলতায় ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

যাঁরা আমার নাম শুনেই জানিয়ে দেন—"আমি নেই", তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা আমার বিরুদ্ধে তাল ঠোকার আগে আমাকে একবার মেপে নিতে চান তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে দ্রুত পড়ে নেন। বুঝে ফেলেন আমার 'দৌড়'। অতএব দুর্বল মাটিতে আঁচড়াবার লোভ সামলাতে পারেন না। আমার 'দৌড়' বোঝানোটা সেই ফাঁদ।

টিভি অনুষ্ঠানে হার স্বীকার করার মূল্য হিসেবে আমি কত টাকা চাই—এই মোদ্দা কথাটা কোনও জ্যোতিষী সোজাসাপটা জিজ্ঞেস করেছেন, কেউ জিজ্ঞেস করেছেন দালাল মারফত। এক ভারী মহিলা জ্যোতিষী আমার সঙ্গে কথা-টথা বলে একটা টিভি অনুষ্ঠান করতে রাজি হলেন। অনুষ্ঠানের শ্যুটিং ডেটের দিন দুয়েক আগে আমাকে একটা আংটি উপহার দিলেন পরম ভালোবেসে। সোনার ওপর চুনী বসানো আংটি। কে জানে, কী ছিল মনে। হয়তো বা আশা করেছিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি হেরে যাবো। যে তিন জনের হাত দেখিয়ে প্রশ্ন করব, তাদের উত্তরগুলো জানিয়ে দেব, এমন প্রত্যাশা হয়তো ছিল। রেকর্ডিং শেষে যখন বুঝলেন 'হেরে ভূত কিন্তুত', তখন তাঁর সে কী রাগ? রাগ হবার-ই কথা। ব্যাটা আংটি নেবে, আবার হারিয়েও দেবে? আমাকে ফোন করেও এই ক্ষোভ জানালেন ভারী জ্যোতিষী। বলেছি—কী মুশকিল আপনি আমাকে বলবেন তো, 'আমি আপনাকে আংটি দিলাম, বিনিময়ে আপনি আমাকে জয় দেবেন।' তাহলেই ল্যাঠা চুকে যেত। আপনাকে আর এমন মনকষ্ট নিয়ে থাকতে হত না। আংটি নিতাম না। আংটি নেওয়াটা ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

আর এক জ্যোতিষী অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর দিন কয়েক আগে আমার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। অফারটা ভালোই—একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে করতে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমি আবার পরের পয়সায় মদ খাই না। সুযোগ পেলেই বিনেপয়সায় আকণ্ঠ মদ্যপানের মধ্যবিত্তসুলভ আচরণ আমার অসহ্য ঠেকে। আমি রাজি না হওয়ায় ঘাবড়ে গিয়ে তিনি আমার বিপরীতে টিভিতে নামলেন-ই না। তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন, আমি ঘুষ নিলাম না। স্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

আজ অবধি ১৬০ জনের উপর জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি। মুখোমুখি হয়েছি রেডিওতে, টিভিতে, মঞ্চে। সব জায়গায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে—জ্যোতিষশাস্ত্র আসলে স্রেফ বুজরুকি। পকেট কাটার মতো, প্রতারণা শিল্পের মতোই একটা শিল্প। এদের থাকার সঠিক জায়গা হল জেলখানা।

চ্যালেঞ্জগুলোতে জ্যোতিষীদের সামনে হাজির করেছি দু-চারজন লোক—যাদের হাত দেখে অতীত জীবন নিয়ে কিছু বলতে হবে। এইসব জ্যোতিষীদের জ্ঞানের বহর আমজনতার কাছে তুলে ধরতে চ্যালেঞ্জ করেছি অত্যন্ত সহজ শর্তে। কাঁটায় কাঁটায় কিছুই মেলাতে হবে না। বিয়ের বয়স বলতে গিয়ে পাঁচ বছর কম, বা পাঁচ বছর বেশি বললেও হারবো। আয়ের বেলায় পাঁচ হাজার টাকা কম বা বেশি বললেও হার হবে আমার। এত সুবিধে পাওয়ার পরও কোনও জ্যোতিষী আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জিততে পারেনি। কারণ, জ্যোতিষীরা যে সাধারণ জ্ঞান থেকে মানুষের সম্বন্ধে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে, তা আমি জানি। জানি এসব বলতে কোনও শাস্ত্র লাগে না। ওদের ভুল করাতে আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সাধারণ জ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছি। আর মুখোমুখি বসাতে পেতেছি ফাঁদ।

নাকে খত দেওয়া এইসব জ্যোতিষীরা আমার মুখোমুখি হওয়ার আগে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন, দ্বিধায় ভুগেছেন। লোকটার বিরুদ্ধে নামব কি? জিততে পারলে অচিন্ত্যনীয় লাভ। সব জ্যোতিষীদের টেক্কা মেরে এক লাফে কুবের। এই ধরনের চিন্তা থেকে আমার সঙ্গে একটু কথা বলে আমাকে কিছুটা বুঝতে চেয়েছেন। তারপর, ফোন করেছেন। একাধিকবার অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা হয়েছে। তারপর অবাক হয়ে ভেবেছেন—এই ব্যাটার কাছে কী করে যে জ্যোতিষীরা হেরেছেন, ভগবান জানেন? এর কাছে তো হারাই কঠিন। জয় সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমার বিরুদ্ধে টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।

এই রাজি করানোটাই কঠিন। রাজি করানোর স্বার্থে নিজের অহমিকার গলা টিপে কিছুক্ষণের জন্য বোকা হয়ে যান। পারবেন।

বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার ঝঞ্ঝাট

যুক্তিবাদী আন্দোলন আমার প্রথম প্রেম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। জ্যোতিষী, বুজরুক বাবাজি-মাতাজিদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছি। নামলেই বাঘ আমাকে খাবে। যতক্ষণ জিতব, ততক্ষণ বাঁচব। হারলেই একগাদা লোক আমার পিছন পিছন কালি ছিটোতে ছিটোতে যাবে। বলবে, ঘুষ খেয়েছি। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শেষ করতে হামলে পড়ার মতো স্বার্থান্বেষী, হুজুগে, কানপাতলা, ঈর্ষাকাতর কাঁকড়ার অভাব নেই।

এ'সব লিখতে গিয়ে একটা ভয়ংকর স্মৃতি ভেসে উঠল। ২১ এপ্রিল ১৯৮৯ সাল। আনন্দবাজার ও আজকাল পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল। ছবিটি

আমার ও এক তান্ত্রিক শ্রীশ্রীগৌতম ভারতী'র। 'আজকাল' পত্রিকা থেকে বিজ্ঞাপনের কথাগুলো তুলে দিচ্ছি।

পরাজিত প্রবীর ঘোষ

এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম—৯৯ডি/১, লেকটাউন, কলকাতা ৮৯-এর অধ্যক্ষ মাতৃসাধক আচার্য্য শ্রীমদ্ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে মাথা নত করতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে বাধ্য হন।

ইতি—

শ্যামাপদ ঘোষ।

একটা বিজ্ঞাপন, আগাপাশতলা মিথ্যে বিজ্ঞাপন আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেদিন টাইফুন হয়ে আছড়ে পড়েছিল। একটি স্ববিজ্ঞাপিত 'যুক্তিবাদী সমাজসচেতন' মাসিক পত্রিকার কাছের মানুষরা প্রচারে নেমে পড়ল—প্রবীর ঘোষ ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। ঘুষ-খোর প্রবীর ঘোষ বিজ্ঞান আন্দোলনের শত্রু। ফোনে ফোনে গুজবের আগুন ছড়িয়েছে দ্রুত। হুজুগপ্রিয় মানুষ। তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা এক যোগে আক্রমণ হেনেছে আমাদের প্রতিটি শাখায়। বনগাঁ থেকে ক্যানিং, জলপাইগুড়ি থেকে পুরুলিয়া—কোথায় নয়। আমাদের সমিতির সদস্য-সদস্যাদের উপর মারধোর, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলা, দেওয়াল লিখনে আলকাতরা লেপে দেওয়া, লিফলেট ছিঁড়ে ফেলা—সবরকম হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার যে আক্রমণ নেমে এসেছিল, তাতে আন্দোলন বিপন্ন বোধ করেছিল।

এই বিপদ থেকে বাঁচতে সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার ও আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলেছি। সত্যকে তুলে ধরার অনুরোধ রেখেছি। দু-জনেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন। ভণ্ডামি ফাঁস করতে শ্রীগৌতম ভারতীর প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বে-আব্রু করেছে দুটি পত্রিকাই। শ্রীগৌতমভারতী নিজের পেটে ভাঙা কাচের বোতল ঢুকিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। সে'খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমি প্রত্যয় রাখি—কখনই হারব না। সব তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার রহস্য ফাঁস করব। এমন প্রত্যেয়ের পিছনে রয়েছে, বহু বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের উপর আস্থা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সহযোগিতা পাবার প্রত্যাশা। কিন্তু এমন অনেক কারণ থাকতে পারে, যার একটিই আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অন্তর্ঘাত, দলগত সংহতির অভাব, একজনের কর্তব্যে গাফিলতি যুক্তিবাদী

সমিতির লাগাতার জয়ের ধারাকে ধসিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও অন্য ধরনের কারণে ব্যর্থতা আসতে পারে। হয়তো কোনও কারণে পুরোপুরি মনোসংযোগ করতে পারছি না, হয় তো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পুরো তথ্য হাতে আসেনি, যে সব বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা পাওয়াটা জরুরি ছিল, কোনও কারণে তা পাইনি। বিশেষজ্ঞ বাইরে, বিশেষজ্ঞ অসুস্থ অথবা সহযোগিতা করতে গিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্যাকফুটে—এমন অজস্র কারণ থাকতে পারে। আর এমন একটি কারণই আমাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জল ঢেলে দিতে পারে। এমন কী এও হতে পারে—ব্যর্থতার কাহিনি নেহাতই গুজব। যদি ব্যর্থ-ই হই, তাতে কী প্রমাণিত হয়? আমার ব্যর্থতা শুধু এটাই প্রমাণ করে যে, আমি পারিনি। এটা প্রমাণ করে না যে, আমি ঘুষ খেয়েছি। এমন কী এটাও প্রমাণিত হয় না যে, অলৌকিক বলে সত্যিই কিছু আছে অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান।

আমার না পারাটাই চূড়ান্ত এবং শেষ সত্য নয়। আমার পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চয়ই সেই ব্যর্থতা ঢেকে দিয়ে নিয়ে আসবে সাফল্য। আমার এই প্রত্যয় কোনও আবেগ থেকে নয়। নতুন প্রজন্মের উত্তরণ আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

কিছু কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। দু-তরফ থেকেই মিডিয়াদের আমন্ত্রণ করা হয়। লক্ষ করেছি, এই সময় অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিপক্ষ আমার কাছের মানুষদের মধ্যে থেকে দু-একজনকে কেনার চেষ্টা করে। দশজনকে পায় না তো দু'জনকে পায়। আমাদের আন্দোলন একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও বিশ্বাসঘাতক তৈরি হচ্ছে কী করে? তবে কি আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্যেই গোলমাল আছে?

এই প্রসঙ্গটি বোঝাতে একটু অন্যদিকে নজর দিই আসুন। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাকামী, স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশেই আছে। তাদের কাজকর্মের উপর সে'সব দেশের সরকার নজরদারি করে। সে'জন্য বিশাল অঙ্কের ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর একটা বড় অংশ খরচ হয় ইনফরমারদের পিছনে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে, বিপ্লবীদের নেতাদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্রের দালাল বা ইনফরমার। কারা সন্ত্রাসবাদী, কারা স্বাধীনতা সংগ্রামী, এই আলোচনায় আমি এখন ঢুকছি না। কিন্তু যাঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁদের আন্তরিকতায় নিষ্ঠায় আমরা শ্রদ্ধা রাখতেই পারি। হতে পারে, তাদের আদর্শে কোথাও ভুল আছে। কিন্তু তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারে যাঁরা আঘাত হেনেছিলেন, তাঁরা আদর্শচালিত বলে নিজেদের মনে করতেন। সেটা ভুল আদর্শ কী ঠিক, সেই তর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু তাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সততা, আত্মত্যাগ প্রশ্নাতীত সন্দেহাতীত। এদের মধ্যে থেকেই ইনফরমার জোগাড় করে এদের শত্রুরা। ইনফরমার পাওয়া যায় বলেই বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাবার আগেই অনেক আগাম খবর

মেলে। যারা কাশ্মীরকে আজাদ করতে লড়ছে, তাদের হামলার বহু খবর চলে আসে আমাদের দেশের গোয়েন্দাদের হাতে। পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের সাত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাত নেতার গোপন বৈঠকের খুঁটিনাটি সব খবর পেয়ে যায় ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর। সাত নেতার কেউ ভারত সরকারের ইনফরকার না হলে এটা অসম্ভব।

ইনফরমার নিয়ে সাত-সতেরো লেখার কারণ এই সত্যটা তুলে ধরা যে, প্রক্রিয়া অনেক সময় লোভের কাছে হার মানে।

সি আই এ থেকে কে জি বি-র এজেন্টদের অনেক গল্প, অনেক গুজব আমরা শুনেছি। একটা সময় ছিল যখন এদেশের প্রতিটি নামী-দামি লেখক ও শিল্পীদের সি আই এ বা কে জি বি-র দালাল বলে চিহ্নিত করত আমজনতা। যেন আমজনতাকে সাক্ষী রেখে ওদের দালালির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপর এও সত্যি, এক সময়কার পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা দপ্তর সি আই এ এবং কে জি বি সারা পৃথিবীতেই বিপুল সংখ্যক ইনফরমার রেখেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন আমেরিকা বুঝে গিয়েছে অত বিপুল সংখ্যক ইনফরমারের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একেবারেই প্রয়োজন নেই—এমনটা মনে করে না।

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই শাসক ও শোষকদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দেশের ভিতরে ও প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর গোয়েন্দাগিরি করে। এই জন্য দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, রাষ্ট্রের ভণ্ডামির খোলনলচে প্রকাশে উদ্যোগী সংগঠনের মধ্যে নিজেদের দালাল খুঁজে নেয়। একইভাবে প্রতিবেশী দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে, তাদের গোয়েন্দা দপ্তরে ও সেনা দপ্তরে দালাল নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। এবং সে চেষ্টা অনেক সময়ই সফল হয়।

প্রতিটি বিপ্লবী সংগঠনেরও নিজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর থাকা জরুরি। প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে নিজেদের 'আপন লোক' খুঁজে নেওয়াটা জরুরি। এই আপন লোকরাই সরবরাহ করবে শত্রুদের নানা তথ্য।

আমরা একটা কুঁচো সংগঠন। তবু আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে অনেক জায়গায় 'আপন লোক' খুঁজে নিতে হয়েছে। তাঁরা আছেন বলেই আমাদের জয় সহজ হয়েছে। তাঁরাই খবর দিয়েছেন আমাদের সমিতির কে কোন্ জ্যোতিষীর এজেন্ট, কে কোন্ অবতারের। কে কী ভয়ংকর কাজ সংগঠিত করতে যাচ্ছে। আমাদের সমিতির সেই ছেলেদের টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা কণ্ঠস্বর শুনেছি। শুধু অবতার ও জ্যোতিষীদের মধ্যে নয়, অনেক প্রয়োজনীয় দপ্তরে, বিভাগে, সংগঠনে আমাদের 'আপন লোক' এখন অনেক।

বাঘের পিঠে সওয়ার হলে এ'সব করতেই হয়।

জ্যোতিষীরা যে ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হন

একটি বিনীত অনুরোধ। এক সন্ধ্যায় টিভিটি খুলুন। একটু রিমোটে আঙুল নিয়ে খেলা করুন। একগাদা চ্যানেলে বিচিত্র সাজের নানা জ্যোতিষীদের পেয়ে যাবেন। 'এখন ফোনে' মার্কা জীবন্ত অনুষ্ঠানও পাবেন। তাতে ফোনে জ্যোতিষীদের কাছে কী ধরনের প্রশ্ন আসে আর কী ধরনের উত্তর যায়, তার একটা হদিশ পেয়ে যাবেন। মিলিয়ে দেখবেন, তলায় যা লিখছি প্রশ্নোত্তরগুলো সেই ধরনের।

প্রশ্নকর্ত্রী—আমি বেলঘরিয়া থেকে মিনতি পাল ফোন করছি। আপনার জ্যোতিষের অনুষ্ঠান প্রত্যেক সপ্তায় দেখি। খুব ভালো লাগে। আপনাকে আমার প্রণাম।

জ্যোতিষী—হ্যাঁ। আপনার প্রশ্নটা কী? কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমার ছেলের সম্বন্ধে জানতে চাইছি।

সঞ্চালক—আপনার ছেলের জন্ম সাল ও সময়টা বলুন।

প্রশ্নকর্ত্রী—জন্ম ১৯৮০ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধে ৬টা ৩৫ মিনিটে বেলঘরিয়ায়।

জ্যোতিষী—ছেলের সম্বন্ধে কী জানতে চান?

প্রশ্নকর্ত্রী—ওর বিদ্যাস্থান আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানতে চাইছিলাম।

জ্যোতিষী—কী পড়ছে?

প্রশ্নকর্ত্রী—ক্লাস ইলেভেনে পড়ে।

জ্যোতিষী—ওর বিদ্যাস্থানে অশুভ গ্রহ বসে আছে। পড়াশুনোয় বাধা। পড়ায় মন দিতে পারে না। মন অস্থির। (কুড়ি বছরে ইলেভেনে পড়লে পড়ায় ভালো নয়—বোঝাই যাচ্ছে) ওর স্বাস্থ্যও মাঝে মাঝে ডিসটার্ব করছে।

প্রশ্নকর্ত্রী—হ্যাঁ। খুব অসুখে ভোগে। এক বছর তো শরীর খারাপের জন্য পরীক্ষায় বসতেই পারেনি।

জ্যোতিষী—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই তো বললাম, স্বাস্থ্য ডিসটার্ব করছে পড়াশুনায়। বিদ্যাস্থান আর স্বাস্থ্যস্থানকে ঠিক করতে হবে। আপনি আমার সঙ্গে পরে চেম্বারে যোগাযোগ করবেন, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেব।

সঞ্চালক—আরও একটা ফোন আসছে। কে বলছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমি দমদম ক্যানটনমেন্ট থেকে বলছি। আমার নাম গোপা পোদ্দার। আপনার প্রোগ্রাম দারুণ ভালো লাগে। আমার প্রণাম নেবেন।

জ্যোতিষী—নিলাম বোন। এবার বলুন কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমার বড় মেয়ের বিয়ে নিয়ে জানতে চাইছি।

সঞ্চালক—আপনার মেয়ের জন্ম সময়টা বলুন।

প্রশ্নকর্ত্রী—১৯৭৩ এর ৯ এপ্রিল। দুপুর ১২ টা ৬ মিনিটে।

সঞ্চালক—ঠিক আছে। শুনতে থাকুন।

জ্যোতিষী—আপনার মেয়ের সম্বন্ধ তো বেশ কিছু দিন ধরে দেখছেন। কিন্তু

কোনওটাই হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্ত্রী—হ্যাঁ একদম ঠিক বলছেন।

জ্যোতিষী—অ্যাসট্রোলজি হল খাঁটি অঙ্ক। ঠিক তো হতেই হবে।

(দমদম ক্যানটনমেন্ট মানে সাধারণভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাস। বাংলাদেশ বর্ডার থেকে প্রতিদিনই প্রচুর চোরাইমাল নামিয়ে দেওয়া হয়। চোরাইমালের ক্যারিয়াররাও গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে। সুতরাং মেয়েদের চেহারায় অপুষ্টি ও দারিদ্র স্পষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। জায়গার নাম শুনে চেহারার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মফস্সলের চেহারা, উত্তর কলকাতার চেহারা, দক্ষিণ কলকাতার চেহারার মধ্যে কিছু স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্য থাকে সাজপোশাকে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে।

দমদম ক্যানটনমেন্টের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা ৩০-এর অনেক আগেই শুরু হয়। মেয়ের বয়স ৩০ বছর। বিয়ের অনেক ব্যর্থ-চেষ্টার পর নিশ্চয় এই ফোন।)

প্রশ্নকর্ত্রী—কবে নাগাদ বিয়ে হবে?

জ্যোতিষী—এখানে এতই সময়ের অভাব যে, ডিটেইলে ক্যালকুলেশন করে বলা সম্ভব নয় বোন। আপনি আমার চেম্বারে আসুন। বলে দেব। প্রয়োজন হলে গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করব, যাতে ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।

কোনও ফোন হয়তো জানাল, হ্যাজবেন্ডের সম্বন্ধে জানতে চাইছি। জ্যোতিষীর পরবর্তী প্রশ্ন—সমস্যাটা কী?

প্রশ্নকর্ত্রী—ও তো আগে ভালোই ব্যবসা করত। এখন বছর দেড়েক ধরে হল ব্যবসাটা ভালো চলছে না, কবে থেকে আবার ভালো চলবে?

জ্যোতিষী—কীসের ব্যবসা?

প্রশ্নকর্ত্রী—ট্যাক্সির।

জ্যোতিষী—আগে তো দেখছি ব্যবসা ভালোই চালাতেন। ট্যাক্সিও বাড়িয়ে ছিলেন। এখন কী দু-একটা ট্যাক্সি বিক্রি করেছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—একদম বাক্‌সিদ্ধের মতো বলেছেন। পাঁচটা ট্যাক্সি ছিল। দুটো বিক্রি করে দিয়েছে।

জ্যোতিষী—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন কিছু দিন হল আপনার হ্যাজব্যান্ডের মন-মেজাজ ভালো নেই।

প্রশ্নকর্ত্রী—একদম ঠিক বলেছেন। এখন খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটি করছে।

জ্যোতিষী—এখন ড্রিঙ্ক করার মাত্রা খুব বাড়িয়েছেন? ট্রান্সপোর্ট বিজনেসম্যানদের মদ্যপান হল স্বাভাবিক অভ্যেস। মন খারাপ বা মন ভালো থাকলে একটু বেশি পান করবেন—এটাও স্বাভাবিক। এটা বলার জন্য সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট।)

প্রশ্নকর্ত্রী—সত্যিই আপনি ধন্বন্তরি জ্যোতিষী। একদম ঠিক বলেছেন।

এরপর সেই এক পুরানো কাসুন্দি, "এ'সব তো এত চট্ করে বলে দেওয়া

সম্ভব নয়। অনেক কিছু বিচার করে ব্যবস্থা করতে হবে। চলে আসুন আমার চেম্বারে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। আমার চেম্বারের ফোন আর মোবাইল নম্বর লিখে নিন।"

টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠলো দুটো ফোন নম্বর। প্রায় প্রতিটি কেত্রেই প্রশ্নকর্ত্রী বা প্রশ্নকর্তারাই জ্যোতিষীদের এমন সব তথ্য জুগিয়ে দেন, তাতে নিরেট গাধা না হলে প্রত্যেকেই এক একজন 'ধন্বন্তরি' বা 'বাক্‌সিদ্ধ'।

সলিড মাথাওয়ালা মানুষগুলোই রং-টং চড়িয়ে এইসব জ্যোতিষীদের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প ফেঁদে বসেন যত্র-তত্র।

এ'রাজ্যে পাঁঠার কোনও অভাব নেই। ওরা হাড়িকাঠে গলা দেবার জন্য ছটফট্ করছে। আপনি ওদের পকেট থেকে যত বেশি করে সাফ করবেন, ওরা ততই প্রশান্তি ও নির্ভরশীল বিশ্বাস খুঁজে পাবে। অতএব মা ভৈ!

বিদ্যে বোঝাই তিন জ্যোতিষী ও এক যুক্তিবাদী

১৯৯৯ সাল। আলফা বাংলার একটি অনুষ্ঠান 'অন্য ভুবন'। সঞ্চালক চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। গৌতম ফোনে জানালেন, জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের হাজির করে একটা জমজমাট অনুষ্ঠান করতে চান। এতে আলোচনার পাশাপাশি জ্যোতিষীদের হাত দেখিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পাব আমি। আলোচনায় আমার সঙ্গী থাকবেন অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জি। শুভেন্দু চ্যাটার্জি আমাদের আন্দোলনের সাথী। ওর নাম শুনে খুশি হলাম। জ্যোতিষী কারা থাকছেন? শুনলাম, হাতিবাগান টোলের দুই জ্যোতিষী থাকছেন। এও জানলাম, আমাকেই একজন লোক আনতে হবে। তাঁর হাত দেখেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন জ্যোতিষীরা।

আমি যে থাকছি, এটা কী জানেন জ্যোতিষীরা? জিজ্ঞেস করেছিলাম গৌতম ঘোষকে।

উত্তরে গৌতম জানালেন—পাগল! আপনার নাম শুনেই অনেক জ্যোতিষী কেটে পড়েছেন। এঁরাও জানতে চেয়েছিলেন, আলোচনায় আপনি থাকছেন কি না। আপনি থাকছেন না শুনে রাজি হয়েছেন। রেকর্ড আগামীকাল, বিকেল তিনটেয়, নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে।

পরের দিন আড়াইটের মধ্যে হাজির স্থান-নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে। গৌতম যখন শুনলেন, কয়েক ঘণ্টার নোটিশে কাউকেই হাজির করতে পারিনি, তখন নিরাশ হলেন। হাত দেখানোর পর্যায়টা থাকলে দর্শকরা দেখতে পেতেন জ্যোতিষীরা পারছেন, কি পারছেন না?

বললাম, আমিই হাত দেখাব।

এতো হারিকিরি করার মতো ব্যাপার। আপনাকে প্রত্যেক জ্যোতিষী চেনেন। নিদেনপক্ষে আপনার প্রচুর ছবি জ্যোতিষীরা দেখেন বই, পত্রিকা ও টিভি'র কল্যাণে। আপনার নাড়িনক্ষত্রের খবর ওঁদের জানা। সেখানে এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানেই নয় না—আমাকে বললেন গৌতম।

গৌতম ঘোষের কথায় যুক্তি আছে। অস্বীকার করছি না, ঝুঁকি আছে। কিন্তু কী করি। এত কম সময়ে এমন একজনকেও পেলাম না, যাকে দেখে জ্যোতিষীরা বেবাক বুরবক বনে যাবেন। একটা মানুষ দেখে সাধারণ বুদ্ধিতেই অনেক কিছু প্রায় ঠিকঠাক বলে দেওয়া সম্ভব। আর চর্চায় সেটা শিল্পে পৌঁছায়। এমন খেলা আমরা ট্রেন যাত্রায় প্রচুর খেলি। যারা এই খেলা নিয়ে ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে খেলতে মজা পাই। থেবড়ে গোবরে বসিয়ে দেওয়ার মজা। এ'খেলায় আমাকে জিততে হলে এমন একটা লোককে হাজির করতে হবে, যাকে দেখে আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

তেমন লোক যখন পেলাম না, তখন নিজের হাত দেখাবার ঝুঁকি নিতেই হল। এর জন্য প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, সেটা হল, আমাকে 'আমি নই' করে হাজির করা।

গৌতম ঘোষকে একটি অনুরোধ করলাম, প্রোগ্রামে আপনি আমাকে প্রবীর ঘোষ বলে পরিচয় করাবেন না। গৌতম নিশ্চিন্ত করলেন—ঠিক আছে। সমাজবিজ্ঞানী শ্রীঘোষ বলে পরিচয় করাব।

স্টুডিওর মেকাপ রুমেই পরিচয় হল জ্যোতিষীদের সঙ্গে। আসার কথা ছিল দু-জনের। কিন্তু এসেছেন তিনজন। তৃতীয়জন পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। এখন নেশা জ্যোতিষ চর্চা। (চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর জ্যোতিষী করে 'টু পাইস' এলে মন্দ নয়।) স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়া অকর্মণ্যরা ঘরে বসে পিঠ না চুলকে এমন ব্যবসায় মন দিতে পারেন। এতে সময় কাটবে, প্রভাব বাড়বে, টাকা আসবে।) পাক্কা ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারার পর জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হলেন, আমি আমি নই। অন্তত আমার তেমনটাই মনে হল। প্রমাণ মিলবে আমার অতীত নিয়ে প্রশ্নের ওঁরা কী উত্তর দেন তাঁর উপর।

এখানে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গ টানছি না। আনছি আমার হাত দেখে কী উত্তর ওরা দিলেন সেই প্রসঙ্গে। গৌতম ঘোষ আমাকে বললেন, এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনার হাত আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জ্যোতিষীদের দেখিয়েছেন। এ'বার ওঁদের কাছে আপনার প্রশ্নগুলো রাখুন। তবে প্রশ্নগুলো রাখবেন আপনার অতীত জীবন নিয়ে। যাতে আমরা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাই, উত্তরগুলো ঠিক হল, কী ভুল?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল দেখলেন। উত্তর পেলাম, চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ।

—ছেলে মেয়ে ক'টি?

—দুটি মেয়ে।

—কর্মক্ষেত্র?

—দু-চার বছরের বেশি কোনও জায়গায় লেগে থাকতে পারেননি।

জ্যোতিষীরা তাঁদের দেওয়া উত্তরে সহমত। কিন্তু আমার মতটা কী? ক'টা মিলল?

গৌতম অনুরোধ করলেন, সঠিক উত্তরগুলো দর্শকদের জানাতে।

সঠিক উত্তর—বিয়ে করেছি তেইশে। চৌতিরিশ, পঁয়তিরিশে নয়। একটি সন্তান। ছেলে। একটাই চাকরি করতাম। স্টেট ব্যাংকে। চাকরি ছেড়েছি সম্প্রতি।

সেদিন জানাবার কোনও সুযোগ ছিল না, কেন ওদের একটা উত্তরও কাছাকাছি দিয়ে যেতে পারেনি। আজ আপনাদের সেই কাহিনি শোনাচ্ছি।

নিউ থিয়েটার স্টুডিওর এক টেকনিশিয়ান বন্ধু সেদিন আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। তাইতেই জয়। তিনি শুধু আমাদের মেকাপ রুমের আড্ডায় ঢুকে বললেন, "ঘোষ'দা তোমার গলা শুনে ঢুকে পড়লাম। ছোটমেয়ে তো গ্রাজুয়েট হয়ে গেল। কবে খাওয়াচ্ছ বলো।"

ওঁর ওই ছোট্ট ডায়লগই জয়কে নিশ্চিত করেছিল। জ্যোতিষীরা ওই এক ডায়লগ থেকে যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলো হল :—

(১) আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলে জ্যোতিষীরা মনে করেছিলেন, প্রবীর ঘোষের সঙ্গে চেহারার যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি সম্ভবত প্রবীর ঘোষ নই। কিন্তু স্টুডিওরই একজন টেকনিশিয়ানের কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছিলেন—আমি প্রবীর ঘোষ নই। কারণ জ্যোতিষীরা জানেন, আমার এক ছেলে। 'অলৌকিক নয় লৌকিক' প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ডে সে কথা লেখা আছে।

(২) হাত দেখার সময় আমার জন্ম সাল জেনেছিলেন। ছোট মেয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছে শুনে ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ছোটর বয়স বছর কুড়ি হবে। বড়র বয়স একুশ-বাইশ হবে। আমার যা বয়েস, তাতে আমার সময়ে প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তানের বয়সের পার্থক্য দু-এক বছরের বেশি হত না। আমার বিয়েটা তার মানে বছর বাইশ, আগে হয়েছে। এখন বয়েস ছাপ্পান্ন। অর্থাৎ বিয়ে হয়েছে চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশে। সোজা হিসেব।

(৩) আমার স্টুডিওর বন্ধুটি যে'হেতু 'আপনার মেয়ে' না বলে 'ছোট মেয়ে' শব্দটি বলেছিলেন, তাইতেই ওঁদের হিসেবে গোলমাল হয়েছে। ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন, বড়োটি ছেলে হলে 'ছোট মেয়ে' না বলে 'মেয়ে' শব্দটি বলতেন। এরই সঙ্গে আমার শিক্ষা ও আর্থিক স্ট্যাটাস অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, আমার দু'য়ের বেশি সন্তান হওয়াটা স্বাভাবিক নয়।

(৪) গিয়েছি 'প্রেস' লেখা গাড়িতে। গাড়ি দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি সাংবাদিক। কোথায় যুক্ত আছি, জানতে চেয়েছেন। জানিয়েছি। এর আগে কোথায় কোথায় যুক্ত ছিলাম, তাও জানতে চেয়েছেন। মিডিয়াগুলোর নাম বলেছি। আমি কোনও সংবাদমাধ্যমে কখনও চাকরি করিনি বটে, কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—এ'ও সত্যি। আমার কথা শুনেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ঘন ঘন চাকরি বদল করেছি।

জ্যোতিষীদের ক্ষমতার দৌড় আমি জানি। জানি, ওরা হাত বা ছক দেখে কোনও কিছুই বলে না। বলে যে হাত বা জন্ম ছক দেখাতে এসেছে তার কথার সূত্র

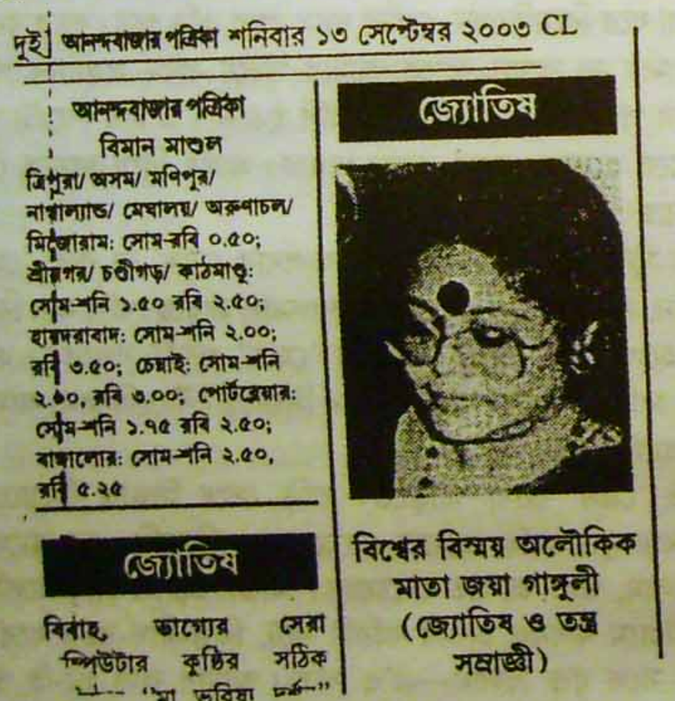
ধরে (সূত্র ধরে জ্যোতিষীরা কীভাবে বলে, তার একটা জীবন্ত ছবি একটু আগেই তুলে ধরেছি 'এখন ফোনে' ধরনের অনুষ্ঠান থেকে)। পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, রুচি, ঘড়ি, জুতো, গাড়ি কী বাসযাত্রী ইত্যাদি বুঝে নিয়ে অতীত বলে, ভবিষ্যৎ বলে। যে'সব দেখে-শুনে ওরা বলে, সে'সব একটু উলেটে-পালটে দিলেই সব ওলট-পালট। আমি শুধু তাই করেছিলাম। এবং জিতেছিলাম।

বিশ্বের বিস্ময় ও অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলীর বিস্ময়কর পরাজয়

জয়া গাঙ্গুলী হেভি-ওয়েট জ্যোতিষী। নিজেকে 'অলৌকিক মাতা' 'অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারিণী' বলে বিজ্ঞাপন দেন। একবার পাথর দিয়ে অসুখ সারান বলে দাবি করে আইন-আদালতের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। জামিন পর্যন্ত নিতে হয়েছিল। এখন আর অসুখ সারাবার মত ভয়ংকর এবং প্রতারণামূলক দাবি করেন না। কারণ—নেড়া একবার বেলতলায় যায়।

এক সময় অনেক জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক এমন ভয়াবহ দাবি করত বোধহয় বেশি কামাবার লোভে। গাদাগাদা দুরারোগ্য ব্যাধির ক্লায়েন্টদের জীবন দানের আশ্বাস দিয়ে শুষে ছিবড়ে করার নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করতে, আমরা যুক্তিবাদী সমিতিই মামলা দায়ের করেছিলাম।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে দামি ও নামী জ্যোতিষী বোধহয় জয়া গাঙ্গুলী। অবশ্য তিনিও


দুই আনন্দবাজার পত্রিকা শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ CL

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা/ অসম/ মণিপুর/ নাগাল্যান্ড/ মেঘালয়/ অরুণাচল/ মিজোরাম: সোম-রবি ০.৫০; শ্রীনগর/ চণ্ডীগড়/ কাঠমাণ্ডু: সোম-শনি ১.৫০ রবি ২.৫০; হায়দরাবাদ: সোম-শনি ২.০০; রবি ৩.৫০; চেন্নাই: সোম-শনি ২.৬০, রবি ৩.০০; পোর্টব্লেয়ার: সোম-শনি ১.৭৫ রবি ২.৫০; বাঙ্গালোর: সোম-শনি ২.৫০, রবি ৫.২৫

জ্যোতিষ

বিবাহ, ভাগ্যের সেরা কম্পিউটার কুষ্ঠির সঠিক ... "মা ভবিষ্য ..."

জ্যোতিষ

বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী (জ্যোতিষ ও তন্ত্র সম্রাজ্ঞী)

এখন নিজেকে শুধু 'জ্যোতিষী' বলে পরিচয় দেন না। লেখেন 'জ্যোতিষ ও তন্ত্র সম্রাজ্ঞী'। এমন-ই এক মহার্ঘ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারিণী, বিশ্বের বিস্ময়ের সঙ্গে

আমার মতো এক আম-আদমির একটি টিভি অনুষ্ঠানের আংশিক বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'ATN WORLD' এবং 'ATN BANGLA' তখন স্যাটেলাইট চ্যানেল। রমরমিয়ে চলছে। RPG নেটওয়ার্কে কেবল চ্যানেল বলতে তখন শুধু 'CCCN'। এই তিনটি চ্যানেলে এক সময় একটা অনুষ্ঠান হত, 'দেখা না দেখা'। পরিচালক ছিলেন শর্মিলা চ্যাটার্জি। সহপরিচালক সুজিত চ্যাটার্জি। এই 'দেখা না দেখা' আমাকে ও জয়া গাঙ্গুলীকে চারটে এপিসোডে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছিল। দুটো এপিসোডে ছিল তাত্ত্বিক আলোচনার নামে হিজিবিজি বোকা তর্ক, গেঁড়ে তর্ক। যেমন—দশ রতি নীলা নিয়ে হাঁটতে পারবেন? পারবেন না। উত্তরে যখন বললাম—দিন। পরে হাঁটব তো বটেই। বেঁচে থাকব বছরের পর বছর। জয়া চুপ মেরে গেলেন। টেনে আনলেন রোগ সারাবার কথায়। মা মনসা নাকি ওঁকে দেখা দেন! চর্মচক্ষে দেখতে পান? জিজ্ঞেস করতেই, জয়া আমতা-আমতা। আরও একটু চেপে ধরতেই বললেন, তিনি অনুভব করেন।

মা মনসার কথা মতোই তিনি নাকি অসুখ সারান। কী ধরনের অসুখ? চোখের রোগ থেকে ক্যানসার স-অ-ব।

আমি রোগী দেব—সারাবেন? এমন বেয়াড়া প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই আবার অন্য প্রসঙ্গ টানলেন।

'সূর্য রশ্মি ব্লাডসারকুলেশনে মিশে যায়'—এমন উদ্ভট অশিক্ষা উদ্ভূত কথা বলতে তাঁর জিব যেভাবে সপ্রতিভ দেখলাম, তাতে এ'নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রবৃত্তি থাকে না।

তৃতীয় ও চতুর্থ এপিসোডে লড়াইটা জমবে, প্রত্যাশিত ছিল। তৃতীয় এপিসোডে আমি অলৌকিক জ্যোতিষী জয়ার সামনে হাজির করব তিনজনকে। তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখব। বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী উত্তর দেবেন। চতুর্থ এপিসোডে দেখা হবে উত্তর ঠিক, না ভুল। উত্তর ঠিক দিলে আমি যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব। যাঁদের হাজির করবো তাঁদের নাম-ঠিকানা দিতে বাধ্য থাকব। তাঁদের উত্তর হিসেবে যেগুলো আমার হাজির করা মানুষগুলো বলবে, তার একটিও মিথ্যে হলে আমি সমিতি ভেঙে দিতে বাধ্য থাকব। জয়া উত্তর ভুল দিলে কী জয়া-জ্যোতিষ পেশা বন্ধ করে দেবেন? সুজিত চ্যাটার্জির প্রশ্নের উত্তরে জয়া জানালেন, না তিনি তাঁর পেশা বন্ধ করবেন না।

যে তিনজন সম্বন্ধে জয়া বলবেন, অনুষ্ঠান রেকর্ডিংয়ের আগে তাঁদের এক একজনের হাত দেখলেন দীর্ঘ সময় ধরে। কার কার সম্বন্ধে কী কী প্রশ্ন রাখব, তাও জানিয়ে দিয়েছিলাম। জয়া হয়তো ধরে নিয়েছিলেন—আমাকে আংটি উপহার

দেওয়ার বিনিময়ে আমি সহজ সরল প্রশ্ন হাজির করেছি।

প্রথমে আনা হল জ্যোতি মুখার্জিকে। ঠিকানা দেখানো হল টিভি'তে। ১০৩ এ কবি সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৭০০০৮৫। বয়স পঁয়ষট্টির এপাশ-ওপাশ।

জ্যোতি মুখার্জি সম্পর্কে জয়া জানালেন, চাকরি করতেন, রিটায়ার করেছেন।

—বিয়ে কবে নাগাদ?

উত্তরে জয়া জানালেন, অনেক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ পঁচিশ-তিরিশ-পঁয়তিরিশ বা যা খুশি হতে পারে। একেই বলে অলৌকিক মাতা'র নিখুঁত গণনা!

—ক'টি সন্তান?

জয়ার কথায় তিনটি। তবে মিসক্যারেজ হতে পারে। অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা একটি বা দুটি হলেও মিসক্যারেজের দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার রাস্তা খোলা রাখা হল।

জ্যোতি মুখার্জি নিজেই জানতে চাইলেন, তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন কি না?

জয়া জানালেন, স্ত্রী'র সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।

দ্বিতীয় জন সাধন মজুমদার। ঠিকানা ২/৩৮ রামকৃষ্ণ পল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৮৩। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি।

জয়া জানালেন, আয় ভীষণ কম। এক-দেড়-দু' হাজারের মধ্যে। ছোট-খাট ব্যবসা করেন।

—ব্যবসার ধরনটা কী? জিজ্ঞেস করায় জানালেন লিকুইড কোনও কিছুর ব্যবসা করেন। তেল-জল-চা এই ধরনের জলীয় কিছুর ব্যবসা করেন।

তেল মানে কী কেরোসিন? জলীয় মানে কী তাড়ি? চা মানে ফুটে ভাঁড়ের চা? সাধন মজুমদার নিজে যেন চলমান জীবিকার বিজ্ঞাপন। ওঁকে দেখে এইসব কথা বলে ফেলা যায় সহজে। ভক্‌ভক্‌ করে যে'ভাবে তাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে তাড়ি-ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

তৃতীয় জন বলু ঘোষ দস্তিদার। ঠিকানা ১১২ এ, কবি সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৭০০০৮৫। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে।

বলুর সম্বন্ধে জয়া জানালেন, চাকরি করেন। মাসিক আয় পাঁচ হাজার থেকে ছ' হাজার টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েটের কাছাকাছি।

চতুর্থ পর্বে দর্শকদের মধ্যে ছিল টানটান উত্তেজনা। অলৌকিক মাতাজি ১০০% মেলাতে পারলেন কি না—জানতে আগ্রহী বহু মানুষ। এই অনুষ্ঠানটি যে বিপুল সাড়া ফেলেছে—পরিচালক শর্মিলা অনুষ্ঠানের শুরুতেই সে কথা জানালেন দর্শকদের।

টিভি-তে আমি, জয়া গাঙ্গুলী ও সঞ্চালক সুজিত চ্যাটার্জি। আমরাও উত্তর জানার

অপেক্ষায়। সুজিতের আহ্বানে জ্যোতি মুখার্জি এলেন। রোগা, ফর্সা, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত কামানো। পরিপাটি আঁচড়ানো চুল। পরনের সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি। বনেদি ঐতিহ্যের ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। যদিও এখন ছাপ থাকলেও বৈভবের চিহ্ন নেই। সহজ কিন্তু রুচিপূর্ণ পোশাক-আশাক।

চেহারা দেখলে ব্যবসায়ী মনে হয় না। অতএব পেশা হিসেবে পড়ে থাকে চাকরি। বয়স দেখে বোঝা যায় অবসর নেবার সময় পেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং চাকরি করতেন, অবসর নিয়েছেন—এ'সব বলার জন্যে হাত দেখার প্রয়োজন হয় না।

আমার কথা শুনে কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। আমাকে মনে করতে পারেন—বাঙালি কাঁকড়া। চ্যালেঞ্জ জানাবে। আর হেরে গেলে হারকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবে।

কে কী মনে করল, বলল—ও'সব গায়ে মাখতে নেই। যা নেই, তাতে আমিও নেই। অতএব চলুন, সোজা যাই জ্যোতি মুখার্জির কথা শুনতে।

জ্যোতি মুখার্জির কথায়—অবসর নেননি। অ্যাক্সিডেন্টে পা ভাঙে। কাজে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজে যেতে না পারার ফলে চাকরি চলে যায়। বিয়েই করেননি। সুতরাং তিন সন্তান, মিসক্যারেজ এ'সবই ভুল। বউয়ের সাংঘাতিক বিপদ ঘটার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এমন সব উত্তর শুনে জয়ার বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস রাখা মানুষদের কেউ অবাক, কেউ শোকাহত, কেউ বা জয়াকে গাল পেড়েছেন—আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু লাগাতার বিজ্ঞাপনের দৌলতে গড়ে তোলা এমন ইমেজের গ্যাস বেলুন যে ফুটো হতে চলেছে তা জ্যোতিষী জয়া বুঝতেই পারেননি। নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে ডাহা ফেল করে জয়া তখন বেজায় নার্ভাস। রুমাল দিয়ে যে ভাবে ঘন ঘন মুখ মুছছিলেন, তাতে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এ'বার এলেন সাধন মজুমদার। সোফায় বসলেন। আগের এপিসোডের সেই ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। সুজিতের অনুরোধে ক্যামেরার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত জোড়া করে দর্শকদের নমস্কার জানালেন। সাধনবাবুর উচ্চতা পাঁচ ফুট চারের মধ্যে। খস্‌খসে কালো চামড়া। উড়োখুড়ো তেলের ছোঁয়া না পড়া চুল। দু-দিন না কাটা খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। না, চশমা পরেন না। চেহারা দেখে মনে হয় পড়াশুনোই করেন না। তাই হয়তো চশমার পিছনে বাজে খরচের বিলাসিতায় রাজি নন। গলায় একটা মোটা কালো সুতো বাঁধা। তাতে ঝুলছে একটা রুপো বা হোয়াইট মেটালের কবচের মতো কিছু। কবচে আরবি ভাষায় কিছু লেখা। পরনে টেরিকটনের হাফ হাতা সার্ট। এত পুরোনো যে অনেক জায়গায় জ্যালজ্যালে হয়ে গেছে। কুঁচকোনো আধ ময়লা। কয়েক জায়গায় সেলাই করা টেরিকটনের ময়লা প্যান্ট। পায়ের হাওয়াই চপ্পলের সোল ক্ষয়ে প্রায় মেঝেতে মিশেছে। এর মধ্যেই বাবু সাধনচন্দ্র যে দু-এক পাঁইট দিশি চড়িয়েছেন, গন্ধে আমাদের তা মালুম দিচ্ছে। চেহারা-পোশাক-

গন্ধ সোজা বুঝিয়ে দেয় চোলাইয়ের কারবার করেন সাধনবাবু। এ'বুঝতে হাত দেখার দরকার হয় না।

সাধনবাবু সুজিতকে যা যা জানালেন, তা সত্যিই অবাক করা। চাকরি করেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ভবানীপুর শাখায়। পে স্লিপ দেখালেন। মাইনে বারো হাজারের বেশি।

তাহলে 'ভুল, সবই ভুল'। কোথায় বা এক-দেড়-দুই হাজার, কোথায় বারো হাজারের বেশি! কোথায় তরল-তাড়ি, কোথায় সি ই এস সি! এই না কি 'বিশ্বের বিস্ময়'! এই না কি 'অলৌকিক মাতা'র কেরামতি!

জানতাম, জ্যোতিষশাস্ত্রের দৌড়। জানি জ্যোতিষীদের নিখুঁত ভবিষ্যৎ বলার গোপন কৌশল। আর এ'সব জানি বলেই সাধন মজুমদারকে বলেছিলাম, শুটিং ওমুক তারিখে। তার পাঁচদিন আগে থেকে শরীরে তেল ছোঁয়াবেন না। তিন দিন দাড়ি-গোঁফ কামাবেন না। গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম ধুক্‌ধুকিটা। চোখ থেকে খুলে নিয়েছিলাম চশমা, হাত থেকে হাতঘড়ি। সার্ট-প্যান্ট-হাওয়াই সাধনবাবুই জোগাড় করেছিলেন। সাধনবাবুর গায়ে তাড়ি ছেটানোর কাজটা করেছিলাম আমি।

হাত দেখার অভিনয় করে, কথা শুনে, পোশাক দেখে, গন্ধ শুঁকে জ্যোতিষীরা যে 'বাকসিদ্ধ' সাজতে চায়, সেটাই বে-আব্রু হল আজ।

বলু ঘোষ দস্তিদার জানালেন, জয়া গাঙ্গুলী তো সবই ভুল বললেন। চাকরি করেননি একদিনের জন্যেও। করেন ব্যবসা। অতএব পেশা বলতে জয়া পুরোপুরি ব্যর্থ।

আয় বলেছেন, মাসিক পাঁচ-ছয় হাজার। এটাও ভুল। রোজগার মাসে হাজার পনেরো।

শিক্ষাগত যোজ্যতা বলতে গিয়ে বলেছেন—গ্র্যাজুয়েটের কাছাকাছি। আসলে পড়াশুনো সিক্স অবধি।

বলুকে কোনও বাড়তি মেকাপ দিতে হয়নি। স্মার্ট লোক। সমিতির পুরোনো সদস্য। এর আগেও অনেক বুজরুকের ভান্ডাফোড় করেছেন বলু ও তাঁর বউ জয়া। ওদের কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলে ঠিকঠাক বের করে আনবে।

বলুর শরীরী ভাষা যা বুঝিয়েছে, জয়া গাঙ্গুলী তাই বলেছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে—বিশ্বের বিস্ময় মাতাকে বলুর মতো একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ ইচ্ছে মতো চালিয়েছে!

সব হল। কিন্তু জ্যোতি মুখার্জির ব্যাপারটা কী হল? ওখানেও কী কিছু কারিকরি করা হয়েছিল?

হ্যাঁ হয়েছিল। তবে সেটা ছিল একটা ছোট্ট এবং সূক্ষ্ম চাল।

আমাদের সমিতির সদস্যা প্রিয়াংকা। তখন প্রিয়াংকা ক্লাস টুয়েলভ-এ পড়ে। তাকে দিয়েই চালটা দেওয়া হয়েছিল। অলৌকিক মাতা জ্যোতি মুখার্জির হাত দেখছেন। সঙ্গে কথাও বলছেন প্রচুর। সম্ভবত কথা বলে মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করছেন। মিনিট তিরিশ কেটে গেল। উঠে দাঁড়াল প্রিয়াংকা। পরনে স্কার্ট। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। জ্যোতিদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা পাঁচশো এম এল জলের বোতল বের করল। বোতলটার ঢাকনি খুলে জ্যোতিদার হাতে ধরিয়ে দিল। জ্যোতি মুখার্জি ধরলেন। এবার প্রিয়াংকা একটা ওষুধ বের করে এগিয়ে দিল জ্যোতি মুখার্জির দিকে। সঙ্গে একটা ছোট্ট ডায়লগ, "এই নাও। খেয়ে নাও।"

জ্যোতিদা গলায় জল ঢাললেন। ট্যাবলেটটা মুখে ফেললেন। গিললেন। প্রিয়াংকাকে জলের বোতলটা ফেরত দিলেন। প্রিয়াংকা ফিরে এসে আবার বসল।

এইতেই যা চাইছিলাম, তাই হল। যেমনটা চাইছিলাম, জয়া তেমনটাই বললেন। কারণ জয়া এমন স্বাভাবিক অভিনয় দেখে ক্লিন বোল্ড। ধরেই নিয়েছিলেন প্রিয়াংকা নির্ঘাত জ্যোতি মুখার্জির মেয়ে। তারপর যা হবার তাই হল।

একে আমরা কী বলব? বিস্ময়কর মাতা'র বিস্ময়কর পরাজয়?

আই আই টি'তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও

দীপক রাওয়ের খবরটা প্রথম পাই মে ২০০১-এ। দীপক রাওয়ের নাকি অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাও আবার এক রকম নয়। দু'রকম। এক ঃ জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। দুই ঃ 'টেলিপ্যাথি' করার ও ধরার ক্ষমতা আছে। "এ সবই দীপকের ফাঁকা দাবি"—এমন বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ দীপক ইতিমধ্যেই তাঁর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাও আবার যে সে জায়গায় নয়। আই আই টি বোম্বাই (মুম্বাই নয়) ও আই আই টি খড়্গপুরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন-গবেষণার ক্রিম দুটি জায়গায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা। চোখের সামনে যা দেখেছেন, তাতে তাঁরা অভিভূত হয়েছেন, আপ্লুত হয়েছেন। দরাজ মনে উল্লসিত প্রশংসা করছেন।

কী কী অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন—পরে আসছি। তার আগে বরং দীপক-এ আসি। দীপক মুম্বাইবাসী। অত্যন্ত স্মার্ট, ফর্সা, টিপটপ। দীপকের নিজস্ব একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে। দীপকের কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী। ছোটো-খাটো, ফর্সা, সুন্দরী।

দীপকের স্পষ্ট দাবি, তিনি যা দেখান, তা কোনও 'জাদু কা খেল' নয়। নির্ভেজাল অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ। ই.এস.পি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব যে সত্যিই আছে—এটা প্রমাণ করার ঠিক জায়গা মনে করেই তাঁর আই আই টি পরিভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। কিছু পেশাদার অবিশ্বাসীরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান ই.এস.পি-র (Extra-sensory perception) মতো বিষয়কে। এইসব পেশাদার অবিশ্বাসীরা আবার নিজেদের পরিচয় দেন 'যুক্তিবাদী' বলে। কিন্তু মজার কথা হল সাইকোলজির-ই একটি শাখা প্যারাসাইকোলজির চর্চার বিষয়ই হল ই.এস.পি।

এমন কথা শুধু যে দীপক রাও বলেন, তা কিন্তু নয়।

সম্প্রতি দূরদর্শন কলকাতা কেন্দ্রের 'যুক্তি-তক্কো' অনুষ্ঠানে 'ভূত আছে কী না নেই' এই বিতর্কে জনৈকা নীলাঞ্জনা সান্যাল চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে আমাদের

শোনালেন সাইকোলজির একটা শাখা প্যারাসাইকোলজি। যেখানে ই এস পি নিয়ে গবেষণা চলছে। ভূতের অস্তিত্বকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। অবাক কাণ্ড—এখন সব অদ্ভুতুড়ে বিজ্ঞান বিরোধী কথা বলার পরও তিনি বিজ্ঞানের পক্ষে আলোচক হিসেবে বার-বার ডাক পান। জানি না এর পিছনে দূরদর্শনের বোধের অভাব কাজ করে, না কী দুর্নীতি?

অন্ধ বিশ্বাসী না হলে এবং সাইকোলজি ও মনস্তত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে—প্যারাসাইকোলজি না সাইকোলজির শাখা, না বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও ভাবে সম্পর্কিত। বরং এটা বললে ঠিক হয় যে— প্যারাসাইকোলজির তত্ত্বগুলো স্পষ্টতই বিজ্ঞান-বিরোধী। 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিজ্ঞানের শাখা, আর 'জ্যোতিষশাস্ত্র' বিজ্ঞান-বিরোধী। দু'য়ের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত মিল আছে। এই উচ্চারণগত মিলকেই প্রতারকরা ভাঙিয়ে খাচ্ছে। 'সাইকোলজি' আর 'প্যারাসাইকোলজি'র মিল-অমিলটাও একই ধরনের। তারপরও কিছু অবোধ বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকা জ্যোতিষ ও প্যারাসাইকোলজির পক্ষে ওকালতি করেন। তা করুন। তাতে বিজ্ঞানের 'সত্য'-কে 'মিথ্যে' করা যাবে না।

প্যারাসাইকোলজির অন্যতম মূল তত্ত্ব হল, Extra-sensory perception (সংক্ষেপে E.S.P.)-এর অস্তিত্ব, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব আছে। E.S.P -কে সাধারণভাবে চারটিভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। (১) Telepathy (দূরচিন্তা) (২) Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) (৩) Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি) (৪) Psycho-Kinesis বা Pk (জড়-পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ)।

দীপক রাও সাইকো-কাইনেসিস ও টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ঠিক কী কী ঘটিয়েছিলেন, আমি দেখিনি। তবে শুনেছি। আই আই টি খড়্গপুরের কম্পিউটর সাইন্স-এর ছাত্র বিকাশ-এর কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনেছি। বিকাশ আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। তবে ওর বর্ণনাতে কিছু ফাঁক ছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে এই ফাঁক। এও ঠিক—অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অলৌকিক বিষয়ে সত্যানুন্ধানের ক্ষেত্রে বিকাশের বিশালভাবে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে—আমার বোধ এ'কথাই বলে।

দীপক জিজ্ঞেস করলেন, কারও সঙ্গে কি চাবি আছে? একাধিক হাত চাবির গোছা বের করে দিলেন। "দরকার শুধু একটি চাবির।" দীপক বললেন। তারপর একজন স্টাফের হাত থেকে নিলেন বড়ো-সড় একটা চাবির গোছা। গোছা থেকে একটা লোহার চাবি খুলে হাতে তালুতে রাখলেন। তালুটা মুঠোবন্দি করলেন। মুঠো খুলতেই অবাক কাণ্ড! চাবিটা বেঁকে গেছে। মিস্টার ইউনিভার্সের পক্ষে যা অসম্ভব, তাই সম্ভব করলেন মিস্টার রাও।

বিকাশের কাছ থেকে ঘটনার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, কী কৌশলের সাহায্যে দীপক রাও চাবি বাঁকিয়েছেন। তবে সম্ভাব্য একাধিক কৌশল এখানে তুলে ধরছি, যার সাহায্যে চাবি বাঁকানো যায়। সেইসঙ্গে এটুকু নিশ্চিত করছি যে, শ্রীরাও কোনও অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে চাবি বাঁকাননি। কারণ অতীন্দ্রিয় শক্তি, অলৌকিক ঘটনা অর্থাৎ কার্য-কারণহীন ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

এই বিষয়ে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় ২৮ মে ২০০১ এই লেখকের সাপ্তাহিক কলম 'দ্য সার্কেল অফ রিজন'-এ খোলা চ্যালেঞ্জ রাখি মিস্টার রাও-এর সামনে। শ্রীরাও-এর ই-মেলে পৌঁছে দেওয়া হয় সেই চ্যালেঞ্জ। কিন্তু চতুর বুজরুকের মতোই শ্রীরাও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হারার চেয়ে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অতএব চুপ মেরে ডুব দিয়েছেন।

Anybody can bend a key with one's fingers

Deepak Rao from Mumbai claims to have supernatural powers. Recently, he proved his mettle at the IITs of Mumbai and Kharagpur. The teachers and the students were witness to the whole incident. What did Rao do? He took a key from a member among the spectators, whom he called on stage, and in front of the rest, asked for a key from the person. Subsequently, with the least physical effort he was able to bend the key. Everybody present was naturally impressed. This is surely the result of some kind of supernatural power, they thought.

Even a Mr. Universe will not be be able to achieve this feat.

Mr. Rao is a smart, good looking man, who owns an advertising agency in Mumbai. His wife, who is also his assistant is a pretty looking woman. Rao claims that whatever he does has no relation with magic. It's simply an expression of a particular supernatural power that he possesses.

Parapsychologists believe that it is possible to

Deepak Rao of Mumbai left students and the faculties of IIT Mumbai and Kharagpur dumfounded when he bent a key in front of them, with his fingers. He claimed it was the result of a supernatural power. What exactly happened? Here's the rationale

• TRICK 1:

I have first go around on an identification hunt. I have to identify a person who would be a member of the audience and find out a) if he/she carries a key bunch, b)if there is a lead key in the bunch and c)make sure that the person carries that bunch to the show and seat among the spectators. And I surely have to build a perfect understanding with him/her. So when this second person hands me the bunch of keys, I know very well that there is a lead key in it. The only thing that I have to do is to identify the lead key and then bend it. Of course, one of my qualities has to be of befriending people, even mature and famous people. And the rapport that I have to maintain with such people need to on that day. And this is an open challenge to Mr. Rao, from my side.

The first thing that one has to remember is the material of the key. Let me mention that a key made of lead is very easy to bend with one's hand. The reason's because lead is a very soft metal.



THE CIRCLE OF REASON

Prabir Ghosh

HAVE A MIRACLE TO BUST?
Write in to THE CIRCLE OF REASON, and send it over to CALCUTTA TIMES, c/o The Times of India, 105/7A, S N Banerjee Road, Kolkata-14. You can also e-mail to: rationalist_prabir@hotmail.com

dictate an inert matter with one's mental force. In parapsychological terms, Mr. Rao's power will be called psycho-kinesis. In short, PK. It's worth mentioning here that parapsychology has no relation with psychology or science.

I have not seen Mr. Rao in action. I have never met him too. Whatever I have related over here is from a third person, a student of IIT-Kharagpur, Bikash Barai.He is a member of our association and was present at the time when Mr. Rao did his tricks.I have to admit that there have been quite a few loose strings in Bikash's description, for which I hold his inexperience in observation, responsible.

Naturally, I am not in a position to predict exactly what kind of trick Rao used to impress his spectators. But that it was a trick, is something I am absolutely sure of. I list below the kinds of tricks that he may have taken recourse to be enormous, since they will ultimately turn out to be my confidants.

•Trick 2:

I have to go on the same identification hunt. And get hold of a person who generally carries a bunch of keys. I have to be a lot attentive now. I have to manage to smuggle a key from the bunch and get its impression on a bar of soap. Later on I have to make a lead key from this impression. Armed with this key, I enter the auditorium, ask the same person for the bunch of keys, choose the one whose duplicate I already have, shuffle it with my piece and then show the people gathered a sample of my supernatural power.

The author is the General Secretary, Science and Rationalists' Association of India.

চাবি বাঁকানোর সম্ভাব্য কৌশল তুলে ধরছি।

❑ **কৌশল এক ঃ** ধরুন, আমি চাবি বাঁকনোর খেলায় নেমেছি। আমি এমন একজনের কাছ থেকে চাবির গোছা নেবো, যার সঙ্গে আগে থাকতেই একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি। নতুন জায়গায় গিয়ে 'নিজের লোক' তৈরি করে নেন যে কোনও পেশাদার জাদুকর। এইসব 'নিজের লোক' অনেক সময় না জেনেই জাদুকরকে অসাধারণ জাদু সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। অনেক সময় জেনে-বুঝে।

চাবি রিং তাঁর কাছ থেকেই নেবো, যাঁর সঙ্গে একটা সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পেরেছি। তিনি যে চাবির গোছা দেবেন তার ভিতর থাকবে আমারই দেওয়া একটা সীসার তৈরি চাবি। অথবা তিনিই গোছা থেকে সীসার তৈরি চাবিটাই আমার হাতে তুলে দিতে পারেন। বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় মানুষকে নিজের সহযোগী হিসেবে কাজে লাগানো কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেক জাদুকর-ই আকচার এই ধরনের বিশিষ্টদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

সীসার চাবি হাতের মুঠোর চাপে বাঁকিয়ে ফেলা কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ সীসা নরম ধাতু অথচ দেখতে লোহার মতো।

❑ **কৌশল দুই ঃ** আগে থেকেই এমন একজনের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে

তুলব, যাঁর কাছে কোনও একটা ডিপার্টমেন্টের চাবির গোছা থাকে। চাবির গোছায় অবশ্যই থাকতে হবে অন্তত একটি লোহার চাবি। কোনওভাবে তাঁর চাবির গোছা থেকে কোনও একটা লোহার চাবির ছাঁচ নরম সাবানে চাপ দিয়ে তুলে নেব। যে'হেতু চাবি বাঁকানো আমার পেশা, তাই ছাঁচ পেলে সীসা গরম করে ছাঁচে ঢেলে নকল বানিয়ে ফেলব। তারপর ওই বিশেষ মানুষটিকেই মঞ্চে ডেকে নেব, যার চাবির নকল আছে আমার কাছে। রিং থেকে আসল চাবিটি খুলব। হাতের কৌশলে আসলটি লুকোব, নকলটি বের করব। হাত সাফাইয়ের এই কৌশলকে ম্যাজিকের পরিভাষায় বলে 'পামিং'। নকলটি দেখিয়ে মুঠোবন্দি করা ও বেঁকিয়ে দেওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কতটা সময় আগডুম-বাগডুম বকে দর্শকদের বেশি করে প্রভাবিত করব— সেটা আমার ব্যাপার। সেটা দীপক রাওয়ের ব্যাপার।

দীপক রাও ও শ্রীমতী রাওয়ের টেলিপ্যাথি

শ্রী ও শ্রীমতী রাও আই আই টি ক্যাম্পাসে যে টেলিপ্যাথি করে দেখিয়েছিলেন, তা দেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমি শুনেছি। এও শুনেছি—শ্রী ও শ্রীমতী 'রাওয়ের প্রোগ্রামের ভিডিও ফোটো তোলা হয়েছিল। তুলেছিল আই আই টি কর্তৃপক্ষ। শ্রীরাও যাওয়ার সময় ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে যান। বলেন—কপি করে পাঠিয়ে দেবেন। আজ পর্যন্ত পাঠাননি। সম্ভবত বার-বার ক্যাসেটটি দেখে আই আই টি'র কেউ শ্রীরাওয়ের আসল রহস্য ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে ক্যাসেট পাঠাননি।

স্টেজে ছিলেন শ্রীমতী রাও। মুখ দর্শকদের দিকে ফেরানো। চোখ বাঁধা। এক হাতে রাইটিং প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে এগিয়ে আসতে বললেন শ্রীরাও। একজন এলেন। তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, ১ থেকে ৯৯-এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা কাগজটায় লিখুন। দেখবেন, আর কেউ যেন না দেখেন।

এগিয়ে আসা দর্শকটি সংখ্যা লিখলেন। শ্রীরাওয়ের নির্দেশ মত কাগজটা ভাঁজ করলেন। টেবিলের ওপর রাখলেন। টেবিলটা ছিল স্টেজের এক কোণে।

শ্রীরাও এবার অনুরোধ করলেন, আপনি যে সংখ্যাটা লিখেছেন, সেটা ভাবতে থাকুন। আমি আপনার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করব। আমার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করবেন আমার স্ত্রী। আলো এবং শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমন-ই চিন্তারও তরঙ্গ আছে। এই চিন্তা তরঙ্গকে ধরার নামই 'টেলিপ্যাথি'। আপনারা এখন দেখবেন টেলিপ্যাথির প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন।

দু-তিন মিনিট পার হতেই দেখা গেল শ্রীমতী রাও তাঁর রাইটিং প্যাডে খস্‌খস্ করে সংখ্যাটা লিখে পেনসিলটা হাত থেকে মঞ্চে ফেলে দিলেন। পেনসিল পড়ার

আওয়াজ শুনে শ্রীরাও চমকালেন। একজন দর্শককে ডাকলেন। অনুরোধ করলেন, মঞ্চের টেবিলে রাখা কাগজটা তুলে সংখ্যাটা উচ্চকণ্ঠে পড়তে। সংখ্যাটা পড়লেন। দর্শকরা শুনলেন।

"এই সংখ্যাটাই লিখেছিলেন তো? নাকি কাগজ পালটে গেছে?' শ্রীরাও জিজ্ঞেস করলেন। যিনি লিখেছিলেন তিনি জানালেন, এই সংখ্যাটিই লিখেছিলেন।

যিনি উচ্চকণ্ঠে কাগজের সংখ্যাটি পড়েছিলেন তাঁকে শ্রীরাও অনুরোধ করলেন, "কাইন্ডলি দেখুন তো মিসেস রাও কত লিখেছেন?"

ভদ্রলোক গেলেন। শ্রীমতী রাওয়ের হাত থেকে রাইটিং প্যাডটি নিলেন। সংখ্যাটি জোরে পড়লেন। অবাক কাণ্ড! এই সংখ্যাটিই আমন্ত্রিত দর্শক লিখেছিলেন।

"প্যাডের অন্য পৃষ্ঠাগুলো কাইন্ডলি দেখুন। সেখানে আবার আরও নানা সংখ্যা লেখা নেই তো?" শ্রীরাও বললেন।

"না। আর কিছুই লেখা নেই। সব পৃষ্ঠাই সাদা।"

উ-ফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো? ভাবা যায়? শ্রীরাওকে কাজে লাগিয়ে পাক প্রেসিডেন্ড মুশারফের সব চিন্তা ধরে নেবার সুযোগ কী বোকার মতো ছেড়ে দেবেন আডবানী? চলচ্চিত্র উৎসবে অপ্সরাদের দেখে আমাদের সংস্কৃতিবান মন্ত্রীরা কতটা হিজিবিজি নীল-চিন্তায় ব্যস্ত—সে'সব চিন্তা ধরে লিখলে ছাপার জন্য অনেক বিদেশি ট্যাবলয়েট পত্রিকা পাঁচ-দশ লাখ ডলার ইউরো বা পাউন্ড অ্যাডভান্স ধরাবার জন্য হুড়োহুড়ি ফেলে দেবে—গ্যারান্টি। রাতা-রাতি টেলিপ্যাথির প্রতিষ্ঠা—ভাবা যায়? শ্রীরাও কেন যে এত কিছু ভেবেও এ'সব ব্যাপারে নিয়ে ভাবেননি, সত্যিই অবাক কাণ্ড! তাঁর টেলিপ্যাথির এমন বিশাল প্রতিভা শতরূপে প্রস্ফুটিত হোক।

জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকেও দারুণভাবে ভাঙানো যায়। শত্রুপক্ষের সফেস্টিকেটেড যুদ্ধাস্ত্রগুলো অকেজো করতে তাদের কম্পিউটার ব্যবস্থায় গোলমাল পাকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। ভাবা য়ায়—কী অসাধারণ অস্ত্র আমাদের ভারতীয়দের হাতে আছে! শুধু কাশ্মীর কেন, গোটা পৃথিবীকে দখল করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। অথচ আমরা তা কাজে লাগাচ্ছি না।

যাঁরা সাইকোকাইনেসিস (জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ) ও টেলিপ্যাথির পক্ষে গল্প বানাব, তাঁরাও কিন্তু কখনই এইসব হিজিবিজিতে বিশ্বাস করেন না। করলে এ'সব শক্তিকে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কেন সোচ্চার নন?

যাক গে ও'সব ঢপের বিশ্বাসের কথা। আসুন আমরা যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে ফিরে দেখি।

'থট্ ওয়েভ' বা চিন্তার তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সুতরাং থট্ ওয়েভ ধরা বা টেলিপ্যাথি ব্যাপারটাই স্রেফ টুপি পরানো ব্যাপার। প্রশ্ন উঠতেই পারে—টেলিপ্যাথি যদি লোকঠকানো ব্যাপার-ই হয়, তবে ঘটনাটা ঘটলো কী করে?

❑ কৌশল ঃ আমি নিজের চোখে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের ওই টেলিপ্যাথি দেখিনি। বিকাশ বাড়ুইয়ের কাছে যা শুনেছি, তাতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কৌশলটি বলতে পারছি না। তবে সম্ভাব্য কৌশল এখানে তুলে দিচ্ছি। এ'ভাবে অবশ্যই একই ঘটনা ঘটানো যাবে।

শ্রীমতী রাও যে হাতে রাইটিং প্যাড ধরেছিলেন, সেই হাতের বুড়ো আঙুলের নখের খাঁজে আটকানো ছিল একটা 'নেইল-রাইটার'। জাদুর সাজ-সরঞ্জাম যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে খোঁজ করলেই 'নেইল-রাইটার' পাবেন। নখের খাঁজে ঢুকিয়ে দিলে সুন্দরভাবে আটকে থাকে। বাইরে দেখা দেখা যায় না। 'নেইল-রাইটার'-এ থাকে একটা ছোট্ট হোল্ডার। দৈর্ঘে দু থেকে তিন মিলিমিটার। হোল্ডারে গুঁজে দিতে হয় সরু পেনসিল-সীস। এই সীস 'নেইল-রাইটার'-এর সঙ্গে পাওয়া যায়। আলাদা কিনতে চাইলে তাও মিলবে।

শ্রীমতী রাও প্যাডে পেনসিল দিয়ে লেখার ভান করেছিলেন। আসলে কিছুই লেখেননি। তারপর পেনসিলটা ফেলে দিলেন। দর্শকরা ভাবলেন—উনি লিখলেন এবং তারপর পেনসিল ফেলে দিলেন। সংখ্যাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হওয়ার পর বাঁ হাতে ধরা রাইটিং প্যাডের পৃষ্ঠায় বাঁ হাতের আঙুল নাড়িয়ে লিখে ফেললেন সংখ্যাটি। বুড়ো আঙুলের খাঁজের 'নেইল-রাইটার' দিয়েই যে লিখলেন, এটা এতক্ষণ আপনারা সব্বাই বুঝে গেছেন।

শেষে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের কাছে একটি বিনীত চ্যালেঞ্জ—আমার মুখোমুখি হবেন নাকি আপনাদের টেলিপ্যাথি ক্ষমতা নিয়ে?

ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যাল-কে বিনীত অনুরোধ—প্যারাসাইকোলজির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আমার ও আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। হাতে কলমে প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ থাকতে 'মুখে' কেন?

জন্ডিস সারাবার পীঠস্থান ইছাপুর

ইছাপুর শিয়ালদহ থেকে মিনিট তিরিশের পথ। স্টেশনে নেমে জানতে পারলাম, একজন নয়, পুরো হাফ-ডজন সুপারম্যান এখানে বসেছেন। এঁরা অলৌকিক উপায়ে জন্ডিস রোগীদের সারিয়ে তুলছেন। এঁদের অলৌকিক ক্ষমতা চাক্ষুষ করা যায়। নিজের চোখে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখার পর একগাদা প্রশ্ন তুলে অবিশ্বাস জাহির করার মতো 'বোকা' কম-ই আছে।

অবশ্য শুধু ইছাপুরের গুণগান করলে তা হবে পক্ষপাতিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় জেলাতেই নিজস্ব ঢঙয়ে জন্ডিস সারাবার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন কিছু বাবাজি-মাতাজিরা। এঁরা কেউ মন্ত্র-পড়া মালা দেন। রোগীর গলায় ধারণ করার পর এই মালা আপনা থেকেই বাড়তে থাকে। কেউ বা রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার জলে সেই হাত ধুতেই দেখা যায় জলের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে। এ'ভাবে জন্ডিস ধুইয়ে দিলে জলের রং যত হলুদ হতে থাকবে, ততই যে হলুদ-বর্ণের রোগী স্বাভাবিক রং ফিরে পেতে থাকবে—এটা বুঝতে তেমন মাথা খাটাতে হয় না।

'জন্ডিস রোগটা কী'

জন্ডিস গ্রীষ্মের 'কমন ডিজিজ'। বাংলায় এর অনেক নাম। ন্যাবা, কাম্‌লা, পাণ্ডুর ইত্যাদি। সাধারণভাবে জীবাণু বাহিত রোগ। রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে অপরিচ্ছন্ন জল, খাবার, কাটাফল ইত্যাদি থেকে। জন্ডিসে লিভার বা যকৃত থেকে নিঃসৃত পাচকরস বা পিত্তরস রক্তে সঞ্চারিত হয়। ফলে দেহের চামড়া, চোখের সাদা অংশ, জিভ, নখ হলদে হয়ে যায়। বমি বমি ভাব থাকে। মল সাদা ও প্রস্রাব হলদে হয়। রক্তে সঞ্চারিত পিত্তরস বা বিলিরুবিনের মাত্রা পরীক্ষা করলে যদি দেখা যায় বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, তাহলে বুঝতে হবে জন্ডিস হয়েছে। স্বাভাবিকের পরিমাণ ০.১ থেকে ১ মিলিগ্রাম। ক্যানসার, টিউমার, গলব্লাডার বা পিত্তথলিতে পাথর ইত্যাদি কারণেও জন্ডিস হতে পারে।

ডুব দে মন ইছাপুরে

ফিরি ইছাপুরে। ৬ মে ২০০১ গিয়েছিলাম ইছাপুরে। সঙ্গী ছিলেন অশিস ও বিপ্লব। স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ ব্রাহ্মণ পাড়া। এখানেই তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল দোতলা বাড়ি। লাগোয়া মন্দির। মা কালীর বিশাল মূর্তি, ছোটো আকারের আরও অনেক দেব-দেবী-ই ছড়িয়ে রয়েছেন মন্দির জুড়ে।



জন্ডিসবাবা ঠাকুরদাস

তারকবাবুকে অবশ্য এ'তল্লাটে ঠাকুরদাস নামে-ই লোকেরা চেনেন। আসল নামটা হারিয়ে গেছে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার আড়ালে। গাড়ি-বাড়ি সব-ই হয়েছে জন্ডিস ধুইয়ে দেবার ক্ষমতার দৌলতে। রক্তে ছড়িয়ে যাওয়া পিত্তরস ধুইয়ে বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন। যাঁরা তাঁর এই আলৌকিক ক্ষমতা দেখেছেন,

জন্ডিস সারাবার পীঠস্থান ইছাপুর

ইছাপুর শিয়ালদহ থেকে মিনিট তিরিশের পথ। স্টেশনে নেমে জানতে পারলাম, একজন নয়, পুরো হাফ-ডজন সুপারম্যান এখানে বসেছেন। এঁরা অলৌকিক উপায়ে জন্ডিস রোগীদের সারিয়ে তুলছেন। এঁদের অলৌকিক ক্ষমতা চাক্ষুষ করা যায়। নিজের চোখে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখার পর একগাদা প্রশ্ন তুলে অবিশ্বাস জাহির করার মতো 'বোকা' কম-ই আছে।

অবশ্য শুধু ইছাপুরের গুণগান করলে তা হবে পক্ষপাতিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় জেলাতেই নিজস্ব ঢঙয়ে জন্ডিস সারাবার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন কিছু বাবাজি-মাতাজিরা। এঁরা কেউ মন্ত্র-পড়া মালা দেন। রোগীর গলায় ধারণ করার পর এই মালা আপনা থেকেই বাড়তে থাকে। কেউ বা রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার জলে সেই হাত ধুতেই দেখা যায় জলের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে। এ'ভাবে জন্ডিস ধুইয়ে দিলে জলের রং যত হলুদ হতে থাকবে, ততই যে হলুদ-বর্ণের রোগী স্বাভাবিক রং ফিরে পেতে থাকবে—এটা বুঝতে তেমন মাথা খাটাতে হয় না।

'জন্ডিস রোগটা কী'

জন্ডিস গ্রীষ্মের 'কমন ডিজিজ'। বাংলায় এর অনেক নাম। ন্যাবা, কাম্‌লা, পাণ্ডুর ইত্যাদি। সাধারণভাবে জীবাণু বাহিত রোগ। রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে অপরিচ্ছন্ন জল, খাবার, কাটাফল ইত্যাদি থেকে। জন্ডিসে লিভার বা যকৃত থেকে নিঃসৃত পাচকরস বা পিত্তরস রক্তে সঞ্চারিত হয়। ফলে দেহের চামড়া, চোখের সাদা অংশ, জিভ, নখ হলদে হয়ে যায়। বমি বমি ভাব থাকে। মল সাদা ও প্রস্রাব হলদে হয়। রক্তে সঞ্চারিত পিত্তরস বা বিলিরুবিনের মাত্রা পরীক্ষা করলে যদি দেখা যায় বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, তাহলে বুঝতে হবে জন্ডিস হয়েছে। স্বাভাবিকের পরিমাণ ০.১ থেকে ১ মিলিগ্রাম। ক্যানসার, টিউমার, গলব্লাডার বা পিত্তথলিতে পাথর ইত্যাদি কারণেও জন্ডিস হতে পারে।

ডুব দে মন ইছাপুরে

ফিরি ইছাপুরে। ৬ মে ২০০১ গিয়েছিলাম ইছাপুরে। সঙ্গী ছিলেন অশিন ও বিপ্লব। স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ ব্রাহ্মণ পাড়া। এখানেই তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল দোতলা বাড়ি। লাগোয়া মন্দির। মা কালীর বিশাল মূর্তি, ছোটো আকারের আরও অনেক দেব-দেবী-ই ছড়িয়ে রয়েছেন মন্দির জুড়ে।



জন্ডিসবাবা ঠাকুরদাস

তারকবাবুকে অবশ্য এ'তল্লাটে ঠাকুরদাস নামে-ই লোকেরা চেনেন। আসল নামটা হারিয়ে গেছে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার আড়ালে। গাড়ি-বাড়ি সব-ই হয়েছে জন্ডিস ধুইয়ে দেবার ক্ষমতার দৌলতে। রক্তে ছড়িয়ে যাওয়া পিত্তরস ধুইয়ে বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন। যাঁরা তাঁর এই আলৌকিক ক্ষমতা দেখেছেন,

তাঁরাই প্রচারক। মুখে মুখে প্রচার এতটাই ছড়িয়েছে বহু দূর দূর থেকেও রোগীরা আসেন। গাড়ির ভিড়ও থাকে। প্রণামী ১০০ টাকা থেকে শুরু।

ইছাপুরের শীতল শীল-এর বেশ নাম-ডাক। থাকেন আনন্দমঠ, সি ব্লকে। শীতলবাবুর দাবি—কয়েক হাজার রোগীকে ধুইয়ে, সারিয়ে তুলেছেন। অলৌকিক ক্ষমতার দৌলতে তাঁরও অবস্থা ফিরেছে।

একই পাড়ার বাসিন্দা রবীন চক্রবর্তী। পরিচয় দেওয়ার সময় 'এক্স মিলিটারি-ম্যান' বলতে ভোলেন না। তিনিও অলৌকিক ক্ষমতার রোগী সারাবার দাবি রাখেন।

ঠাকুরদাসের কাছে আশিস রোগী। শীতল শীলের কাছে বিপ্লব।

হাওড়ার লিলুয়া স্টেশনে নেমে অটোতে মিনিট আটেকের পথ ভট্টনগর। সেখান থেকে হেঁটে ঘুঘুপাড়া। এখানে থাকেন স্বর্ণবালা মণ্ডল। বৃদ্ধা। রোগীকে ধুইয়ে সুস্থ করেন। প্রণামী ১০০ টাকা থেকে শুরু। রোগ প্রবল হলে বেশি ধোয়াতে হয়, প্রণামী বাড়ে। এখানে রোগী ছিলেন লিলুয়ার গৌতম।

জন্ডিস ধোওয়ানোর পদ্ধতি কলকাতা থেকে গ্রাম বাংলা সর্বত্রই কম-বেশি এক-ই রকম। রোগীকে বসানো হয় পিঁড়িতে। সামনে রাখা হয় এক বাটি পরিষ্কার জল। মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। একে বলে 'ঝাড়া'। কিছুক্ষণ ঝাড়ার পর হাতটা বাটির জলে ধুয়ে নেন। অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা। জলের রং হলুদ হয়ে যায়। যিনি ঝাড়লেন, তাঁর হাতও হলুদ। হলুদ রঙ এলো কোথা থেকে? হাত যে আগে থেকে হলুদ ছিল না—এ'কথা হলফ করে বলা যায়। সত্যি কথা বলতে হাতে কিছুই ছিল না। তারপরও যা হল, তা দেখে অনেক যুক্তিবাদী ও মার্কসবাদীদেরও মুণ্ডু হেট হবে—এটাই স্বাভাবিক। কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজার মতো জিজ্ঞাসু মন না থাকলে এটাই স্বাভাবিক। মনের গভীরে অলৌকিকে বিশ্বাস ও মুখে নাস্তিক, মার্কসবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি বুক্‌লি আওড়ালে এটাই স্বাভাবিক। আমরা মধ্যবিত্ত অহংসর্বস্ব মানুষগুলো 'জানি না' বলতে-ই জানি না। জানার ভান করার মতো বোকামিতে ওস্তাদ। নিজে ভুল বুঝেছি—এটা স্বীকার করতেই শিখিনি। তারচেয়ে নিজের ভুল ভাবনাকে অন্যের মধ্যে ঢোকাতে গুল গপ্পো ফাঁদতে আমরা 'বেঁড়ে ওস্তাদ'। এইসব সবজান্তা ওস্তাদদের ওস্তাদির ফলে বাবাজি-মাতাজিরা দিব্বি করে-কম্মে খাচ্ছেন।

ধোয়ানোর রহস্য

জন্ডিস ধোয়ানোর আসল রহস্য মন্ত্রে নেই। আছে অন্য জায়গায়। বাটির জল সাধারণ জল নয়। চুন জল। জলে চুন ডুবিয়ে রাখলে চুনের ডেলাগুলো ভিজে কাদা-কাদা হয়ে জলের তলায় থিতিয়ে যায়। ওপর থেকে জল তুলে নিলে তা দেখে সাধারণ জল ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় থাকে না। যিনি রোগীকে ধোয়ান,

তাঁর হাতে লাগান থাকে আমগাছের রস। আমগাছের রস চুনজলের সংস্পর্শে এলে জল হলুদ হয়। এই সাধারণ রসায়ন বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে কিনা, তা আমাদের সচেতনতার উপর নির্ভর করে।

ইছাপুরের ঠাকুরদা, শীতল শীল ও লিলুয়ার স্বর্ণবালা যথাক্রমে আশিস, বিপ্লব ও গৌতমের জন্ডিস ধুইয়েছে। পরমভক্ত সেজে আমরা অপেক্ষা করেছি পরবর্তী রোগীর জন্য। রোগীকে ধোয়ানোর আগে তিন বাবাজি, মাতাজির হাতের তালুতে চুন জল ঢেলে দিতেই হাত গড়িয়ে হলুদ-জল। সবার সামনে তুলে ধরেছি তিন জনের ব্লাড রিপোর্ট। বিলিরুবিন নরমাল। তারপরও জন্ডিস ধোয়ানো?

জন্ডিসের মালা

জন্ডিস সারাবার আরও একটি 'লোকচিকিৎসা' হল, জন্ডিসের মালা পরা। এই লোকচিকিৎসা বা অলৌকিক-চিকিৎসা শহর থেকে গ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই দারুণ জনপ্রিয়। মন্ত্র পড়ে তৈরি কাঠির মালা রোগীর গলায় পরাতে হয়। তারপর মন্ত্র গুণে মালা একটু একটু বাড়তে থাকে। রোগও একটু একটু করে সারতে থাকে। দু-এক সপ্তাহ পরে সাধারণত দেখা যায়, সত্যিই জন্ডিস সেরে গেছে। কলকাতার হাটখোলা মিত্তির বাড়ি থেকে এই অলৌকিক জন্ডিস মালা দেওয়ার ঐতিহ্য নাকি শতাব্দী প্রাচীন। শনিবার শনিবার জন্ডিসের মালা পাওয়া যায় এখান থেকে।

বেলঘরিয়ার রবীন্দ্রকানন নিবাসী শংকর আচার্যও মালা দেন। এই মালা তৈরি ও তাঁর মন্ত্র নাকি কয়েক পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় আচার্য পরিবার ধরে রেখেছেন।

তন্ত্রভৈরব বশিষ্ঠানন্দের স্ত্রী শিখা চক্রবর্তী মালা তৈরি করেন। তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা শিখেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে।

এইসব মালার জনপ্রিয়তা একবিংশ শতাব্দীতেও বিশাল। শহর কলকাতার অধ্যাপক থেকে ইঞ্জিনিয়র জন্ডিসের মালা পরে রোগ সারার অপেক্ষায় থাকেন—এও দেখি। ২০০৩-এর জুনে আমার জন্ডিস হয়েছিল। আমার প্রতিবেশী এক ইঞ্জিনিয়র খুব-ই আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে বললেন, "আপনারা তো অনেক কিছু বিশ্বাস-ই করতে চান না। যদি আমার একটা অনুরোধ রাখেন তো আপনার জন্য একটা মালা এনে দেব। ঠাকুরনগরের এক মহিলা মালাটা তৈরি করেন। শনি-মঙ্গলবার পরলে দেখবেন সাত-দশ দিনের মধ্যে বিলিরুবিন কোথায় নেমে গেছে।"

জন্ডিস অমনি অমনি সারে

যাঁরা জন্ডিস ধোয়ান বা জন্ডিসের মালা দেন, তাঁরা সঙ্গে কয়েকটি বিধি নিষেধের কথা জানিয়ে দেন। দু'সপ্তাহ তেল-মশলার খাবার একদম নয়। বড় মাছ চলবে না। খাবেন আখের রস, বাতাবি লেবুর রস, ছোট মাছ, ছানা ইত্যাদি। দু'সপ্তাহ বাড়িতে বিশ্রাম। বিশ্বাসের সঙ্গে অলৌকিক-চিকিৎসা নিলে, এর নিয়ম মেনে চললে নাকি জন্ডিস সারবে-ই। বুক ঠুকে এ'দাবি করেন অনেক ধেড়ে শিশুরাই।

যাঁরা জন্ডিস জীবাণু জনিত যকৃত প্রদাহের রোগী, তারা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিলে, গ্লুকোজ খেলে (যা আখের রসে আছে) সাধারণত দু-এক সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনি সুস্থ হয়ে ওঠে।

অলৌকিক চিকিৎসা বা আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য না নিলেও সারে। ক্যানসার, টিউমার বা পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার জন্য যদি জন্ডিস হয়, তা হলে ধুইয়ে বা মালা পরিয়ে সারবে না। যদিও ধোয়ালে জল ঝকাস হলুদ হবে, মালাও ধেই-ধেই বাড়বে। তবু জন্ডিস সারবে না। আগে সারাতে হবে জন্ডিসের কারণ।

মালা-রহস্য

মালা বাড়ে কাঠির গুণে ও বাঁধার কৌশলে। মালাগুলো তৈরি হয় সবুজ কাঠিতে বাঁধন দিয়ে। এক একটা কাঠিকে আড়াআড়ি ধরে ফাঁস দিয়ে বাঁধা। এই বাঁধার পদ্ধতির ইংরেজি কেতাবি নাম 'শিফর্স নট'(shiffer's knot) অথবা 'সেইলর্স নট' (Sailor's knot), কাঠিগুলো বাঁধা হয় গা ঘোঁষাঘোষি করে।

সাধারণভাবে যে সব গাছের ডাল মালা গাঁথার কাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর চলতি বাংলা নাম হল—বামনহাটি, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ। এইসব গাছের ডালের জলীয়ভাব খুবই বেশি। মাটি থেকে জল টানতে না পারায় মালা তৈরির পর কাঠিগুলো দ্রুত শুকোতে থাকে। যতই শুকোয়, ততই সুতোর পাক ঢিলে হতে থাকে। দু'কাঠির মধ্যেকার ফাঁক বাড়ে। মালা বাড়ে।

কপাল কেটে জন্ডিস চিকিৎসা

মেদিনীপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের মানুষদের কাছে একটা বহুল প্রচলিত অলৌকিক চিকিৎসা হল 'কপাল কাটানো'। এ'ও এক দৈব-চিকিৎসা পদ্ধতি। অর্থাৎ দেবতার দেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি।

স্থান—মেদিনীপুর শহরের বুকে পাটনাবাজার। গরমকালে এখানে জন্ডিসবাবার কাছে রোগীদের কাতার লেগে যায়। ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারিতে জন্ডিসবাবার ডেরায় হানা দিলেন যুক্তিবাদী সমিতির খড়গপুর শাখার তিনজন—অসিত কাণ্ডার, মৃদুল মহাপাত্র ও সমর চক্রবর্তী। অসিত তুখোড় ছেলে। জন্ডিসবাবার কথা, "কপালের দোষে জন্ডিস হয়। তাই জন্ডিস কাটান দিতে কপাল কাটতে হয়।

কপাল কাটার পর শ্বেতচিত্তা গাছের শিকড় বাটা সেখানে লাগাতে হয়। ওই শিকড়ের রস রক্তের হলুদ রং শুষে নেয়।"

"তাহলে বলছেন, স্বেতাচিত্তার শিকড় রক্তে মিশে গেলে-ই জন্ডিস সেরে যায়। তবে তো কপাল না কেটে শরীরের যে কোনও অংশ কেটে ওই শিকড় বাটা লাগালেই জন্ডিস সেরে যাবার কথা, এখানে আপনার কৃতিত্ব কোথায়?" প্রশ্নটা করেছিলেন অসিত।

"এটা হল দৈব ব্যপার। মন্ত্র পড়ে না লাগালে তো কাজ-ই হবে না।" বাবাজির উত্তর।

—"প্রণামী কত পান?"

—"যে যা দেন।"

—"আজ তো বিশাল ভিড়। কত রোগী সাধারণত আসেন?"

—"আজ যেমন রবিবার, শ'পাঁচেক রোগী তো কম করে দেখতেই হবে।"

এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাবাজি কথা বলার সময় দিয়েছিলেন, কারণ, সমর চক্রবর্তী খড়্গপুরের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্পাদক। এবং সেই পরিচয়ের সুবাদেই একটা সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিলেন।

—"এই যে একটা ছুরি দিয়ে এত লোকের কপাল কেটে চলেছেন, যদি জীবাণু সংক্রমণে কেউ মারা যান, আপনি-ই তো দায়ী হবেন। তাই নয় কী?' প্রশ্নটা অসিতের।

"এমন ঘটবেই না। গ্যারান্টি আমার।" বাবাজি বুক চাপড়ে বলেন।

সমর চক্রবর্তী এবার বলেন, "আপনাকে একটা খবর দিই। খড়্গপুরের ইন্দা'র ২১ বছরের যুবক চুনা রানা এসেছিলেন আপনার কাছে। আপনি ওঁর কপাল কেটে ছিলেন। ওই কাটা সংক্রামিত হয়। যুবকটি জন্ডিস থেকে বাঁচতে গিয়ে সংক্রমণে মারা যান। যুবকটি বিয়ে করেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হবে। পারবেন তো ঠেকাতে?"

এতক্ষণ প্রকাশ্যেই টেপ রেকর্ডারে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন বাবাজী। বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে ধাঁ করে ক্ষেপে গেলেন। চিৎকার-চেঁচা মেচি জুড়ে দিলেন। ভক্তদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায় মেতে গেলেন। প্রাণ-বাঁচতে বাবাজির ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনও পথ খোলা ছিল না অসিতদের।

বেরিয়ে এসে মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারদের কাছে যুক্তিবাদী সমিতি পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করেন তিনজন। অভিযোগ আনবার কথা স্বার্থান্বেষী মহল কি পৌঁছে দিয়েছিল জন্ডিসবাবার কানে? এর মধ্যে কোনও হিংসার গন্ধ নেই তো? তা না হলে বাবাজি সে'দিনই ভ্যানিস হলেন কী করে?

মালপাড়ার পেশা দাঁতের পোকা বের করা

শহর কলকাতা গত তিন দশকে অনেক পালটে গেছে। এককালের জমজমাট শ্যামবাজার এখন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। এক সময় সন্ধে হলে যে উল্টোডাঙায় শেয়ালের ডাক শোনা যেত। সেখানে এখন মাঝ রাতেও দিনের আলো, গাড়ির হুল্লোড়। এখন ভীম নাগ বা দ্বারিক ঘোষের দোকানের 'জলভরা তালশাঁসে' সেই গোলাপের গন্ধ মেলে না। অনাদি কেবিন, বসন্ত কেবিনের নাম আর মুখেমুখে ঘোরে না। চিনে খাবারের রেস্তোরাঁ ওইসব কেবিনগুলোকে কফিনে পাঠিয়েছে। মিষ্টির দোকান ছাপিয়ে এখন ভুজিয়াওয়ালাদের রাজ। প্যারামাউন্টের আম শরবত থেকে আনারস সরবত সবই পিছু হটেছে পেপসি-কোকের সঙ্গে টাকার টক্করে। এক সময় যে প্রেসিডেন্সির দামাল ছেলে-মেয়েরা প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে শহর-গ্রাম চষে ফেলেছিল, এখন সেই প্রেসিডেন্সির ছেলে-মেয়েরা ক্যারিয়ার গুছনোকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে টক্কর দিয়ে লড়া মেয়েদের সাহস অবাক করত, আজও করে আমার মত প্রাচীনকে। বাজারি পত্রিকা উনিশ-কুড়িদের জানাচ্ছে, নগ্নতা ও যৌনতার আর এক নাম 'সাহসী মেয়ে'।

আবার পালটানি অনেক কিছুই। একই রকম আছে কালীঘাটের পাণ্ডাদের গুণ্ডামি, ধনীদের গুরু পোষার রেওয়াজ, দক্ষিণের কেপমারিদের পুজোয় কলকাতায় আগমন, রেললাইনের পাশের ঝুপড়িগুলোতে গাঁজার বিকিকিনি, কলকাতার ফুটপাথে পর্ণোবইয়ের ঢালাও বিক্রি, পুলিশের প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়া, মধ্যবিত্তদের বিনেপয়সায় মদ খাওয়ার হ্যাংলামো, দক্ষিণ-ভারতীয়দের বসতি এলাকায় সন্ধে হলে ফুল বিক্রির ধুম, মুসলিম এলাকায় সুরমা, আতর, কান পরিষ্কার ও দাঁতের পোকা বের করার ব্যবসা।

দাঁতের পোকা বের করা যাদের পেশা, তারা সব আসে দক্ষিণ শহরতলি থেকে। কেউ পার্কসার্কাস স্টেশনে নেমে ছড়িয়ে পড়ে, কেউ নামে শিয়ালদহে।

দাঁতের পোকা বের করা এখনও একটা গ্রামের অধিবাসীদের একমাত্র জীবিকা।

গ্রামের নাম—মালপাড়া। শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন থেকে ট্রেন মিলবে জয়নগর যাওয়ার। জয়নগর স্টেশন থেকে মালপাড়া দু'কিলোমিটারের পথ। অটো ও ভ্যান রিকশা পাওয়া যাবে স্টেশনেই।

জয়নগর যেমন বাঙালিদের কাছে 'মোয়া'র জন্য বিখ্যাত, তেমনই কলকাতার অবাঙালি মুসলিমদের কাছে বিখ্যাত মালপাড়ার জন্য। মালপাড়াবাসীরা শুধু দাঁত থেকে পোকা বের করে না, কান থেকেও বের করে। কান কট্‌কট্‌ করছে? ওদের কাছে বসে পড়লে যত্ন করে কান পরিষ্কার করে, কান থেকে পোকা বের করে দেয়। তারপর বিধান দেবে দু-বেলা দু'ফোটা করে সরষের তেল কানে দিতে।

২০০০-এর আগস্টে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' চ্যানেলের হয়ে ডিরেক্টর প্যাট্রিক মার্ক এলেন 'ইন্ডিয়া'জ ডাইরি' শিরোনামে একটা সিরিজ তুলতে। ওঁরা ভারতের নানা অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা তুলতে চান। ধরে রাখতে চান বাবাজি-মাতাজিদের তথাকথিত নানা ব্যাপার-স্যাপার। দেখতে চান যুক্তিবাদী সমিতি এ'সবের কী ব্যাখ্যা দেয়, কীভাবে বুজরুকি ফাঁস করে। তালিকা তৈরির দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তালো।

আমরা ঠিক করলাম তালিকায় মালপাড়া রাখব। টিভি টিম নিয়ে হাজির হসলাম মালপাড়া গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম। গোটা পনেরো পরিবারের বাস। ধর্মে ইসলাম। পারিবারিক সূত্রে এরা নাকি পেয়েছে 'দোয়া-কল্‌মা'র বিশেষ পদ্ধতি। এই দোয়ার শক্তিতে আল্লার দয়ায় দাঁতে বা কানে পোকা থাকলে ঝুরঝুরিয়ে বেরিয়ে আসে। নগদ দামে 'দোয়া-কল্‌মা' শিখতে চাইলাম। জানলাম—এ বিদ্যে টাকা দিলেই শেখা যায় না। আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এই গ্রামের কোনও পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। তবেই শেখানো হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। দাঁত ও কানের পোকা বের করে মানবসেবায় আমি নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করলে আল্লা নিশ্চয়ই দানা-পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। কারণ এ হল চরম সত্য যে, প্রতিটি খাবারের দানায় আল্লা লিখে নেন খানেওয়ালার নাম। অর্থাৎ পোকা বের করে মানবসেবাই হবে আমার একমাত্র জীবিকা। অন্য কোনও জীবিকা রাখতে পারব না।

বেলা গড়ালেই সকালে পান্তা পেটে দিয়ে সমর্থ পুরুষরা বেরিয়ে পড়ে সেবা ও রোজগারের ধান্ধায়। পাড়ায় থাকে নারী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। দূর দূর গ্রাম থেকে বেশ কিছু রোগী হাজির হয় মালপাড়ায়। বাড়িতে বসেই নারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অলৌকিক-চিকিৎসা করেন।

আয়নাল মাল, বয়স পঞ্চান্ন। বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করেন। আয়নালের বাড়ির সামনে প্রশস্ত উঠোন। একপাশে টিউবওয়েল। উঠোনে বসে আয়নাল। তাঁর সামনে একটা বছর দশেকের বাচ্চা বসে। ওর দাঁতে ব্যথা। ছেলেটির নাম হারু মণ্ডল। বাবা তারাপদ মণ্ডল। থাকেন ধামুয়ায়। মুদির দোকান আছে। এসেছেন ছেলের দাঁতের ব্যথা সারাতে। তারাপদ জানালেন, "ডাক্তার দেখাতে গেলে

এককাড়ি খরচা। এখানে পনেরো টাকাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। এখুনি দেখবেন, দাঁত থেকে কেমন ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে পোকা পড়বে।"



পোকা তুলছে মালপাড়ার এক বৃদ্ধা

বললাম, "দাঁতে তো পোকা হয় না। দাঁতের ফাঁকে বা মুখে জীবাণু থাকলেও তা তো আপনি খালি চোখে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে পড়তে দেখবেন না।"

"পড়ে কি না, এ নিয়ে তক্কের দরকার নেই। এখুনি দেখতে পাবেন।" এ'কথা যিনি বললেন, তিনিও এসেছেন বালিকা কন্যাকে নিয়ে। এসেছেন ডায়মন্ডহারবার থেকে। নাম হরিপদ হালদার। মেয়ে লক্ষ্মীর কানে ব্যথা কয়েক দিন ধরে।

তর্কে গেলে যে জন্যে আসা তা-ই পণ্ড হতে পারে। অতএব বে-ফাঁস কথা শুধরে বললাম, "সত্যি, কত কম-ই না জানি আমরা।"

এখানে আসার আগেই আমরা একটা হোম ওয়ার্ক করে নিয়েছিলাম। জয়নগরের শম্ভু দাশ ও সমীর হালদার এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ওঁরা দু'জনই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন একটা বিষয়ে—এলাকা ধর্মান্ধ মুসলিমদের। আশেপাশের গাঁয়ের মুসলিমরা ও মালপাড়ার গ্রামবাসীদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। ওদের বিশ্বাসে আঘাত লাগলে বা কোনও ভাবে গোলমালে জড়িয়ে পড়লে এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ'সব শোনার পর আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছিলাম, যদি পোকা বের করার কৌশল ধরতেও পারি, তবু পরিস্থিতি প্রতিকূল মনে হলে ওখানেই রহস্য বে-আব্রু করার ঝুঁকি নেব না। কাছাকাছি অন্য কোথাও ক্যামেরার সামনে রহস্য উন্মোচন করে দেখাব। অবশ্য কোটি টাকার প্রশ্ন হল এটাই যে—রহস্যের গোপন কারণটা ধরতে পারব তো? বাস্তবে না নেমে 'পারব' বলা যতটা সোজা, বাস্তবে নেমে ধরা ততটাই কঠিন। এবং এটাই কঠিন বাস্তব।

শম্ভু ও সমীর ছাড়া আমার সঙ্গী ছিলেন সৌরভ দাশগুপ্ত ও গোপাল রায়। সৌরভের ভূমিকা দোভাষীর। গোপালের দায়িত্ব ম্যানেজারের। বলতে পারেন প্রোডাকশন ম্যানেজারের। সব কিছুর ওপর নজর রাখার।

'দাঁতে পোকা হয় না'—আমাদের এমন নিশ্চিত বক্তব্যে অনেকেই বিরক্ত হতে পারেন। কারণ ছোটোবেলা থেকেই আমরা 'দাঁতে পোকার গল্প' শুনে আসছি। টিভির বিজ্ঞাপনে দেখছি। আজ হঠাৎ উল্টো কথা শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন হতে-ই পারে। আর দাঁতের পোকা তোলা নিজের চোখে দেখলে তো কথাই নেই। দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁতের গভীর ক্ষয়—এ'সব হলে এখনও বেশিরভাগ ভারতীয় বলেন, "দাঁতে পোকা ধরেছে"।

আসলে দাঁতে পোকা ধরে না। দাঁতের ক্ষয় হয়। একেই চলতি কথায় বা ভুল ভাবনা থেকে আমরা 'পোকায় ধরা' বলি। দাঁত এই যে ঝক্‌ঝকে সাদা, এর কারণ দাঁতে রয়েছে 'এনামেল' (enamel) 'কোটিং'। দাঁতের ভিতরে সূক্ষ্ম স্নায়ু রয়েছে। দাঁতের বাইরের অংশে কোনও স্নায়ু বা রক্তবাহী শিরা নেই। ফলে দাঁতের নিজস্ব কোনও ব্যথা অনুভবের ব্যাপার নেই।

আমরা যখন খাবার খাই, তখন দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা ঢুকে থাকে। এই খাদ্যকণায় পচন ধরে, জীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। চিনি, চকোলেট, লজেন্স, মিষ্টি এ'সব বেশি খেলে এবং খাবার পর ঠিক মতো দাঁত পরিষ্কার না করলে জীবাণু শর্করা খাদ্যকণার সাহায্যে দ্রুত নানা ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে। যেমন, ল্যাকটিক অ্যাসিড, বুটারিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যেতে থাকে। দাঁতের ক্ষয় ঘটলে দাঁতে ছিদ্র তৈরি হয়। ছিদ্র পথ দিয়ে ঠান্ডা জল বা মিষ্টির রস ইত্যাদি দাঁতের ভিতরের স্নায়ুকে

স্পর্শ করে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়। যন্ত্রণা হতে থাকে। মনে রাখতে হবে, দাঁতের জীবাণু আকারে এতই ছোট্ট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং খালি চোখে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে দাঁতের পোকা বেরুতে থাকলে বুঝতেই হবে, দাঁতের ক্ষয় নিয়ে সাধারণের অজ্ঞতাকে মূলধন করে লোক-ঠকানোর ব্যবসা চলছে। দাঁতে পোকা হয় না—এই মূল বিষয়টা বুঝে নিলে প্রত্যয়ের সঙ্গে বুজরুকি ধরার চেষ্টায় নামা যায়। সব জায়গায় একই নিয়ম।

যে বিষয় নিয়ে সত্যানুসন্ধানে নামা, সে বিষয়ে পরিষ্কার একটা ধারণা গড়ে তোলা জরুরি। নতুবা 'হতেও পারে, নাও হতে পারে'—এই ধরনের দ্বিধা থেকেই যাবে। প্রত্যয় থাকাটা জরুরি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এরপর লাগে প্রতারণা ধরার মেধা।

'দাঁত থেকে পোকা বের হতে পারে না'—এই প্রত্যয় থাকলে কীভাবে পোকাগুলো বের করা হচ্ছে, ধরতে পারব—এমনটা নয়। কোনও আপাত-ব্যাখ্যাতীত ঘটনার কারণ খুঁজে বের করাটা অনেক সময় খুবই কঠিন কাজ হতে পারে। আমরা কেউ-ই সব কিছু জেনে বসে নেই। প্রয়োজনে কোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হয়। নিইও। এই বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, শরীর-বিজ্ঞানী, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, মনোবিদ, জাদুকর বা অন্য কেউ হতে পারেন। এ'ভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগোই। আমাদের বোধ, আমাদের অভিজ্ঞতা, বুজরুকি ফাঁস করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

আয়নাল ও হারু মুখোমুখি উবু হয়ে বসে। দু-জনের মাঝখানে রয়েছে একটা স্টিলের বাটিতে টিউবকলের পরিষ্কার টলটলে জল। আয়নালের হাতে একটা ছোট মেডিকেটেড তুলোর প্যাকেট। ওষুধের দোকান থেকে কেনা। নীল রং-এর শক্ত কাগজে মোড়া প্যাকেটটার মাথার দিকটা আমাদের সামনেই ছিঁড়লেন আয়নাল। প্যাকেটে পরতে পরতে জড়ানো তুলো থেকে একটু ছিঁড়ে হারুর দাঁতে চেপে ধরলেন। বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন আয়নাল। বোধহয় 'দোয়া' পড়ছিলেন। মিনিট দু-তিন পরে দাঁতে চেপে রাখা তুলোটা বের করলেন। বাটির পরিষ্কার জলে তুলোটা ডুবিয়ে নাড়তে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, আধ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা সাদা রং-এর চার-পাঁচটা পোকা জলে নড়ে-চড়ে বেড়োচ্ছে। পোকাগুলো দেখতে অনেকটা পুরনো চালের পোকার মতো।

আয়নাল তারাপদ'র দিকে ফিরে বললেন, "যান, আপনার ছেলেকে নিশ্চিন্তে নিয়ে যান। সব পোকা বেরিয়ে গেছে।"

আয়নালের ছবি তোলা হচ্ছে। ওঁকে টিভি'তে দেখা যাবে, এটা আয়নাল এবং তাঁর পরিবারের লোকদের বোধহয় ভালোই লাগছিল। আয়নালের ছবি তোলা হচ্ছে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। আমি-ই ওঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসাচ্ছি। বাটির পোকার ছবি উঠছে। ওঁর বাঁ-হাতে ধরা তুলোর প্যাকেটটা ডান হাতে ধরিয়ে দিলাম। বাঁ হাতে ধরালাম জলের বাটি। ছবি উঠছে। এ'সব করতে করতে আয়নালের হাতের তুলোর একটু অংশ যে আমার হাতে এসে গেছে, সেটা আয়নালের জানা ছিল না।

আপাতত ছবি তোলায় সাময়িক বিরতি। লাঞ্চ ব্রেক। কাছেই শম্ভু মাস্টারের বাড়ি। ওখানেই লাঞ্চ প্যাকেট রয়েছে। তারাপদ মণ্ডল আর হারুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই এলাম শম্ভুর বাড়ি। এক বাটি জল এলো। আয়নালের কাছ থেকে লুকিয়ে আনা টুকরোটা জলে নাড়তে লাগলাম। কোথায় কী? শুধু জল আর ভেজা তুলো। তুলোটা এবার টেনে কিছুটা ছড়িয়ে দিয়ে নাড়তেই গোটা তিনেক সেই বিশেষ সাদা পোকা কিলবিল করতে লাগলো। শম্ভুর স্ত্রী রানু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওমা? এতো দেখছি সজনে ডালের পোকা। দাঁড়ান এক্ষুনি এনে দেখাচ্ছি।"

দৌড়ে একটা সজনে ডাল নিয়ে এলেন উঠোনের কোনের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা থেকে। দিন কয়েক আগে সজনে ডাল কাটা হয়েছিল। ভেজা জায়গায় থাকার জন্য ডালের ছালগুলো ফুলে উঠেছে। শম্ভু ছালের একটা অংশ টানতেই হাতে উঠে এলো। ডালের সাদা অংশটা দৃশ্যমান হল। সাদা ডালে কিলবিল করছে একগাদা সাদা পোকা, যে ধরনের পোকা দাঁত থেকে বেরিয়েছিল।

রানু জানালেন, তেপোলতে গাছের ডাল কেটে ভিজে জায়গায় ফেলে রাখলেও এই পোকা হয়।

লাঞ্চ ব্রেকের পর আবার আমরা মালপাড়ায় হাজির হলাম। এ'বার আমাদের ক্যামেরা ধরল ময়না মাল ও তাঁর মেয়ে জেসমিন মালকে। দু'জনেই দাঁতের ও কানের পোকা তোলেন। পদ্ধতি আয়নালের মতই। ময়নার বয়স পঞ্চান্ন-ষাট। জেসমিন পঁয়তিরিশ-চল্লিশ। এখানেও বাটিতে জল, দাঁতে তুলো চেপে ধরা, জলে পোকা বেরিয়ে আসা—সব একই ছবি। ছবিটা এ'বার একটু পাল্টাল। জেসমিনের হাতের তুলোর প্যাকেট থেকে একটু তুলো ছিঁড়ে নিয়ে জলে নাড়তেই পোকা বেরিয়ে এলো।

শুটিং দেখতে ভিড় বেড়েছে। দর্শকদের অনেকেই জয়নগরের মানুষ। ভিড়

করছে যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরাও। সব্বার সামনে এমন ভাণ্ডাফোড় হতে দেখে ময়না ও জেসমিন যদিও বা ফুঁসে উঠেছিলেন, কিন্তু জনগণে তীব্র ক্ষোভ দেখে তাঁরা গুটিয়ে গেলেন।

প্যাট্রিক মার্কের একটা প্রশ্ন ছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্যাক করা কটনের ভিতর ওরা পোকা ঢোকাচ্ছে কী করে? এটা তুমি ব্যাখ্যা করতে না পারলে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না যে, ওরা প্রতারণা করছে।"

ময়নার কাছে আরও একটি তুলোর প্যাকেট ছিল। সেটা ঝট্ করে তুলে নিলাম। ক্যামেরার সামনে দেখালাম, আপাতভাবে মনে হচ্ছে নিখুঁত প্যাকেট করাই রয়েছে। কিন্তু এই প্যাকেটের দু'প্রান্তের আঠায় জোড়া অংশই প্রথমে খোলা হয়েছে, তুলোয় পোকা ঢুকিয়ে ডেনড্রাইট, কুইকফিক্স ইত্যাদি জাতীয় কোনও আঠা দিয়ে আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর প্যাকেট খুলে তুলো বের করে দাঁতে চেপে পোকা বের করার কেরামতি দেখিয়ে চলেছে মালপাড়া।

ইতিমধ্যে অন্তত বার পনেরো মালপাড়ার বুজরুকি ফাঁসের কাহিনি দেখিয়েছে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' চ্যানেল। কিন্তু দাঁতে যে পোকা হয় না, এ'বিষয়ে আমরা কি সচেতন হয়েছি। আমরা 'শিক্ষিতরা'?

নিমপীঠের গুগি মা ও অধ্যাত্মবাদ

মুখবন্ধ

এই কাহিনির একটি মুখবন্ধ লেখার ইচ্ছে হচ্ছে। লেখা না বলে টোকা বলতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংস্কারের যে রূপরেখাটি তৈরি করেছেন, তার মুখবন্ধ থেকেই কিছুটা পুরোপুরি টুকে দিলাম।

"১৮২০ বা ১৮৩০ সালে নবজাগরণের ধারক 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চিন্তা ভাবনা বা জীবনচর্যার যে বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি, তাতে মূল সুরটিই ছিল নাস্তিকতা। পশ্চিমী সংস্কৃতির ঝোড়ো বাতাসে কোন্‌ঠাসা হয়ে পড়েছিল প্রাচ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক ঐতিহ্য। পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণই সেই সময়কার অভিজাত সমাজের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বর-ই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অভিজাত বাঙালি বিধবা রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নতুন পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ। তিনি ও তাঁর ভুবনজয়ী শিষ্য বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতকে পথ দেখাল। চিন্তার জগতে যে আলোড়নের সূত্রপাত দক্ষিণেশ্বর চত্বরে, পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামও তা থেকে পুষ্টিলাভ করে।"

এই বাংলার ভোটারদের মধ্যে একটা ধারণা বাসা বেঁধে ছিল—মার্কসবাদীরা নাস্তিক। মার্কস সাহেব নাস্তিক ছিলেন বলেই এমন ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল।

মুখবন্ধে যা লেখা হয়েছে, তাতে কিছু 'সত্যি' কিন্তু সত্যিই আছে। অলৌকিক, জ্যোতিষ, ভূত, ভগবানে এ'দেশের আমজনতা একদা গভীর বিশ্বাস রাখত। এটা সত্যি। ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিক্যচিন্তা সেই বিশ্বাসে সূক্ষ্ম চিড় ধরিয়েছিল। এও সত্যি। ১৯৮৫ সালে ভূমিষ্ঠ যুক্তিবাদী আন্দোলন বছর পাঁচেকের মধ্যেই সূক্ষ্ম চিড়কে বৃহৎ ফাটলে পরিণত করেছিল। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি, কংগ্রেস ও মার্কসবাদী

পার্টি — সবাই চেষ্টা করছে ফাটল মেরামতের। নইলে সমাজ কাঠামোর বাঁধই যে ভেঙে পড়বে। স্বার্থ থেকে এই ঐক্য যতটা, অনৈক্যও ততটাই। প্রত্যেকেই চাইছে অন্যকে পিছনে ফেলে গদি দখল করতে। এই হল মহান ভারতের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।

এ দেশের হিন্দু নাগরিকদের সাধু বা অবতার হওয়ার অধিকার তার জন্মগত অধিকার। 'সাধু' হতে খ্রিস্টান জগতের মতো পোপের পায়ে তেল লাগাতে হয় না। 'ভারত' নামের এ দেশে নিজেকে 'অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী' বলে বিজ্ঞাপন দিলেই অবতার হওয়া যায়। পাবলিক পাগলের মতো দৌড়াতে থাকে অবতারের দিকে। ছিদ্রান্বেষী যুক্তিবাদীরাও ছুটতে থাকে। তবে অন্য কারণে।

'নেই'-এর জগতে আছেন শুধু 'গুগি মা'

কলকাতার কাছেই নিমপীঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে নেমে নিমপীঠে যাওয়ার ভ্যান রিকশা মিলবে। নিমপীঠ-এ আপনাদের নিয়ে যেতে চাই, কারণ এই পীঠ দুই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গমস্থল। একদিকে আধাত্মিক ঐতিহ্যময় রামকৃষ্ণ মিশন। আর একদিকে 'গুগি মার থান'।

রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু বলে ফেলেছি। বরং অনেক কিছু বলার আছে গুগি মা'র থান নিয়ে। বড় প্রচার মাধ্যমগুলোর এখনও নজরে পড়েনি। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার হতদরিদ্র রোগগ্রস্ত মানুষগুলোর কাছে গুগি মা'র থান-ই শেষ ভরসাস্থল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় শতকরা অন্তত নব্বই ভাগ মানুষই গরিব। এই অঞ্চলের বাচ্চা-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে এক বেলা ভাত জোটাবার তাগিদে। সকাল থেকে সন্ধে চিংড়ির পোনা ধরতে বুক দিয়ে জল ঠেলে এগুতে হয়। একটা পোনা কুড়ি পয়সা। বারো ঘণ্টা খাটলে মেলে দশ থেকে কুড়ি টাকা। জলে আছে কুমির-কামোট-জলদস্যু। ডাঙায় বাঘ-সাপ-রাজনৈতিক খুনোখুনি। চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে কুমির ধরে, হাঙ্গর ধরে। তারপরও পেট ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে। পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, রাস্তা নেই, চিকিৎসার বালাই নেই। এই 'নেই'-এর জগতে গুগি মা'র মতো অলৌকিক চিকিৎসাই শেষ ভরসা।

গুগি থানে আমরা ক'জন

গুগি মা'র গল্প অনেক শুনেছি। অনেকে শুনিয়েছেন। এরা কেউ নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন গুগি মা'র অলৌকিক ক্ষমতা। কেউ বা মা'য়ের লোমহর্ষক শক্তির কথা শুনেছেন আত্মীয়ের মুখে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০০। সকাল ন'টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি গুগি মা'র থানে। আমরা মানে শম্ভু দাস, সমীর হালদার, কল্যাণী ও যুক্তিবাদী সমিতির স্থানীয় জনাদশেক কিশোর-কিশোরী। সঙ্গে রয়েছেন ফোটোগ্রাফার ফান্টা।



গুগি মা

সাতসকালেই বিশাল লাইন পড়েছে। লাইনের সবাই রোগী। খালি পেটে আসতে হয় বলে ভোর থেকেই রোগীদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। আমি আর ফান্টা ছাড়া আমাদের সঙ্গীরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে। ওরা এসেছে বিভিন্ন সময়ে, রোগী সেজে।

টিভি'র জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। দেখতে আর মুখ দেখাতে আশে-পাশের বাড়ির বউ-বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীরা ভিড় জমিয়েছে। সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ।

'গুগি মা' একজন বোবা বউ। 'গুগি' মানে বোবা। গুগি মা'র বাবা রবীন্দ্রনাথ

পুরোকাইতের সঙ্গে কথা হল। পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে সংসার। এক সময় এই সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরত। গুগি জন্ম বোবা। তাই ওকে ছোট্টবেলা থেকেই গুগি বলে ডাকত সবাই। সে নামটাই থেকে গেছে। গুগির বিয়েও দিলাম। স্বামী ছিলেন কালী-ভক্ত। তান্ত্রিক। আমার গুগি দেখতে খারাপ ছিল না। জানেন তো, তন্ত্রে আছে—সুন্দরী ছাড়া ভৈরবী করা যায় না। মা, মেয়ে, বোন, বউ যে কেউ ভৈরবী হতে পারে। কিন্তু তাকে সুন্দরী হতে হবে। গুগি ছিল একই সঙ্গে স্ত্রী আর ভৈরবী। তারপর হঠাৎ করে ওর বরটা মারা গেল। বিধবা গুগি ফিরে এলো এ বাড়িতে। তাও বছর ১৩-১৪ হল। আসার পর মা'কালী ওকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সংসার থেকে রোগ-ভোগ দূর করার ক্ষমতা দিল। লোকে বলে অলৌকিক ক্ষমতা আছে গুগি মা'র। সত্যিই তা আছে। এই ১৩-১৪ বছরে হাজার হাজার রোগী এসেছে। প্রত্যেকেই ঠিক হয়ে গেছে। গুগি মা'র হাত দিয়ে ভক্তরোগীদের সেবা করে চলেছে স্বয়ং মা কালী। এসেছেন যখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন মা'র ক্ষমতা। মা'র থান মাহাত্ম্য।"

ছবি তুলছেন ফান্টা। গুগি মা'র থানের ছবি। আগে প্রকট দারিদ্র্য থাকলেও এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। বিঘাখানেক জমির চৌহদ্দি ঘিরে 'এল' প্যাটার্নের পাকা বাড়ি। অনেক ঘর। বেড়ায় ঘেরা বাগান। গুগি মা'র থানে ঢুকতে হয় বেড়ার গেট পেরিয়ে। ঢুকলেই ডাইনে মন্দির। মন্দিরে মা কালীর মাটির বড় মূর্তি। সামনে গোলা সিঁদুর লেপা ঘট। ঘটের উপর শুকনো আমের পল্লব, ডাব আর রাশি রাশি ফুল। ফুলগুলো টাটকা। সকালেই এক দফা মা'য়ের পুজো হয়ে গেছে। জ্বলছে বড়ো একটা প্রদীপ, একগুচ্ছ ধূপকাঠি। মূর্তির গলায় জবা ও অপরাজিতার মালা। রোগ মুক্ত হয়ে কেউ কেউ মানত রাখতে সোনা-রুপোর অলংকার দিয়ে গেছে ঠাকুরকে।

বাগানে রয়েছে পেয়ারা, আম, জবা, টগর, করবি, অপরাজিতা গাছ। মাচা বেয়ে উঠেছে লাউয়ের লতা। গুগি মা'র থানের কল্যাণে যৌথ পরিবার আঁটো-সাঁটো। পাঁচ ছেলে সংসার পেতেছে। তাদের পরিবারের সবাই এখন গুগি মা'র সেবায়ত। দুই মেয়েও মা'য়ের সেবাকেই জীবনের লক্ষ্য করেছে। মা'য়ের সেবা নিজ-সেবা সব একাকার।

লাইনে দাঁড়ানো রোগীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরা প্রায় সকলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। অনেকেই এসেছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। দেখে মনে হচ্ছিল মহিলাদের বেশিরভাগই অপুষ্টিতে ভুগছেন। ওদের অসুখ বলতে পেট খারাপ, মাথায় যন্ত্রণা, বুক ধড়ফড়, অম্বলের জ্বালা, হাজা, মাথায় ব্যথা, হাত বা পায়ের অবশতা ইত্যাদি। হয়তো বা ওরা গ্যাসট্রিক, ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, পেটের আলসার বা স্পন্ডেলাইটিস রোগী। কিন্তু ওরা তা জানে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র কই, যে জানবে? ওইসব রোগের উপসর্গ যেমন পেটের অসুখ, মাথা যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বুক

ঠড়ফড় ইত্যাদিকে মূল রোগ বলে মনে করে ওরা। আবার এমনও হতে পারে, দারিদ্র্যের চাপ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে মানসিক কারণে নানা অসুখ দেখা দিয়েছে ওদের শরীরে।

মানসিক কারণেও শারীরিক অসুখ হয়। আমাদের অসুখের শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগেরই কারণ মানসিক। এই ধরনের অসুখকে Psycho-Somatic Disease বলে। মানসিক কারণে অসুখের মূলে রয়েছে—দারিদ্র, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। আর এমন মানসিক অবস্থা থেকে অনেক রোগই হতে পারে। যেমন—শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, বুক ফড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, স্পন্ডেলাইটিস, হাঁপানি, ক্লান্তি ইত্যাদি। মানসিক কারণে তৈরি হওয়া রোগ আবার মানসিক কারণে সেরেও যায়। এই ধরনের রোগী যদি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে মাদুলি-তাবিজ-রত্ন-জলপড়া বা ওষধি-মূল্যহীন ট্যাবলেট ইত্যাদি গ্রহণ করে, তাহলেও তার রোগ সারতে পারে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে Placebo চিকিৎসা পদ্ধতি।

মানলাম গুগি মা'র কাছে যারা আসে তাদের মোটামুটি অর্ধেক রোগী ভালো হয়ে যায়। এও মানলাম গরিব মানুষরা, বিশেষত দরিদ্রশ্রেণির নারীরা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগই মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভোগে। অতএব আসল রোগীদের কেউ-ই গুগি মা'র ক্ষমতার জোরে আরোগ্যলাভ করে না। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়—গুগিমা এমন কী দেখান, যা দেখে মানুষরা গভীরে বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে?

গুগি মা'র চমৎকার

গুগি মা যা দেখাচ্ছিলেন, তাকে আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ছাড়া আর কী-ই বা বলি? একজন করে রোগীর ডাক পড়ছে। তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ছোট্ট পিতলের ঘট। মা'র সাহায্যকারী বলে দিচ্ছে, সামনে পুকুর থেকে ঘট ভরে জল আনতে। জল আনার পর তাকে মন্দিরের সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে শুয়ে পড়তে বলছে। শোবার আগে গুগি মা ঘটটা রোগীর হাত থেকে নিজের হাতে নিচ্ছেন। শোবার পর রোগীর পেটে বসিয়ে দিচ্ছেন ঘট।

গুগি মা'র যৌথ পরিবারের সকলেই মা'য়ের সেবায় লেগে পড়েছে। ঘটটা পেটে বসানোর পর মা'র সহকারী একজন রোগীকে বলছে, ডান হাতের তালু দিয়ে ঘটের মাথাটা চেপে ধরতে। এ'বার শুরু হচ্ছে গুগি মা'র ঠোঁট নাড়ানো। মা নাকি মনে মনে মন্ত্র পড়ছেন। মনে মনে ভাবতে ঠোঁট নাড়াতে হয় নাকি? বোবা ঠোঁট নাড়লে মন্ত্র উচ্চারিত হয় কীভাবে?—এ'সব কূট প্রশ্নে আদৌ যাচ্ছি

না। যা শুনেছি, যা দেখেছি, তাই লিখছি।

মিনিট তিনেকে মন্ত্র পড়া শেষ। মা'র সহকারী রোগীকে বলছে—ঘটিটা এবার হাতে নিয়ে উঠে পড়ুন। সাবধানে উঠবেন, যাতে ঘটির জল না পড়ে যায়।

রোগী বা রোগিণী উঠে দাঁড়াবার পর বলা হচ্ছে ঘটের জল চাতালের একপ্রান্তে ঢালতে। জল ঢালতেই অবাক কাণ্ড! জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে গাছের শিকড় বা ছোট্ট একদলা ময়লা। মায়ের সেবাইত মুখস্ত আওড়ে চলেছে—"আপনাকে কেউ তুক করেছিল। তুক করে যা খাইয়েছিল, মায়ের কৃপায় তা সবই বেরিয়ে গেল। যান, ভালো হয়ে যাবেন। ভালো হয়ে যাবার পনেরো দিনের মধ্যে যে কোনো সন্ধের সময় পুজো দিয়ে যাবেন।"

প্রণামীর পনেরো টাকা মা'কালীর সামনের রেকাবিতে রেখে বিস্মিত রোগী বা রোগিণী গুগি মা আর মা কালীকে প্রণাম করে নেমে যাচ্ছে।

মন্দিরের ঘরের দরজা খোলা। খালি ঘট চলে যাচ্ছে মন্দিরের ভিতরে। মা'য়ের মৃণ্ময়ী মূর্তির পায়ে খালি ঘট তলায় নামিয়ে রাখছেন মা'র পরিবারের একজন। দশ বাই বারো সাইজে মন্দিরের তিন ফুট চওড়া দরজা। দরজা দিয়ে ঘরের পুরোটা নজরে আসে না। এই সুযোগ নিয়ে খালি ঘটে কিছু ফেলে দেওয়া হচ্ছে না তো?

পুকুরে জল ভরতে যাবার আগে চারজন রোগীর ঘটের ছবি তোলালাম। আসলে ছবি তোলা অজুহাতে ঘটের ভিতর আলো ফেলে একবার দেখে নেওয়া। না, কোনও কারচুপি নেই। আমি কিছু পাইনি বুঝে, আমাদের সমিতির অনেকেই বোধহয় একটু দমেই গেল। শত হলেও তারা আমাদের জয় দেখতে অভ্যস্ত। আমাদের জয় দেখতে চায়। এই অবস্থায় এ কী বিপত্তি?

ডাক পড়লো লাইনে দাঁড়ানো কল্যাণীর। আমাদের সমিতির মেয়ে। উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্রী। চট্‌পটে। কিছুটা ছটফটেও। ওর হাতে একটা পিতলের ঘট দিয়ে গুগি মা'র এক ভাই বললো, "যাও পুকুর থেকে জল ভরে আন।" ঘটে জল ভরে মন্দিরের বারান্দায় উঠলো কল্যাণী। নির্দেশ মতো শুয়ে পড়ল। ওর পরনে সালোয়ার কামিজ। কামিজটা পেটের উপর তুলে পেটে ঘটটা বসিয়ে দিয়ে হাতটা সবে তুলেছেন গুগি মা, ওমনি কল্যাণী চেঁচিয়ে উঠলো, "আমার ঘটের ভিতর কী সব রয়েছে দেখছি।" কল্যাণীর হাতের আঙুল ঘটের ভিতরে।

মুহূর্তে হুলুস্থুল বেঁধে গেল। গুগি মা'র পরিবারের লোকেরা কল্যাণীর হাত থেকে ঘটটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কল্যাণীও নাছোড়। কল্যাণী মেয়ে বলে বে-কায়দায় পড়ে গেছে গুগি শিবির। আমাদের ছেলে-মেয়েরা কল্যাণীর পক্ষ নিয়েছে। ওরা দেখতে চায়, মন্ত্র পড়ার আগেই ঘটের জলে কিছু রাখা হয়েছিল কি না? ঘটের জল ঢাললে শিকড়-টিকড় কিছু বেরিয়ে এলে এটাই প্রমাণ হবে যে—মন্ত্র শক্তিতে পেট থেকে শিকড় বের হয়নি। মন্ত্র পড়ার আগেই ঘটের জলে শিকড় বা নোংরা ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমিই হস্তক্ষেপ করলাম। আমার কথায় দু-পক্ষই কিছুটা থামলো। তবে উত্তেজনা যে সবার মধ্যেই ছড়িয়েছে, বুঝলাম। আমার কথা মতো কল্যাণী সিমেন্টের চাতালে ঘটের জল উপুড় করে দিল। আমাদের সবার অবাক হওয়ার পালা। জলের সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা শিকড়ের টুকরো ও একদলা ময়লা।

"এটা কী করে হল? আপনারা তবে কী আগে থেকেই ঘটের ভিতর শিকড় ও ময়লা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম গুগি মা'কে।

গুগি মা তো নিজের বোবা রোগ সারাতে পারেননি, তাই তাঁর হয়ে এক বোন ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ওই মেয়েটাই ও'সব ফেলেছে। আমাদের বদনাম দিতে চাইছে। ফাঁকা ঘটে রোগীরাই জল ভরে আনছে। ঘটে নোংরা ফেলার সুযোগ কোথায় আমাদের?

কথাগুলো উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কথায় দম আছে। সত্যি-ই সুযোগ কোথায় ওই জল আনার পর ঘট স্পর্শ করছেন মাত্র একজন। গুগি মা। তাহলে তাঁকেই ও'সব ফেলতে হয়। আমি কড়া নজর রেখেছি। তার মধ্যেই কী গুগি মার হাতের কৌশল আমার নজরকে বারবার ফাঁকি দিয়েছেন? তত্ত্বগতভাবে যদি ধরে নিই যে, প্রতিবারই আমার নজরকে ফাঁকি দিয়েছেন, তবু প্রশ্ন থেকে যায়। তিনি এ'সব শিকড়-নোংরা কোথা থেকে হাতে নিচ্ছেন? পরনে শাড়ি ব্লাউজ। কোমরের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখেননি। আমি নিশ্চিত। কারণ তাহলে তাঁকে কোমরে মাঝে মাঝেই হাত নিয়ে যেতে হবে। না, তা তিনি নিয়ে যাননি। অতএব? অন্তত আরও একটিবার গোটা ব্যাপারটা দেখার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলাম। "আমরা এই মুহূর্তে এক বিতর্কের মুখোমুখি। তোমার নাম কী?" জিজ্ঞেস করলাম কল্যাণীকে।

"কল্যাণী"।

আবার ক্যামেরার দিকে ঘুরলাম। কল্যাণী দাবি করছে, শিকড় ও ময়লা আগে থেকেই ঘটে ছিল। আমরা দেখেছি, গুগি মা মন্ত্র শুরু করার আগেই কল্যাণী জানিয়েছে—ঘটে কিছু আছে। ঘটে জল ঢালার পর জলের সঙ্গে আমরা শিকড় ও ময়লা পড়তে দেখেছি। অর্থাৎ সত্যিই ঘটে আগে থেকেই শিকড়-ময়লা ছিল। কিন্তু কে রেখেছিল? কল্যাণী? নাকি গুগি মা? গুগি মা'র বোন আঙুল তুলেছেন কল্যাণীর দিকে। কল্যাণী সে'ভাবে সরাসরি কারও দিকে আঙুল তোলেনি। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে, গুগি মা বা তার পরিবারের কেউ এই কাজটি করেছেন। কল্যাণীর অভিযোগ সত্যি হলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে গুগি মা ও তাঁর পরিবারের লোকজন প্রতারণা চালিয়ে আসছেন। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের চক্করে পড়ে থাকলে আমরা কখনই সত্যতে পৌঁছতে পারব না। সত্যতে পৌঁছতে আমরা একটা কাজ করব। আরও একজন রোগীকে এখন ডেকে নেবো। তার পেট থেকে মন্ত্র পড়ে শিকড় তুলে দিলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, মেয়েটির অভিযোগ মিথ্যে। গুগি

মা সত্যি।'

জনতার দিকে তাকিয়ে হেঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কী বলেন?"

জবাবে জনা পঞ্চাশেক রোগীর প্রায় সকলেই সায় দিল। লাইনে এখন যিনি প্রথমে দাঁড়িয়ে তাঁকেই ডেকে নিলাম। মধ্যবয়স্কা রোগিণী এগিয়ে এলেন চাতালের কাছে। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ। জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কী?"

—"ফতেমা বিবি।'

—"থাকেন কোথায়?"

—"লক্ষ্মীকান্তপুরে।"

—"কী অসুখ?"

—"বুক জ্বালা করে।"

—"ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

—"না।"

—"কার সঙ্গে এলেন?"

"মেজ ছেলের সঙ্গে।"

"ওর হাতে একটা ঘট দাও বোন।' গুগি মা'র বোনকে বললাম। মন্দিরের ভিতর থেকে একা ঘট এগিয়ে দিল একটি মেয়ে। গুগি মা'র ভাই ঘটটা রোগিণীর হাতে তুলে দিল।

রোগিণীকে বললাম, 'ঘটটা একটু দেবেন বোন, দেখবো।"

গুগি মা'র বোন চিৎকার করে উঠলো, "দেখুন, ভালো করে দেখুন।

বললাম, "তুমি একটুও রাগবে না। রাগ দেখালে লোকে ভাববে—বুজরুকি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে রাগ করছো। আমি ঘটের ভিতরটা দেখলে তোমাদের উপরই লোকের বিশ্বাস বাড়বে।"

ঘটের ভিতর নজর দিলাম। ঘটটা উপুড় করলাম। কিছুই নেই। এ'বার সবার দৃষ্টির সামনে আমার ডান হাতের তালুর দিকটা মেলে ধরলাম। আঙুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিলাম। বোঝাতে চাইলাম হাতে কিছুই লুকিয়ে রাখিনি। তালুর দিকটা এবার ফেরালাম আমার দিকে। জনতা বুঝে গেছেন আমি কী বোঝাতে চাইছি।

কয়েকজন চেঁচালো—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

এ'বার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলটি ঘটের ভিতরের দিকে ঘাড়ের কাছে ঘোরাতেই, আঙুলের ডগায় আঠালো কী যে একটা ঠেকলো। সামান্য চেষ্টাতেই সেটা বেরিয়ে এলো আঙুলের ডগায়। কালো রং-এর ছোট্ট একটা মাখা আটার দলা। সঙ্গে একটা শিকড়। ক্যামেরা আর একগাদা উৎসুক মানুষের নজর এ'দিকে। হাত তুলে দেখালাম। বললাম, 'এই মাখা আটার টুকরো দিয়ে ঘটের ভিতরে চেপে বসান ছিল শিকড়টা। ঘটের ভিতরে গলার নীচে আটকে রাখায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘটটা পেটে বসাবার সময় গুগি মা'র একটা আঙুল আটার দলাটা

খুলে দিচ্ছিল। ফলে শিকড় ও কালো ময়লা আটার দলা জলে পড়ে যাচ্ছিল। এ'বার আমরা দেখবো, অন্য ঘটগুলোতেও একই রকম কারচুপি করা আছে কি না?"

আমার কথা শেষ হতেই ফান্টা ক্যামেরা কাঁধে এক লাফে বারান্দায়। আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পরেছি। মন্দিরের চাতালে উঠে পড়তে শুরু করেছে রোগী, পড়শি ও যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা। চার-পাঁচটা ঘট বের করে জনতা আর ক্যামেরার সামনে রাখলাম। একে একে প্রতিটি ঘটে আঙুল ঢোকালাম। প্রতিটি ঘট থেকেই বের হলো কালো আটার দলায় আটকানো শিকড়। মন্দিরের ভিতর কালো রং মিশিয়ে টাটকা মাখা আটাও মিললো একটা রেকাবিতে।

গুগি মা'র বিরুদ্ধে জনতার তীব্র ক্ষোভ সামাল দিতে হল আমাদেরই। নইলে গণপ্রহারে হত্যার হ্যাঁপা সামলাতে হত আমাদের।

পরিশেষে বাড়ছি আমরাই

সবজান্তা মধ্যবিত্ত-মানসিকতার লোকগুলোর অস্বীকৃতিকে একটুও পাত্তা না দিয়ে আমরা যুক্তিবাদীরা সংখ্যায় বাড়ছি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে বাড়ছি। আঠেরো-কুড়ি বছর আগে বিশ্বে যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী-নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা ছিল শতকরা দু'ভাগেরও কম। আজ আমরা শতকরা কুড়ি ভাগেরই বেশি। খ্রিস্টান ও মুসলিমদের পরেই আমরা সংখ্যাধিক্য। হিন্দুদের চেয়েও আমরা সংখ্যায় বেশি।

সবজান্তারা মানুক বা না মানুক এ'কথা মানে 'ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক, '২০০২' যাকে মান্যতা দেয় ইউ এন ও' থেকে 'মনোরমা ইয়ারবুক'।

শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়ছি, বাড়বো।

ওঝার ঝাড়-ফুঁক আর টেরিজার লকেটে মণিকার রোগমুক্তি ঃ কুসংস্কারের দু'পিঠ

হার মানলেন পোপ

পোপ চেয়েছিলেন মাদার টেরিজাকে ১৯ অক্টোবর ২০০৩-এ সরাসরি 'সেন্ট টেরিজা' হিসেবে ঘোষণা করতে। কিন্তু পারলেন না। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান ধর্মগুরুর সর্বাত্মক চেষ্টা ও একান্ত ইচ্ছে-আগুনে জল ঢেলে দিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

ক্যাথলিকদের কাছে জীবিত অবস্থায় কেউই সাধু, সন্ত বা সেন্ট নন। মৃত্যুর পরে কতকগুলো পদক্ষেপের শেষে পোপ অনেক কিছু দেখে-শুনে কাউকে 'সেন্ট' উপাধি দিলে তবেই তিনি 'সেন্ট' বলে পরিচিত হবেন।

সেন্ট হওয়ার পূর্ব পদক্ষেপগুলো এইরকম

* 'ক্যানান ল' বা ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অনুশাসন অনুযায়ী 'ব্রেসেড' বা 'ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা' ঘোষণার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হবে প্রার্থীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে।

* স্থানীয় বিশপরা প্রার্থীর জীবনচর্চা বিষয়ে অনুসন্ধান করে তাঁদের মতামত পোপের কাছে পাঠাবেন।

* 'ভ্যাটিকান' বা পোপের শাসনকর্তৃত্বের পরিকাঠামো এই মতামত পাঠাবে প্যানেলভুক্ত ক্যার্ডিনালদের (রোমান ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ পদাধিকারীধর্মযাজক-গোষ্ঠী) কাছে। তারা এই মতামত গ্রহণ করলে মৃত প্রার্থীরা নামের আগে 'ভেনারেবল' বা 'সার্ভেন্ট অফ গড' উপাধি ব্যবহারের জন্য প্রদান করবেন পোপ।

* পরবর্তী পদক্ষেপ 'বিয়েটিফিকেশন' বা স্বর্গীয় মহিমা প্রদান অনুষ্ঠান। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে গেলে লাগবে প্রার্থীর অলৌকিক ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ। এখানেও

আবার বিশেষত্ব আছে। প্রার্থীর মৃত্যুর পর তাঁর অমর আত্মাকে ঘটাতে হবে কোনও একটি অলৌকিক ঘটনা।

এরপর আসে 'সেন্ট' উপাধি দানের সর্বশেষ পর্যায়। এর জন্য দরকার হয় আত্মার আরও একটি অলৌকিক ক্ষমতার খাঁটি প্রমাণ।

(CNN. com–mother Teresa on road to santhood–Oct 1.2000 থেকে 'Steps to sainthood' অংশ অনুবাদ করা হল।)

'সেন্ট' হওয়ার এই যে রীতি, এ'হল 'ক্যানান ল'-এর অংশ। মাদার টেরিজার বেলায় 'ক্যানান ল' ভাঙলেন স্বয়ং পোপ দ্বিতীয় জন পল। টেরিজার মৃত্যুর (১৯৯৭) দু'বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তাঁকে 'সেন্ট' টেরিজা করার প্রস্তুতি। অথচ 'ক্যানান ল' অনুসারে এই প্রস্তুতিটুকু শুরু করার জন্যেই অপেক্ষা করা উচিত ছিল আরও তিন তিনটি বছর। কেন এই তাড়াহুড়ো? কেন এই আইন ভাঙার খেলা? পোপের সময় কী ফুরিয়ে যাচ্ছে? জীবনদীপ নিভুনিভু, তাই 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বলে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়া?

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'র সুপিরিয়র জেনারেল নির্মলাও মাদারকে পণ্য করে নেমে পড়লেন আখের গোছাতে। মাদারকে সেন্ট বানাতে দরকার একটা মিরাকেলের, একজন রোগীর। রোগীটি শুধু বলবে, আমার কঠিন অসুখ সেরেছে মাদারের অলৌকিক কৃপায়। খুঁজে-পেতে পাওয়া গেল একজন অজ পাড়া-গাঁ'র সাঁওতাল গৃহবধূ। কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। সোনার দামে তাকে কিনে নিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে হাজির করা হল। নাম—মণিকা বেসরা। একজন ডাক্তারের নামও শোনা গেল। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য। তিনি দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, মণিকার পেটে টিউমার হয়েছিল। যে টিউমারটা আসলে ক্যানসার। আধুনিক চিকিৎসায় এ ক্যানসার সারানো অসম্ভব ব্যাপার। আর এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে মাদারের মিরাকেলে। ১৯৯৮-এর ৫ সেপ্টেম্বর মাদারের জন্ম-তিথিতে মাদারের ছবি থেকে একটা জ্যোতি এসে মণিকার টিউমারে পড়তেই মুহূর্তে টিউমার ভ্যানিস।

এবার দরকার স্থানীয় বিশপের তদন্ত রিপোর্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার 'ক্যাথলিক ডায়োসেস অফ বারুইপুর'-এর বিশপ সালভাদোর লোবো'র নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি তৈরি হল। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করল, চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর মণিকা মাদারের মিরাকেলে রোগ মুক্ত হয়েছেন। মণিকার চিকিৎসকদের মতামতকে একটুও পাত্তা না দিয়ে কী সত্য প্রতিষ্ঠা করলো তদন্ত কমিটি? ধর্মব্যবসায়ীরা অসাধু হয়—এই সত্য?

বিশপের মিথ্যে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট নিয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আবেদন জানাল ভ্যাটিকানের কাছে, বিয়েটিফিকেশনের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে মাদার টেরিজাকে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা করা হোক।

ব্যাপারটা আবেদন অনুসারে হওয়ার সব আয়োজনই ছিল। কিন্তু বিষম রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াল যুক্তিবাদী সমিতি। পরে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এখন আসুন লাইনচ্যুত না হয়ে আলোচনা চালিয়ে যাই।

তোমার কর্ম তুমি কর....লোকে বলে করি আমি

পোপের ইচ্ছে-সুতোয় মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নেচে ছিল কি না, এ'বিষয়ে নিশ্চিভাবে বলার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, এ'কথা জজও মানেন। আমরা প্রাসঙ্গিক পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি কি না আসুন দেখি।



(১) ১৯ অক্টোবর, ২০০৩, ছিল পোপ দ্বিতীয় জন পলের অভিষেকের ২৫ বছর পূর্তির দিন। পোপ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দিতে চেয়েছিলেন এই দিনটিতেই। তাঁর এই ইচ্ছা-পূরণে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, লক্ষ্যে পৌঁছতে 'ক্যানান ল' অগ্রাহ্য করা, ছল গ্রহণ করা—কোনও কিছুতেই পিছ-পা ছিলেন না। আরও কিছু তথ্য এ লেখায় আসবে, যা পড়ার পর আশা

রাখি আপনিও এ' বিষয়ে সহমত পোষণ করবেন।

(২) মণিকা বেসরার টিউমার যে দুরারোগ্য ক্যানসার ছিল না, এটা পোপ জানতেন। ক্যানসারের বায়পসি রিপোর্ট পোপের কাছে ছিল না। থাকলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে কখনই চুপ করে কিল হজম করতেন না। রিপোর্ট হাজির করতেন-ই।

(৩) ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য-ই একমাত্র ডাক্তার, যিনি দাবি করেছিলেন, মণিকার ক্যানসার মাদারের অলৌকিক ক্ষমতায় রাতারাতি সেরে গেছে। এরপর প্রত্যাশিত ছিল যে, ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা ডাক্তার ভট্টাচার্যকে বারবার প্রচার মাধ্যমের সামনে হাজির করবে। বাস্তবে হল উলটোটা। ডাঃ ভট্টাচার্য কোনও এক রহস্যময় কারণে ভ্যানিস হয়ে গেলেন। কোনও প্রচার-মাধ্যমই তাঁর খোঁজ পেল না। কেন তাঁকে লুকিয়ে ফেলা হল? মিথ্যে ফাঁস হওয়ার ভয়ে? বিয়েটিফিকেশনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মণিকা ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না ডাঃ ভট্টাচার্য। অবাক করার মতো ব্যাপার। যাঁর সার্টিফিকেটের জোরে আজকের এই অনুষ্ঠান তিনি-ই নেই!

(৪) ভ্যাটিকান একটি দলকে পাঠিয়েছিল মণিকার আরোগ্য নিয়ে সত্যানুসন্ধানের জন্য। অসুস্থ মণিকার চিকিৎসকদের মতামত তাঁরা কেন গ্রহণ করলেন না? চিকিৎসকদের বক্তব্য, মণিকার কোনও ক্যানসার ছিলই না। হয়েছিল যক্ষ্মা। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পেটে টিউমার হয়েছিল। ওষুধ খেয়েছে। ন'মাসে পাঁচ রকম ওষুধের কোর্স নিয়েছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়েছে। যক্ষ্মা সারাতে, টিউমারও সেরেছে। এরমধ্যে অলৌকিক গপ্পের কোনও স্থান নেই।

মণিকার চিকিৎসকদের এমন মতামত গ্রহণ করলে মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার প্রক্রিয়াই যে থম্‌কে যায়। আবার নতুন করে খোঁজা-খুঁজি শুরু করলে বোধহয় বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। পোপের অভিষেকের রজতজয়ন্তীতে তো 'সেন্ট' দেওয়া হবেই না। পোপের জীবিতকালে হবে এমন সম্ভাবনাও কম।

মণিকার চিকিৎসা হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফ থেকে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। চাপ দিয়ে বলাবার চেষ্টা হয়েছিল—চিকিৎসায় মণিকার অসুখ সারেনি। অসুখ সেরেছে মাদারের ছবির মিরাকেলে।

ডাঃ মুর্শেদের এই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যে 'খোঁজ-খবর' নামের অনুসন্ধান-মূলক জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে দেখান হয়েছে।

ডাঃ মুর্শেদ আমাকে এও জানিয়েছেন, ভ্যাটিকানের প্রতিনিধিকে নিয়ে কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার এক সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁদের তরফ থেকেও নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মণিকার চিকিৎসকদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া, মণিকা সুস্থ হয়েছেন মাদার টেরিজার ছবির অলৌকিক ক্ষমতায়।

একজনকে 'সাধু' বানাবার এমন অসাধু প্রচেষ্টা বিশ্বের কাছে বেফাঁস হলে বিতর্কের ঝড় উঠতে বাধ্য। প্রত্যাশা মতোই সেই ভয়ংকর ঝড় উঠেছিল। তাইতেই হাইটেক সাজানো পরিকল্পনা তছনছ। এ'কথা তো ভুললে চলবে না, "সত্য ততটাই প্রকাশিত হয়, যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই।" আমাদের আমজনতার সক্রিয় উদ্যোগ, আমাদের নির্লোভ সাহস এবং মেধাও বহুক্ষেত্রে হার মানে বলেই অনেক সত্য চাপা পড়ে যায় মিথ্যের ভারী অন্ধকারে।

(৫) ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি কেন মণিকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললেন না? বললে জানতে পারতেন, মণিকার পেটের টিউমার রাতারাতি ভ্যানিস হওয়ার গপ্পোটা নেহাতই গপ্পো। নাকি কথা বলেছিলেন, কিন্তু মনপসন্দ না হওয়ায় চেপে গেছেন? ভ্যাটিকানের স্বার্থ-বিরোধী কথা বলেই চেপে গেছেন?

পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'মিরাকেল' হাজির করার সময় বাংলার যুক্তিবাদীদের আন্ডার এস্টিমেট করেছিলেন ওঁরা। লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর' থেকে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর দীর্ঘ পরিক্রমায় আমাদের কিন্তু গ্যালিভার হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। তারপরও আমাদের বিরুদ্ধে ওদের অতি আত্মতুষ্টির কারণ নিশ্চয়ই আছে। পশ্চিমী শক্তির মনে হতেই পারে, সাম্যের স্বপ্ন দেখা দেশগুলোকেই স্রেফ মগজ খাটিয়ে ধসিয়ে দিলাম, যুক্তিবাদী সমিতি সেই তুলনায় নেহাতই 'হরিদাস পাল'।

ভ্যাটিকানের সত্যানুসন্ধানীরা যাঁদের এড়িয়ে গেছেন, আমরা তাঁদের কথাই ক্যামেরা বন্দি করেছি। মণিকার প্রতিবেশীদের সে'সব কথা দেখেছেন-শুনেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেখানো হয়েছে 'খোঁজ-খবর' অনুষ্ঠানে।

ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি সম্ভবত শুধু এই সত্যটুকু জেনে উৎসাহিত হয়ে এসেছিলেন যে, ভারত দুর্নীতিতে প্রথম সারির দেশ। এটা জেনে আসেননি, সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও রুখে দাঁড়াবার মতো সোজা-মেরুদণ্ডী ও জয় ছিনিয়ে আনার মতো উচ্চ-মেধার মানুষ এ'দেশে এখনও আছেন।

(৬) পোপ যখন মাদার টেরিজার ছবির অলৌকিক বিকিরণে মুগ্ধ ও প্রত্যয়ী, তখন পোপ কেন মাদারের ছবি লকেট করে গলায় ঝুলিয়ে নিজেকে সুস্থ করে তুলছেন না? তাহলে তো যারা তাঁর ও মিশনারিজ-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে, তাদের মুখের মতো জবাব দেওয়া যেত! পাশাপাশি আরও একটা কাজ হয়ে যেত—দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা খোঁজার আর দরকারই হত না। দুনিয়ার নিরীশ্বরবাদীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে খ্রিস্টধর্মের জয়ধ্বজা ওড়াবার এমন সুযোগ কেন হারালেন? একে কী বলব—ভ্যাটিকনের বোকামি? নাকি ভ্যাটিকানের ধূর্ততা?

আমরা টিভিতে দেখলাম অসুস্থ পোপকে। হাঁটতে পারেন না। কথা বলতে পারেন না। জবুথবু অসহায় মানুষটিকে দেখে অনেকেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। অনেকেরই মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছে—মাদারের ছবিওয়ালা লকেট পরে পোপ

কেন তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে নিচ্ছেন না? পোপ কী তবে জানেন, এ'ভাবে রোগ মুক্তি অসম্ভব? নামের মোহে, ক্ষমতার লোভে জেনে বুঝেই কী পোপ মানুষদের প্রতারিত করলেন?

(৭) "প্রথম সহস্রাব্দে ইউরোপ জয় করেছি। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আমেরিকা। তৃতীয় সহস্রাব্দে জয় করব এশিয়া।"—এ পোপের-ই কথা। এশিয়া জয়ের প্রথম ধাপ হিসেবেই কী ভারতীয় মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানানোটা জরুরি ছিল? ১১০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতের বিশাল বাজার ধরতে ভারতীয় নারীদের বিশ্বসুন্দরী বানাবার খেলায় নেমেছে বহুজাতিক প্রসাধনী সংস্থাগুলো। পানীয় থেকে গাড়ি উৎপাদনকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের পণ্যের ভারতীয় বাজার ধরতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মডেল বেছেছে। ফলে ক্রিকেট র‍্যাংকিং-এ সাত নম্বর দেশ ভারতের ক্রিকেটাররা রোজগারে এক নম্বর। প্রচারের দৌলতে ভারতীয়রা ক্রিকেট খাচ্ছে ভালো। কোক-পেপসি থেকে ফোর্ড সব্বাই বাজার পাচ্ছে ভালো। ভারতের বাজারে খ্রিস্টধর্ম বিক্রি করতে মাদার টেরিজাকে আদর্শ মডেল জেনে তাঁকে সেন্ট বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতেই পারে। টেরিজার চেয়ে আদর্শ ভারতীয় খ্রিস্টান মডেল আর একজনও নেই।

অতএব, টেরিজার সঙ্গে অলৌকিক রোগ আরোগ্যের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে।

দুঃখের কথা, টেরিজা কোনও দিন এসব হিজিবিজি অলৌকিক চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন না। নিজের অসুখ হলে বারবারই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। জীবিতকালে কাউকে ঝাঁড়-ফুঁক করে, অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার দাবি করেননি।

সেই মাদার টেরিজাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী বলে চালাবার নোংরা চেষ্টায় নামলেন পোপ, নামলো ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা মুসলিমদের প্রায় দু'গুণ, হিন্দুদের আড়াই গুণ, (তথ্য সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক, ২০০২ এবং মনোরমা ইয়ারবুক, ২০০৩)। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশগুলোই অর্থে ও অস্ত্রে আর সবার চেয়ে বড় বেশি রকম এগিয়ে। ওরা চায় পৃথিবীর সব্বাইকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ছাড়তে। তেমনটা হলে খ্রিস্টান ভ্রাতৃত্ববোধে সুড়সুড়ি দিয়ে সব বেয়াদপদের পায়ের তলায় রাখা যাবে। এখনও কিছু বেয়াদপ সাম্যের স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ভ্রাতৃত্ববোধের আহ্বানই যথেষ্ট। এরচেয়ে বড় অহিংস প্রতিবিপ্লবী অস্ত্র আর

নেই। এই চিন্তা থেকেই পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টানধর্মীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা আমেরিকার মস্তিষ্কপ্রসূত অসাধারণ কার্যকর অহিংস অস্ত্র 'ব্রেনওয়ার' বা 'মস্তিষ্কযুদ্ধ'-এর অঙ্গ।

'ব্রেনওয়ার' বা মস্তিষ্কযুদ্ধেরই পরিকল্পনা অনুসারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অঢেল অর্থসাহায্য দিয়ে দিকে দিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এটা জেনেই গড়ে তোলা হয়েছে যে, সংস্থাগুলোর পালের গোদারা সাহায্যের বড় অংশটাই চুরি করে নিজেদের পেট ভরাবে। 'তা ভরাক, তবু আমাদের উদ্দেশ্য তো সফল হবে'—এই ভেবেই সাহায্যকারীরা চুপ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ধনী দেশগুলোর 'দালাল' হিসাবে নানা তথ্য জোগাবে, গোয়েন্দাগিরি করবে, প্রয়োজনে নির্দেশ পালন করবে।

মস্তিষ্কযুদ্ধের পরিকল্পনারই অঙ্গ পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টধর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে মিশনারিজদের পাঠানো, তাদের পালন ও বৃদ্ধি ঘটানো। এ'জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার, স্টার্লিং পাউন্ড ও ইউরো আসছে মিশনারিজদের হাতে। তবে এ'সব সাহায্য সাধারণত সোজাসুজি আসে না। আসে একটু ঘুর পথে।

ভারতে কী ভাবে সাহায্য আসছে, একটু ফিরে দেখি আসুন। এ'থেকেই বিশ্বের চিত্রটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হবে না। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের দেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠানে দান হিসেবে আসছে গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তেল, গম ইত্যাদি নানা ভোজ্যসামগ্রী। এইসব সামগ্রী খোলা বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দেয় মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো। বিনিময়ে পায় ভারতীয় টাকা। বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল দিয়ে এরা শুরু করে। দু-চার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে গড়ে তোলে ফার্ম-হাউস, স্কুল, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চার্চ অফিস ঘর ইত্যাদি।

ভারতে শিকড় গাড়া চার্চ ও মিশনগুলো কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে না। তবে খ্রিস্টধর্ম নিলে বিনে পয়সায় রেশন মেলে, চিকিৎসা মেলে, শিক্ষা মেলে, হাতের কাজ শেখা যায়, এমন কী কাজও মেলে।

ফলে ধর্মান্তরের রাজনীতি চার্চ ও মিশনগুলো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা নিঃস্বার্থ সেবার ব্রত নিয়ে আসেনি। ওদের নীতি, 'এক হাতে নাও, এক হাতে দাও'। সেবা বিলোবার মতোই যিশুর মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারটাও গৌণ। মুখ্য হল—বিশ্ব জুড়ে খ্রিস্টধর্মীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি। খ্রিস্টধর্মীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। ধর্মীয় শ্রেণি চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই শ্রেণি চেতনাই ধর্ম-

ভাইদের স্বার্থ দেখবে।

একটি উদাহরণ আনলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৮৪ সালে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ভারতের সর্বকালের ভয়ংকরতম দুর্ঘটনা। মারা গেলেন ১৬ হাজারের বেশি মানুষ। শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেলেন ৫ লক্ষের বেশি মানুষ। এই বিপর্যয়ে মানবতার পূজারী চার্চ ও মিশনারিজরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে, ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াননি। তাঁদের এই নীরবতাই প্রমাণ করে দিল, খ্রিস্টধর্মীয় মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো হাঁটুর জোর নেই। পরিকল্পনার রূপকারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

এ'সবের পরে মনে হতেই পারে ভারতের মতো বিশাল জনসমষ্টির দেশে ধর্মান্তরের জোয়ার আনতেই মাদার টেরিজাকে পণ্য করা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের পক্ষে হুজুগের ঝড় তুলতেই মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার ষড়যন্ত্র। আর এই মনে হওয়ার পিছনে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে।

(৮) ভ্যাটিকানের ইচ্ছেয় প্রায় দু-হাজার সাল পর্যন্ত সূর্য চক্কর কেটেছে পৃথিবীকে। ভ্যাটিকানের সুতোর টানে নাচে অনেক নট-নটী। ভ্যাটিকানরূপী খ্রিস্টধর্মকে নিজেদের স্বার্থে বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চিমী ধনকুবের গোষ্ঠী। পৃথিবী জুড়ে শোষণ প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখতেই খ্রিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনে ভ্যাটিকানের রমরমা বেড়েই চলেছে। তবে কতদিন চলবে, কবে ভাঙবে, সময় বলে দেবে। পশ্চিমী ধনকুবেররা শুধু চার্চ, মিশনারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উপর ভরসা করে নেই। তারা বিপুল অর্থের জাল ছড়িয়ে 'বন্ধু' গড়ে তোলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, প্রচার মাধ্যমের নামীদামি সাংবাদিক, রাজনীতিকদের সঙ্গে প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন এবং পরবর্তীতে 'দিবে ও নিবে' মার্কা একটা পেশাদারী সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। তারই ফলে যখন কোক-পেপসির বিরুদ্ধে জেহাদের দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠেছিল ভারতে, তখন সে আগুনে জল ঢালার কাজে ওরা নামাতে পেরেছিল 'বন্ধু' সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের। এই বন্ধুদেরই কেউ কেউ 'সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে'।

ছাপা-চাপার আলো আঁধার

২০০২-এর অক্টোবরে প্রাথমিক আঘাতের তীব্রতায় কেঁপে উঠেছিল ভ্যাটিকান। ভ্যাটিকান যেই মণিকার গপ্পো বাজারে ছাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতি ভ্যাটিকানের বুজরুকি ফাঁস করল তথ্য-প্রমাণ হাজির করে। বিশ্বের তামাম বিখ্যাত মিডিয়া যুক্তিবাদী সমিতির তুলে ধরা তথ্য-প্রমাণ এতটাই গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করলো, যা কল্পনার অতীত। রয়াটার, এ এফ পি, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, পি টি আই, ইউ এন আই-এর মতো সংবাদ বিক্রিকারী সংস্থাগুলো মারফত পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিও আমাদের সত্য উন্মোচনের খবর জানল ও প্রচার করল। প্রচারিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাই কয়েক লক্ষ। ভ্যাটিকানের কাছে, পশ্চিমীদের কাছে এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। মস্তিষ্ক যুদ্ধের শুরুর কাল থেকে জয়ের পর জয়-ই শুধু এসেছে। এ পরাজয় কখনই মানা যায় না। এ'তো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে খালে এসে ডোবা?

ফলে অবশ্যই তৈরি হল একটা 'মাস্টার প্ল্যান'। আমাদের বিরুদ্ধে পালটা বৌদ্ধিক আক্রমণ শুরু হল। আক্রমণ বিশ্লেষণ করে বুঝতে অসুবিধা হল না পরিকল্পনার চরিত্র। যুক্তিবাদী সমিতির কাজকর্ম যতই প্রভাব সৃষ্টিকারী হোক না কেন, শিকড় কলকাতায়। অতএব কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলো যদি যুক্তিবাদী সমিতিকে টেরিজা ইস্যুতে 'ব্ল্যাক আউট' করে, তবে মানুষ ওদের কথা জানতেই পারবে না। ওরা যে খাতে মানুষের ভাবনাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তা পারবে না। 'দিবে আর নিবে' মার্কা বন্ধুদের কাজে লাগাও। প্রতিটি মিডিয়ার সহযোগিতা পেতে যে কোনও মূল্যে রাজি হয়ে যাও।

সায়েবদের মাথা থেকে বেরিয়ে আসা পরিকল্পনা যে এমনটাই ছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনা তেমনই ইঙ্গিত করে। সারা বিশ্ব যখন ভ্যাটিকানের বুজরুকি ফাঁস নিয়ে তুমুল ভাবে আলোড়িত, যুক্তিবাদী সমিতির ক্রেজ তুঙ্গে, তখন কলকাতার পত্র-পত্রিকা বদ্ধ জলাশয়ের মতই নিস্তরঙ্গ। ব্যতিক্রমী দু-একটি পত্রিকা ছাড়া সবাই তখন 'ছাপা ও চাপা'র খেলায় ব্যস্ত।

৮ অক্টোবর ২০০৩। এক নম্বর বাংলা দৈনিকের এগারো নম্বর পৃষ্ঠায় একটি খবর প্রকাশিত হল। প্রায় এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা জোড়া খবর, 'সন্তের সরণীতে টেরিজা ঃ ব্রিটিশ ক্যামেরায়'। বড়-সড় একটা ফোটোগ্রাফও ছাপা হয়েছে সঙ্গে। ছবির তলায় শিরোনাম, 'কলকাতায় 'মেকিং অফ এ মডার্ন সেন্ট'-এর শুটিং। ক্যামেরার লুক-থ্রু করছেন পরিচালক ডেভিড মেলোন।' শুটিং চলছিল আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির একটি পথ সভায়। পূর্ব কলকাতার রাসমণি বাজারে পথসভা করেছিলাম, মাদারকে যেভাবে সেন্ট বানাবার নামে প্রহসন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে। সেই পথসভার ছবি ছাপা হয়েছে।

সেদিন শুটিং চলাকালীন প্রচুর ছবি তুলেছিলেন পত্রিকার আলোকচিত্রী। গোটা খবরে কোথাও উল্লেখ নেই—কাদের নিয়ে শুটিং হচ্ছিল। কেন নেই? ভুল? নাকি ব্ল্যাক আউট?

পরিচালক ডেভিড মেলোন পথসভার আগে আমারই ফ্ল্যাটে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। ডকুমেন্টারিতে তার অত্যন্ত গুরুত্ব থাকলেও পত্রিকাটির প্রকাশিত খবরে তার কোনও উল্লেখ ছিল না। এখানেও কী সেই ব্ল্যাক আউট?

বিষয়টা আমার বা যুক্তিবাদী সমিতির স্বার্থের সঙ্গে শুধু জড়িয়ে নেই। বিষয়টা নীতির। জানি, একটা পত্রিকায় কী ছাপা হবে, কী চাপা হবে তা ঠিক করার আইনি

অধিকার পত্রিকা মালিকের বা মালিকের ঠিক করে দেওয়া কর্মচারীর। পত্রিকার পাঠক হিসেবে আমরা ততটুকুই জানতে পারি, যতটা পত্রিকা আমাদের জানায়। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা তাদের ছাপা ও চাপা ক্ষমতাকে জায়গা মতো বিক্রি করে। আমাদের ব্ল্যাক আউট করার আইনি অধিকার এক নম্বর পত্রিকাটির আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—বিষয়টা নৈতিক ছিল কী? নাকি এ হল বিজ্ঞাপনদাতা জ্যোতিষী-তান্ত্রিক রেইকি বিশারদ ও ফেংশুই বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে আমাদের পিছনে লাগার বদলা? নাকি এ সেই বাঙালি কাঁকড়ার পুরনো গল্প— যে উঠছে, তাকে টেনে নামাও। অথবা পত্রিকাগোষ্ঠীর সুরে সুর না মেলানো, কালো কে 'কালো,' সাদাকে 'সাদা' বলা মানুষটির 'ঔদ্ধত্য' আহত করেছে কোনও পত্রিকার ইগোকে—এ তারই প্রতিফলন?

ব্ল্যাক আউট করার কারণ এক বা একাধিক হতে পারে, তবে কারণ ছিল।

আমাদের ব্ল্যাকআউট করার ঠিক কারণটা কী? জানি না। তবে এটা জানি—এইসব পত্রিকা পড়ে অনেক কিছুই শেখা যায়। শেখা যায়— লজ্জার মাথা খেয়ে কীভাবে খবর চাপতে হয়। ছাপা ও চাপার রাজনীতি শিখতে এ'সব পত্রিকা পড়তেই হয়, নতুবা পিছিয়ে পড়তে হয়।

উদাহরণ একটা টেনেছি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রায় সকলেই আমাদের অনন্য এই লড়াইয়ের খবর চাপার ব্যাপারে একই রকমের ভূমিকা পালন করেছে। এ'দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য মিডিয়া যখন আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার করে ভ্যাটিকানের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কলকাত্তাইয়া পত্র-পত্রিকার ভূমিকা বিস্ময়জনক। এই বিস্ময় চেপে রাখেননি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মনেও নানা প্রশ্ন— খেলাটা কী? কে খেলাচ্ছে? গন্ধটা সন্দেহজনক? ইত্যাদি।

সত্য ততটাই এগোয়, যতটা এগিয়ে নিয়ে যাই

'যো জিতা ওহি সিকন্দর।' এত কিছুর পরেও আমরা জিতেছি। যুক্তিবাদী সমিতি জিতেছে। যুক্তিবাদী মানুষরা জিতেছে। এদেশের ও বিদেশের সৎ সাংবাদিকদের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। কলকাতা যখন ব্ল্যাক আউটের জ্বরে কাঁপছে, তখন ভ্যাটিকানে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে বিশ্বের তাবড় সংবাদ সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমগুলো। এই অনন্য জয়ে তাদের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য হাজারো কুর্নিশ জানাই। কুর্নিশ জানাই এইসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের যাঁদের বন্ধুত্ব, উপদেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এ'জয় সম্ভব ছিল না। এঁদের সম্মিলিত সহযোগিতার ফলেই কলকাতার আট-দশটা পত্রিকা যখন আমাদের বয়কট করে চলেছে, তখন পৃথিবী জুড়ে কয়েক লক্ষ পত্রিকায় আমরা জ্বল-জ্বল করছি। ওয়েবসাইট খুলে 'মাদার টেরিজা' বা 'র‍্যাশনালিস্ট প্রবীর'

টিপলেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া খবর। যুক্তিবাদীদের উদ্দীপ্ত করার মতো খবর।

১৯ অক্টোবর ২০০৩। এই দিন টেরিজাকে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা করা হবে, সব ঠিকঠাক। 'বিয়েটিফিকেশন' বা 'স্বর্গীয় মহিমা প্রদান' অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে সরাসরি 'সেন্ট' বা 'সন্ত' ঘোষণা করা হবে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই মতো ব্যাপক বর্ণময় পরিকল্পনা গ্রহণ করল ভ্যাটিকান। টেরিজার ছবি সহ বৈচিত্রময় নানা স্মারকের আয়োজন ছিল। ছিল দুনিয়া জুড়ে বিশাল প্রচার। এই প্রত্যয়ী প্রচারকে যে দ্রুততার সঙ্গে তুঙ্গে নিয়ে গেল, তা শুধু ভ্যাটিকানকেই মানায়। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা খ্রিস্টধর্মীয়দের একমাত্র ধর্মগুরু পোপ। জনসংখ্যা বিচারে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এই অবস্থায় বর্তমান পোপের ক্ষমতা পূর্বসূরিদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তো তিনিই পারেন ইচ্ছে মতো খ্রিস্টধর্মের অচলায়তন 'ক্যানান ল'কে খেয়াল খুশিতে ভাঙতে। **মাদার টেরিজার জীবিতকালের সব ভালো কাজকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিলেন পোপ। টেরিজা যখন ছবি হয়ে গেলেন, তখন ছবি নিয়ে অসত্য অলৌকিকের গল্প চালাতে চাইছেন পোপ।** প্রতিবাদ প্রত্যাশিত ছিল প্রোটেস্টান্টদের কাছ থেকে। ওদের কাছ থেকে তেমন প্রতিবাদ এল না বলে হয়তো অনেকেই অবাক। কিন্তু সবাই নন, যাঁরা জানেন, খ্রিস্টসমাজে ব্রাত্য প্রোটেস্টান্টরা যখন কোণঠাসা, তখন এই পোপই তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছেন। ফলে অতিমাত্রায় সংখ্যালঘু প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতায় গলে-মলে একশা। কৃতজ্ঞ মানুষগুলো এখন প্রতিবাদী হবে? পাগল?

পোপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খ্রিস্টধর্মীদের স্পর্শকাতরতা, জাত্যভিমান জন্মগতভাবে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী, কিন্তু বর্তমানে নিরীশ্বরবাদী, এমন মানুষদেরও অনেকে জাত্যাভিমানের প্রতীক হিসেবে পোপকে দেখেন। এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে পোপকে তাঁর লক্ষ্য থেকে পিছু হটতে বাধ্য করা ছিল অসম্ভবেরও কিছু বেশি।

অলৌকিক ক্ষমতার জন্য টেরিজাকে 'সেন্ট' ঘোষণা করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পোপ পারেননি। কিন্তু এই জয় তুচ্ছ হয়ে যায়, যখন দেখি **'সেন্ট' ঘোষণার সঙ্গে আলৌকিকতাকে জুড়ে দেবার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে। আর সেই জনমত গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে BBC News** (বিবিসি নিউজ) ১৮.১০.২০০৩ এর বিবিসি নিউজ/ওয়ার্ল্ড/সাউথ এশিয়ার দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী ওয়েবসাইট থেকে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার সামান্য একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"Prabir Ghosh, secretary of the Calcutta-based Indian Rationalists Association, openly questions the miracle.

"Mother Teresa was a great soul and I think it is an insult to her legacy to make her sainthood dependent on bogus miracles. It should be linked to her great work among the poor," says Mr. Ghosh.

He says Mother Teresa herself went to the best hospitals– and the best doctors– in the city when she fell ill.

Most agree with him that Mother Teresa does not need miracles to be declared a saint."

এই একই মূল সুর যুক্তিবাদী সমিতির রেখেছে বিভিন্ন সংবাদ বিক্রিকারী সংস্থা থেকে শুরু করে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, জার্মান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, টাইম, নিউইয়র্ক টাইমস, লেমন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের কাছে। মাদার গরিবদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তিনি পথশিশুকে যেমন বুকে টেনেছেন, তেমনই কুষ্ঠ রোগীর শুশ্রূষা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম রায়টে অগ্নিগর্ভ কলকাতার বস্তি এলাকায় তিনিই ছুটে গেলেন সবার আগে। তাঁর এই মমতাময়ী রূপের জন্যে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' পেয়েছেন। সেই একই কারণে তাঁকে 'সেন্ট' উপাধি দিতে অসুবিধে কোথায়? তিনি যখন ছবি হয়ে গেলেন তখন তাঁর ছবি অলৌকিক ক্ষমতা পেল, তাই তিনি 'সেন্ট' হবার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন— এমন যাঁরা বলেন, তাঁরা মাদারকে অপমান করেন, সত্যকে অপমান করেন। ভারতীয় ও কলকাতাবাসী হিসেবে আমরাও অপমানিত বোধ করি।

আমাদের দেশে আর যারই অভাব থাক, অলৌকিক বাবাজি-মাতাজিদের কোনও অভাব নেই। পত্রিকাগুলোর দু'য়ের পাতার বিজ্ঞাপন সে কথাই বলে। তারপরও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে কত লক্ষ ওঝা-গুনিন। এদের অলৌকিক শক্তির কথা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হয় না। গাঁয়ের মানুষরা মফস্সলের মানুষরা এমনিই জানেন। এরপরও রয়েছেন সাঁই, রবিশঙ্কর, নির্মলা, আম্মার মতো কয়েক হাজার হাইটেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ মোদ্দা কথা—হিন্দুদের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

এরা কেউই খ্রিস্টজগতের পোপের মতো সুসংগঠিত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে না। সব্বাই অসংগঠিত। এদের কারও পিছনেই সমস্ত হিন্দুত্ববাদীরা নেই। চার শঙ্করাচার্যের মধ্যে ক্ষমতার আঁকচা-আঁকচি, কামড়া-কামড়ি দেখার পর বুঝতে অসুবিধে হয় না লক্ষ গুরুর লক্ষ হাঁড়ি।

এইসব অসংগঠিত 'অলৌকিক ক্ষমতাধর'দের বুজরুকি ফাঁস করা অনেক সহজ। অসম্ভব রকমের কঠিন হল জাত্যভিমানী, সব কিছুতে শক্তির তুঙ্গে

অবস্থানকারী একটি সুসংগঠিত রিলিজিয়ন গোষ্ঠীর প্রতীক পোপের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয় হাসিল করা। সুসংগঠিত গোষ্ঠীর মধ্যে সরাসরি বিভাজন সৃষ্টি করা। পোপ ও ভ্যাটিকানের ওই 'ক্যানান ল'র বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা।

এরপরও পোপ আজ বাদে কাল আরও একটি সাজানো অলৌকিক ঘটনা হাজির করে টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দিতেই পারেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতারণার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আঙুল তুলবে খ্রিস্টধর্মীয়রাই। এই অবস্থা তৈরি করা গেছে।

এই যে একটা গুণগত অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে খ্রিস্টান সমাজে— এটাই যুক্তিবাদীদের সবচেয়ে বড় জয়, পোপ, আপনি বিয়েটিফিকেশনের পরও হেরে গেলেন। আপনার ভক্তরাই আপনার ফাঁকি ধরে ফেলেছেন।

এমন এক অভাবনীয় জয়ের পর বলতেই হচ্ছে, এটাই আমার জীবনের ও সমিতিকালের সবচেয়ে কঠিন ও বড় জয়।

* **বি.দ্র.** বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হয়, যদি বলি— কোনও ধর্মগুরু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওটাই সবচেয়ে বড় জয়। এভাবে বলার কারণ, যুক্তিবাদী সমিতি ও তার সিস্টার কনসার্ন। 'হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র কাজ শুধু তো অলৌকিক রহস্য উন্মোচন করা নয়, তারচেয়ে অনেক ব্যাপক। সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, মুক্তমনের লক্ষ্যে, যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার লক্ষ্যে, শোষণের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের লড়াই। আমরা এদেশে বেশ্যাবৃত্তিকে আইনি করার চেষ্টাকে রুখেছি, রিলিজিয়ান কলমে 'মানবতা' লেখার আইনি লড়াই জিতেছি, 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্র থাকবে ধর্ম বর্জিত'— আমাদের এই সংজ্ঞা ভারতের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই গ্রহণ করেছে। এমন জয় অনেক আছে। তারপরও নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের সর্বকালীন সেরা জয়—কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মত পরিবর্তনে সক্ষম হওয়া। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের কট্টর অবস্থানকে পালটে আমরাই প্রথম বললাম—কাশ্মীর কাশ্মীরিদের। ভারত-পাকিস্তান যখন ব্রিটিশ শক্তির অধীন, তখনও কাশ্মীর স্বাধীন ছিল। ভারত ও পাকিস্তান ছলে-বলে-কৌশলে কাশ্মীরের উপর দখলদারি কায়েম রেখেছে। কাশ্মীর সমস্যা কখনই ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয় হতে পারে না। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় কাশ্মীরিদের রাখতেই হবে। তাদের মতামতকেই সহানুভূতির সঙ্গে মর্যাদা দিতে হবে। নতুবা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'সন্ত্রাসবাদ' যাই বলুন না কেন, তা কখনই

বন্ধ হবে না।

এই মতের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঝুটা জাতীয়তাবাদের আবেগে ভারত-পাক জনগণ যখন গা ভাসিয়েছে, কার্গিল নিয়ে দু'দেশ যখন উত্তপ্ত, তখন এই ধরনের পালটা স্রোতে সাঁতার কাটা যে কত কঠিন তা আমরা অনুভব করেছি অনেক মূল্যে। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্র আমাকে শেষ করতে চাইবেই—জানতাম। রাষ্ট্র যন্ত্রের দুর্নীতি ও হিংস্রতা সাধারণের চিন্তারও বাইরে। রাষ্ট্র যেমনটি চাইবে তেমনটিই প্রচার করবে প্রচারমাধ্যমগুলো। কারণ প্রচারমাধ্যমের মালিকরা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রেরই সহায়ক। অতএব আমাকে গুলিতে ঝাঁজরা করে অনেক গোলাবারুদ পাওয়ার গল্প ফাঁদলে মানুষ তাও খাবে চেটে-পুটে।

এমনই এক কঠিন সময়ে এই লড়াইয়ে সর্বাত্মক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যাংকের বাঁধা আয়ের চাকরি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনে পা রেখেছি। টাডায় গ্রেপ্তারের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে লিখলাম একটি পুস্তিকা, 'কাশ্মীর সমস্যা ঃ একটি ঐতিহাসিক দলিল'।

বইটি ভারতে প্রকাশিত হলে আমার এ সমিতির উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে আসবে ধরেই নিয়েছিলাম। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই এমনটা ধরে নিয়েছিলাম। ফলে বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটল লন্ডন থেকে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় সাড়া পাই। ইংলন্ড, ইউরোপ, আমেরিকার সাংবাদিকদের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়ন তুলেছিল পুস্তিকাটি। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ও 'টাইম'-এর মতো বিশ্বখ্যাত দৈনিক ও ম্যাগাজিনের সাংবাদিক স্বশরীরে হাজির হয়েছেন আমাদের কথা শুনতে।

ভারত থেকে বইটির প্রকাশক পাওয়া তখন অসম্ভব ব্যাপার। হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনকে প্রকাশক হিসেবে খাড়া করলাম। বইটি পড়েই গ্রেপ্তার হওয়ার শঙ্কায় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডাকাবুকো ডাক্তার পদত্যাগ করলেন। এদেশ থেকে বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে চলল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল লেখাটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হল গোটা পুস্তিকাটি। ফলে সমাজনীতি ও রাজনীতি সচেতন মানুষ এবং আমজনতার একাংশ আমাদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হলেন, কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলেন। গড়ে উঠল আমাদের মতামতের পক্ষে রাজনৈতিক মত ও জনমত। আমাদের সমিতি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতে লাগলেন। খোলা ময়দানের সেমিনারগুলোয় অবাক করা ভিড়। ফল হিসেবে ভারত-পাক রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিই গেল আমূল পালটে। কাশ্মীর কাশ্মীরিদের— এই মত এখন যে পৃথিবী জুড়েই স্বীকৃতি পেয়েছে, এ'খবর সচেতন মানুষদের সবারই জানা। কেন্দ্রে ক্ষমতার গদিতে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতে তারাও বুঝে গেছে কাশ্মীর আর ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক বিষয় নেই। কাশ্মীরিদের সঙ্গে আলোচনায় বসাটা যে অনিবার্য, তা বুঝে নিয়েছে।

পরিস্থিতি বিচার করে পুস্তিকাটি আরও বিস্তৃত ও গভীর ভাবে লেখায় হাত দিই। ২০০০-এর জানুয়ারিতে 'স্বাধীনতার পরে, ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা' গ্রন্থে লেখাটি গ্রথিত হল। প্রকাশ করার হিম্মত দেখালো দে'জ পাবলিশিং।

মানবতার পক্ষে, গভীর অন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থা পালটে দেবার এই লড়াই আমার জীবনের ও সমিতিকালের কঠিনতম লড়াই, কঠিনতম চ্যালেঞ্জ জেতা।

'সেন্ট' করা হোক কাজের জন্যে

মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' করার আমরা বিরোধী নই। আমরা মানে যুক্তিবাদীরা। বিরোধী তাঁকে 'সেন্ট' বানাবার পদ্ধতি নিয়ে। টেরিজা কী এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য তাঁকে সম্মানিত করা যেত? যেমনটা করেছিল নোবেল পুরস্কার কমিটি। 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' দেওয়ার জন্য টেরিজার সঙ্গে কোনও অলীক কাহিনি জুড়তে হয়নি সেদিন। নোবেল পাওয়ার দু'যুগ পরে মানুষ এগোল, না পিছোল? প্রশ্ন জাগে, যখন দেখি টেরিজাকে সম্মান জানাতে হাতড়ে, মিথ্যের পাঁক খুঁজে বের করে আনতে হয় মণিকা-কাহিনিকে। এতে ক্যাথলিক খ্রিস্ট সম্প্রদায় মাদারকে সম্মানের বদলে অসম্মানের পাঁকেই পুঁতে দিলেন। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা পশ্চিমী খ্রিস্টানরা 'সেন্টহুড'-এর নামে এ কোন্ সমষ্টিগত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছেন? বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম কায়েম করতে তাঁরা কি কঠোর ইসলামপন্থীদের ও হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন? আলজিরিয়া থেকে ইরান, উগান্ডা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলাম চিন্তায় যে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের স্পষ্ট ছায়া, ভারতকে ওঝা-গুনিন-পুরোহিততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রয়াস, তাদের সঙ্গে চিন্তা-পার্থক্যের রেখা মুছে ফেলার খেলায় নামাটা কী পশ্চিমী খ্রিস্টানদের কাছে গর্বের? আমাদের কাছে কিন্তু শঙ্কার। পশ্চিমী খ্রিস্টানদের কাছে কিছু প্রত্যাশা আছে বলেই শঙ্কার। ভ্যাটিকানের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও প্রেম যদি বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারণবাদী নীতিকে আড়াল করার কৌশল হয়, তবে সম্প্রসারণবাদের শিকার হিসেবে আমরা দেশবাসীদের সচেতন করতে পারি মাত্র। কিন্তু তারপরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে—তৃতীয় সহস্রাব্দে পা দিয়েও ধর্মীয় মৌলবাদকে ভাঙিয়ে সম্প্রসারণকে কেন টিকিয়ে রাখতে হবে 'মস্তিষ্ক যোদ্ধাদের'? একই সঙ্গে বিশ্বায়ন ও মধ্যযুগীয় অবস্থায় অবস্থানের মধ্যে স্ববিরোধিতা কী স্পষ্ট নয়? পশ্চিমীদের বেশিরভাগই নিরীশ্বরবাদী। তারপরও পোপকে নিয়ে এত হই-চই করছেন কারা? মেকি জাত্যভিমান উস্কে দিয়ে পোপকে পশ্চিমী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার এত দিনকার ধারাবাহিকতা বড়ো রকমের ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা দিলেন কারা?

এই প্রজন্মে পশ্চিমী দেশগুলোতে এমন মানুষই সংখ্যায় বেশি, যাঁরা জন্মগতভাবে খ্রিস্টান, তাই খ্রিস্টান পদবি বয়ে চলেছেন মাত্র। বিশ্বাসে নিরীশ্বরবাদী। এঁদের সঙ্গে খিস্টধর্মে অন্ধ-বিশ্বাসীদের একটা চিন্তার দ্বন্দ্ব আছে। মাদার'কে 'সেন্ট' বানাবার ইস্যুতে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ আমার ও আমাদের সমিতির বক্তব্য পশ্চিমী তা'বড় প্রচার মাধ্যমগুলো অসামান্য গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে। এদের অনেক সাংবাদিকই প্রায় প্রতিদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ভ্যাটিকানের খুঁটিনাটি নানা জরুরি খবর পৌঁছে দিয়েছেন। ভ্যাটিকান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছে ১৯ অক্টোবর-ই মাদারকে 'সেন্ট' ঘোষণা করতে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আন্তরিক সহযোগিতায়। সহযোগীদের বেশির ভাগই কিন্তু জন্মগতভাবে খ্রিস্টান। তাঁরা স্পষ্টতই চাইছিলেন, মাদার ইস্যুকে কেন্দ্র করে 'ক্যানান ল' নামের কুসংস্কারের অন্তিম-যাত্রার সূচনা হোক। তাঁরা কেউই মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দেওয়ার বিরোধী ছিলেন না। চেয়েছিলেন, তাঁকে 'সেন্ট' দেওয়া হোক সারা জীবন গরীবদের জন্য যা করেছেন, তারই ভিত্তিতে। 'সেন্ট' বলে সম্মানিত করার জন্য মিথ্যে অলৌকিক কাহিনি গুঁজে দেবার কুপ্রথা বন্ধ হোক।



ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি, মণিকার চিকিৎসা

মজার কথা হল, এই প্রতিবাদীরা কেউই জন্মগতভাবে প্রোটেস্টান্ট নন, সবাই ক্যাথলিক। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের একটা ছোট্ট নমুনা হাজির করছি। ২ অক্টোবর ২০০৩। ভোরে আমার ঘুম ভাঙালেন বিবিসি'র এক সাংবাদিক। জানালেন, তাঁদের রোমের প্রতিনিধি ঘণ্টা কয়েক আগে ফোনে একটা ভয়ংকর খবর দিয়েছেন। যে দু'জন ডাক্তার জানিয়েছিলেন মণিকা বেসরা তাঁদের চিকিৎসায় ভালো

হয়েছে, তাঁদের নামে রোমে অ্যাকমডেশন বুক করা হয়েছে। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আজ অ্যাকমডেশনের যে লিস্ট দিয়েছে তাঁতে ওঁদের নাম আছে। ওঁদের তো আর এই বলতে আনা হচ্ছে না যে, মণিকা চিকিৎসায় সেরেছে; তবে কেন আনছে? ডাক্তার কি তবে ডিগবাজি খাবেন? বিষয়টা এখুনি দেখুন।

এক ঘণ্টা পরে একই বক্তব্য রাখলেন আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাংবাদিক। অনুরোধ একই। তারই ভিত্তিতে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সুবিধে হয়েছে।

এমনই বহু সহযোগিতা আমাদের কঠিনতম লড়াইকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করছে। সত্যি বলতে কী, আমরা যুক্তিবাদীরা শিখতে শিখতে পালটাই। পালটাতে পালটাতে শিখি। 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' আমেরিকার কাছ থেকে শিখেছি। ভ্যাটিক্যানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় আমেরিকাকে আমাদের গুরুদক্ষিণা।

মাদার টেরিজা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক ও প্রসারক। রাস্তার মরণাপন্ন রোগীকে তুলে এনেছেন, এটা সত্যি। এও সত্যি, চ্যারিটির বিনিময়ে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদার যা করেছেন, সে জন্যই ক্যাথলিক ধর্মের তরফ থেকে পোপ তাঁকে সম্মানিত করতেই পারতেন। মিথ্যে কাহিনিকে টেনে আনার মতো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েই পারতেন। সেন্ট ঘোষণা করার জন্য প্রার্থীর অলৌকিক ক্ষমতার আষাঢ়ে গল্প হাজির করতেই হবে—এমন বোকা বোকা বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেললেই পারতেন। তৃতীয় সহস্রাব্দ তাকে স্বাগত জানাত, যদি বলতেন—আমাদের ভুল ছিল।

এই পোপ-ই কয়েক বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন—আমাদের ভুল ছিল। সূর্য পৃথিবীকে নয়, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই ভুল স্বীকারের মধ্য দিয়ে মুক্তমনের ভ্যাটিকান-ই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাদের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে।

পোপ যদি 'ক্যানান ল'র মধ্যযুগীয় অলৌকিক বিশ্বাসকে ছেঁটে ফেলে মাদারকে তাঁর কাজের জন্যে 'সেন্ট' ঘোষণা করতেন, তাতে পোপের সম্মান বৃদ্ধি পেত। কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে ভ্যাটিকানকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পোপের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। মধ্যযুগীয় এই 'ক্যানান ল'-কে রমরমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। আছে লজ্জা। যারা এ'ধরনের খ্রিস্টান মৌলবাদী চিন্তার মধ্যে গৌরব খুঁজে পায়, তাদের সঙ্গে মুসলিম ও হিন্দু মৌলবাদীদের পার্থক্য কোথায়? এরা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন, বোকা-বোকা কিছু ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মকে যুগোপযোগী করে তুলতে এরা অক্ষম।

অ্যাগনেস থেকে মাদার টেরিজা

প্রতিটি মানুষেরই গুণের সঙ্গে কিছু দোষ থাকে। আবার দোষের সঙ্গে কিছু গুণও। আমরা শুধুমাত্র গুণ অথবা দোষ নিয়ে বিচারে বসলে সে বিচার হবে একটি সম্পূর্ণ মানুষের বদলে খণ্ডিত মানুষের বিচার। অর্থাৎ, ভুল বিচার। মানবের মতো জটিলতম চরিত্রের বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন আবেগে আপ্লুত না হয়ে মুক্তমনে বিচার করা। বিচার-বিশ্লেষণের আগে মাদার টেরিজার জীবনচর্যাকে জেনে নেওয়া খুবই জরুরি। আসুন সেই প্রাথমিক কাজটা সেরে নিই।



- আগেকার নাম অ্যাগনেস। পুরো নাম অ্যাগনেস গোনক্সা বোজাক্সিউ। জন্মগতভাবে ক্যাথলিক খ্রিস্টান।
- জন্ম ২৬ আগস্ট ১৯১০ সালে, যুগোস্লাভিয়ার আলবেনিয়া রাজ্যের স্কোপিয়ে শহরে। ছোট্ট শহর। এক দিদি, এক দাদা, অ্যাগনেস সবার ছোট।
- বাবা নিকোলাস ছিলেন বাড়ি তৈরির ঠিকাদার। অনিশ্চিত আয়। তীব্র দারিদ্র ছিল নিত্যসঙ্গী। দিদি ও মা রোজগারের চেষ্টা করতেন।
- ১৯১৭-তে বাবা খুন হলেন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দারিদ্র আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আলবেনিয়ার মুসলিম সম্প্রদায় খ্রিস্টান বিরোধী। খ্রিস্টান যেন তাদের

জাতশত্রু। ফলে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের সব সময় নানা অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হত। চার্চই ছিল খ্রিস্টানদের একমাত্র ভরসাস্থল। অ্যাগনেস তাঁর বারো বছর বয়সেই জানিয়ে দেন, তাঁরা লক্ষ্য 'নান' বা খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী হওয়া। ক্যাথলিক চার্চে যাওয়ার সুবাদে তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও কলকাতার কথা অনেক শুনেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন হয়ে ওঠে, এই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ভারতে পা দেওয়া।

- ২৯ নভেম্বর, ১৯২৮ ভারতে আসতে ডাবলিন থেকে জাহাজে ওঠেন। কলকাতায় নামেন ৬ জানুয়ারি, ১৯২৯।
- উঠলেন লরেটো কনভেন্টে। মিশনারিদের পরিচালিত এই স্কুল ছিল কলকাতার অভিজাত স্কুল। স্কোপিয়ে শহরের সেক্রেড হার্ট চার্চ-এর পরিচয়পত্রের সুবাদে তিনি এই স্কুলে একই সঙ্গে শিক্ষাজীবন ও শিক্ষিকা জীবন শুরু করেন।
- ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কলকাতার সেন্ট মেরিজ স্কুলে পড়িয়েছেন। সানডে স্কুলেও পড়াতেন। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়াতেন। ১৯৩৭-এ অধ্যক্ষা হন। তখন তিনি সিস্টার টেরিজা থেকে মাদার টেরিজা নামে পরিচিত হন।
- ১৯৪৬-এ টেরিজা ঠিক করলেন, তিনি গরিব, অনাথদের চ্যারিটি ও ক্যাথলিক ধর্মান্তরের কাজকে জীবনের লক্ষ্য করবেন।
- ১৯৫০-এর এপ্রিলে ভ্যাটিকানের 'কার্ডিনাল'-এর ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার বিভাগ টেরিজার আবেদনপত্র পেলেন। সঙ্গে কলকাতার আর্চবিশপের প্রশংসাপত্র।
- ১৯৫০-এর ৭ অক্টোবর পোপ 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'কে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ভ্যাটিকানের নিয়ম অনুসারে সঙ্গে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করার বিধান দেন।
- ১৯৬৫-তে ভ্যাটিকান সিটি এই সংস্থাটিকে পুরোপুরি নিজেদের আইন ও অনুশাসনের অঙ্গ করে নেয়।
- ১৯৫০-তে ৫৪এ লোয়ার সারকুলার রোডে একটা বাড়ি কিনে নিলেন আর্চবিশপ। এই বাড়ির নাম দেওয়া হল 'মাদার হাউস'। এটাই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মূলকেন্দ্র। এখানেই থাকেন সিস্টাররা ও শিক্ষার্থীরা।
- শিক্ষার্থীনীদের বেশির ভাগই আসেন আদিবাসী পরিবার থেকে। পরিবারের অভাব এবং এই সংস্থায় এলে খাওয়া-পরা-থাকার নিশ্চিত আশ্বাস—এটাই আদিবাসী মহিলাদের এখানে ভিড় জমানোর প্রধান কারণ। শিক্ষাপর্ব পাঁচ বছরের।
- প্রথম বছরে শেখান হয় ক্যাথলিক ধর্মের অ-আ-ক-খ। বাকি বছরগুলো শেখানো হয় প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রাথমিক শিক্ষাদান ও হাতের কাজ

শেখানোর পদ্ধতি, রোগী, গরিব ও পথশিশুদের সেবা পদ্ধতি এবং ধর্ম প্রচার ও ধর্ম প্রসার পদ্ধতি। পাঁচ বছর পর শিক্ষার্থীরা খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সেবা ধর্ম পালনের শপথ নেন।

- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩। এদিন টেরিজা ১৪ ক্রিক লেনের একটি বাড়িতে থেকে প্রথম জয়যাত্রা শুরু করেন।
- ১৯৪৮, বাঙালিদের মন জয় করতে স্কার্ট ছেড়ে শাড়ি পরলেন।
- ১৯৫২, ২২ আগস্ট। কলকাতা পুরসভা কালীঘাট মন্দিরের লাগোয়া বাড়ি দিলেন টেরিজাকে। এখানে গড়ে উঠল **'নির্মল হৃদয়'**। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মরণাপন্ন নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল এটি।
- ১৯৬০ সালে আর্চবিশপের অনুমতি নিয়ে টেরিজা তাঁর চ্যারিটি, ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরের কর্মসূচিকে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে দেবার অনুমতি দিলেন।
- ১৯৬১-তে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নতুন বাড়ি হল আগ্রা, ঝাঁসি, মুম্বাই, গোয়া, পাটনা, আম্বালা, দার্জিলিং, ভাগলপুর অমরাবতীতে।
- ১৯৬১-তে আসানসোলের কাছে শান্তিনগরে চৌতিরিশ একর জমি এক টাকা ভাড়ায় মাদারকে লিজ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেখানে মাদার গড়ে তুললেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।
  মিশনারিজ অব চ্যারিটি ভারতে পঞ্চান্নটি কুষ্ঠ হাসপাতাল চালায়। পৃথিবীর বিভিন্ন গরিব দেশে আরও গোটা তিরিশেক কুষ্ঠাশ্রম চালায়।
- ১৯৬৫-তে প্রথম বিদেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার ও সেবার জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হল ভেনেজুয়েলায়। পরে ভেনেজুয়েলায় আরও দুটি বাড়ি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে আরও দুটি কেন্দ্র। এ'ছাড়াও এক বা একাধিক মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র গড়ে তুলেছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আলবেনিয়া, ব্রাজিল, পানামা, গাজা, ইথিওপিয়া, সিসিলি, ফিলিপিনস, পাপুয়া, নিউগিনি, বুরুন্ডি বাংলাদেশ প্রভৃতি ১৩৩টি দেশে। কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৬০০।
- মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কেন্দ্র আছে ভ্যাটিকান সিটিতে। কারণ মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ভ্যাটিকান অনুমোদিত এবং সরাসরি ভ্যাটিকানের নির্দেশ মতো চলা একটি সংস্থা। পোপের হুকুম-ই শেষ কথা। মাদার টেরিজা পোপের প্রতিনিধি মাত্র।
- ১৯৭৩-এ শিয়ালদহ এলাকার এন্টালিতে গড়ে তোলা হল 'নির্মলা শিশুভবন'। এটি হল পথশিশুদের নৈশাবাস। এখান থেকে কাজের বিনিময়ে খাবার দেওয়া হয়। ১০০টি ডাবের খোলা কুড়িয়ে এনে নৈশাবাসে জমা দিলে ১৬টা বিস্কুট অথবা এক পাউন্ড রুটি মেলে। আট থেকে দশ বছরের প্রায় আটশো শিশু রাতে এখানে থাকে।

- ১৯৭৩-এ তিলজলায় গড়ে তোলা হয় 'প্রেমদান' কেন্দ্র। নির্মলা শিশুভবনে সংগৃহীত ডাবের খোলা লরিতে তুলে আনা হয় এই কেন্দ্রে। এখানে ডাব শুকিয়ে ছোবড়া তৈরি করা হয়। ছোবড়া দিয়ে তৈরি করা হয় দড়ি, মাদুর, জাজিম, গদি ইত্যাদি। বিকলাঙ্গ প্রায় শ'তিনেক মানুষ এখানে কাজ করে। বাড়িটি আই. সি. আই-এর দান।
- ১৯৯১-এর মধ্যে ভারতে তৈরি হল ১৬৮টি বাড়ি। সেগুলোতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র।
- মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কারও কাছ থেকেই কোনও চাঁদা গ্রহণ করে না। দান গ্রহণ করে মাত্র। এই দাতাদের তালিকায় কুখ্যাত একনায়কতন্ত্রী অনেক শাসকই আছে। আছে আন্তর্জাতিক কুখ্যাতির অধিকারী অনেক মাফিয়া ও প্রতারক। মাদার এইসব একনায়কদের দরাজ হাতে 'সার্টিফিকেট' দিয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত কিটিং টেরিজাকে দান করায় টেরিজা কিটিং-এর পক্ষে মার্কিন বিচারব্যবস্থার কাছে আবেদন রেখেছিলেন।
- ১৯৬২-তে পেলেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।
- ১৯৭১-এ পেলেন 'পোপ জন ত্রয়োবিংশ শান্তি পুরস্কার'।
- ১৯৭২-এ পেলেন 'জওহরলাল নেহেরু অ্যাওয়ার্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং
- ১৯৭৫-এ পান 'অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
- ১৯৭৯-তে পেলেন শান্তির জন্য 'নোবেল পুরস্কার'।
- ১৯৮০-তে পেলেন 'ভারতরত্ন'।
- ১৯৮৩-তে ইংলন্ড দিল 'অর্ডার অফ মেরিট'।
- ২০০৩-এ পেলেন 'ব্লেসেড'। দিলেন পোপ দ্বিতীয় জন পল।
- বিখ্যাত আটটি সম্মানের মধ্যে ছটিই পেয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছ থেকে।
- মৃত্যু, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭।

'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ভ্যাটিকানের-ই সিসটার কনসার্ন পোপের প্রতিনিধি হিসেবে মাদার এই সংস্থার দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই মাদার বিশুদ্ধ, কঠোর ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষেই প্রচার চালাতে চেয়েছেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মের আদর্শ কায়েম করতে চেয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারক যিনি, ধর্মান্তরকরণ যাঁর লক্ষ্য, তাঁর চিন্তার সঙ্গে সমাজ সচেতন মানুষদের চিন্তার বিরোধ থাকতে বাধ্য। সমাজ সচেতন মানুষের চোখে যা

মাদারের সীমাবদ্ধতা, তাই মাদারের চোখে লক্ষ্যপূরণ। মাদারের 'সীমাবদ্ধতাগুলো' এই ধরনের ঃ

❑ মাদার ছিলেন গর্ভপাতের কট্টর বিরোধী গর্ভপাতের পিছনে মা বা বাবার ইচ্ছের কোনও দাম-ই নেই মাদারের কাছে। এমন কী গর্ভপাতের পিছনে শারীরিক, আর্থিক বা সামাজিক— যে প্রতিবন্ধকতাই থাক না কেন, মাদার তাকে একটুও পাত্তা দিতে রাজি ছিলেন না।

মাদারের এমন মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, তিনি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারী ছিলেন না। ১৯৬৫ সালে মাদার নিজেই এই পরাধীনতার শিকল পরেছিলেন। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে ভ্যাটিকান যখন তাদের আইন ও অনুশাসনের অঙ্গ করে নেয়, তখন থেকে সংগঠনটি সরাসরি চলে যায় পোপের হুকুমের আওতায়। ফলে গর্ভপাত বিষয় পোপের মতামতের সুরে সুর না মিলিয়ে কোনও উপায়-ই ছিল না মাদারের।

❑ অনেকেই অভিযোগ করেন মৃত্যুপথযাত্রীদের নিয়েও মাদার ধর্মের রাজনীতি করেছিলেন। তিনি মুমূর্ষ মানুষদের সেবার বিনিময়ে, চ্যারিটির বিনিময়ে ধর্মান্তরিত করে-ই গেছেন। লাগাতার ভাবে করে গেছেন।

কিছু পত্রিকায়, কিছু ম্যাগাজিনে (যার মধ্যে 'আমরা যুক্তিবাদী'ও আছে), কিছু বইতে এইসব অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ কী জন্যে? নীতিহীনতার? ক্যাথালিক উপাসনা ধর্মের প্রচার ও প্রসার পোপ ও ভ্যাটিকানের আদর্শ। ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি মাদার এই আদর্শের পরিপন্থী কাজ করবেন—এমনটা যাঁরা প্রত্যাশা করেন, তাঁদের দলে আমরা যুক্তিবাদীরা নেই। আমরা যদি ভাবতে থাকি, বাঘ নিরামিষ খাবার খাবে, শোষকরা সাম্য চাইবে—সেটা আমাদের বোকামি। আমাদের বুঝতে হবে, ধর্ম প্রচারক ও প্রসারকামী মাদার তাঁর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য-ই পালন করে চলেছেন।

এটা ভালো, কী খারাপ? আপনার আমার গড়ে ওঠা বোধ-ই তা তা বলে দেবে। সে বোধ ভ্যাটিকানের সঙ্গে না মিলতেই পারে।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নিঃস্বার্থ ভাবে চ্যারিটি করে না—এই অভিযোগ অনেকেরই। সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁদর নাচন নাচিয়ে যাওয়া ক'টা দল নিঃস্বার্থ ভাবে গরিবের কথা ভাবে? নেতারা পার্টির ভোট বাক্স আর নিজের তহবিল বাড়াতেই ব্যস্ত। এবং এটাই বাস্তব চিত্র।

এইসব রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের তুলনায় ওরা অনেক সৎ। সাম্যের স্বপ্ন দেখায় না। সোজা-সাপটা বলে, আমাদের সাহায্যের দোকান খুলেছি। রেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কাজ সব-ই মিলবে। টাকাও দিতে হবে না। খ্রিস্টধর্ম নিলে সব বিনামূল্যে। নিলে নাও। পছন্দ না হয়, নিও না। কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।

ওরা গরিবদের বন্ধু সেজে বিরোধী ধর্মের মানুষদের ধর্ষণ করে না, বাড়ি জ্বালায় না, মুন্ডু কাটে না। অনেক রাজনৈতিক দলের তুলনায় ওরা অনেক ভালো। দলের

ছত্রছায়ায় সমাজবিরোধী পোষে না। সমাজসেবী পোষে। হ্যাঁ পোষে। তবে এই সমাজসেবীরা অনেক গরিবেরই বন্ধু, অনেক অনাথের-ই নাথ। এইসব অনাথ, মুমূর্ষরা জানে-ই না ধর্ম খায়, না মাথায় মাখে। যে ধর্ম ওদের বাঁচায়, সে ধর্ম ওরা নেবে, বেশ করবে।

ভ্যাটিকানের ধর্মের রাজনীতি থেকে ভারতের যে রাজনৈতিক দল শিক্ষা নিয়েছে, তাদের নাম সংঘ পরিবার। সংঘ পরিবার মানে, ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যৌথ পরিবার। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতের হাজার হাজার গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষা, হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার কর্মসূচি নিয়েছে। ওরাও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এবং চার্চগুলোর মতোই সেবার ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের রাজনীতি করছে।

সংঘ পরিবারের এই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বামপন্থী, কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা। 'গেল গেল' রব তুলেছেন। উপসনা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে সরবতা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু এই প্রতিবাদ যদি স্রেফ ভন্ডামি হয়, তাহালে দুঃখের, ক্ষোভের। দেশে শুধু খ্রিস্টান ধর্মান্তরের কাজ চলছে, তা কিন্তু নয়। ইসলাম ধর্মান্তকরণের জন্য ভারতে বিপুল পরিমাণে পেট্রো-ডলার ঢুকছে। খ্রিস্টধর্ম এবং মুসলিম ধর্ম নিয়ে যে সেবার রাজনীতি চলছে সে বিষয়ে সব জেনে-শুনে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন? এই নীরবতাও তো ঘৃণ্য রাজনীতি।

খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সেবার রাজনীতি করতে দেখে বিজেপি একই ভাবে সেবার রাজনীতিতে নেমেছে। মানলাম। তেমন সেবার রাজনীতি করতে ক্যাডারদের হতদরিদ্র গ্রামগুলোতে পাঠাতে অসুবিধে কোথায়? ওরাও গ্রামে গ্রামে পড়ে থেকে শিক্ষা, চিকিৎসা, হাতের কাজ শিখিয়ে গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করে তুলুন। অসুবিধে কোথায়? ওরা গ্রামবাসীদের মন জয় করে নিলে সাম্যের শিক্ষা নিশ্চয়ই নেবে।

গ্রামে সেবার ব্রত নিয়ে যাবার মতো ক্যাডার মিলবে না ভেবেই কী এ'ধরনের প্রোগ্রাম নিতে বেজায় অসুবিধে আছে? হতে পারে, এমনটা হতে পারে। যে'দিন দেখব তোলাবাজ-মস্তান-প্রোমোটার-ক্যাডার-হাফলিডাররা তাদের এমন সাজানো 'ব্যবসা' ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে সেবার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের নীতি শেখাচ্ছে, সেদিন তো বেড়ালরাও মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে। মার্কসবাদী নেতারা এই সত্যিটা ভালো রকম জানেন বলেই সংঘ পরিবারকে গালাগাল দিয়েই দায়িত্ব সেরেছেন? ওঁরা কী জেনে গেছেন ক্যাডার—হাফলিডারদের মনের কথা—"আরে বাবা সেবার রাজনীতির মতো ছুতোরের টুক্‌টাকের দরকার কী? কামারের এক ঘা'য়ে ইলেকশন তো আমরাই উতরে দিই। তারপর আবার আমাদের গ্রামে পাঠাবার ন্যাকামো কেন? আমাদের দিয়ে ইলেকশন জিতবেন, গদিতে বসবেন, মূল্য দেবেন না?"

গ্রামে যে সব ক্যাডার ও হাফলিডার স্থায়ী বাসিন্দা, তারা মাদার টেরিজার চেয়ে দুর্যোধনের ভূমিকায় নামতে বেশি আগ্রহী। নিরুত্তেজক সেবার চেয়ে 'বস্ত্রহরণ' ও

'জতুগৃহ' পালায় উত্তেজনার মজাই আলাদা। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাজ-কর্মকে টাইট দিতে আমরা ক্যাডাররা এ'সব দুষ্টুমি একটু-আধটু করব। কখনও-সখনও বাড়াবাড়ি হলে দেখ-ভালের দায়িত্ব পার্টিকে তো নিতেই হবে। কাজ করাবে মূল্য হিসেবে প্রোটেকশনটুকু দেবে না, এ হয় নাকি! গ্রাম থেকে চা বাগান, সর্বত্র সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে নেতাদের মূল্য দিতেই হবে। মূল্য—প্রোটেকশন।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এই মূল্যই নিচ্ছে, তবে মস্তানি করে নয়।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেন, ওরা গরিবি হটাতে চায় না। এই যে বিপুল অর্থ ওরা সাহায্য হিসেবে পাচ্ছে, তা দিয়ে গোটা দেশে লক্ষ লক্ষ কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারত, পারত কোটি কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তা ওরা করে না।

এইসব দুর্মুখেরা বোঝে না যে—দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে দরিদ্র মানুষের জোগান জরুরি। তার-ই জন্যে জরুরি দারিদ্রকে টিকিয়ে রাখা। গরিব মানুষগুলো গরিবি থেকে মুক্তি পেলে, বাঁচার শর্তে খ্রিস্টান হবে কে? ভ্যাটিকান কোনও দেশের গরিবি হটাবার ঠিকে নেয়নি। ঠিকে নিয়েছ খ্রিস্টধর্ম প্রসারের।

দুর্মুখদের মুখ বন্ধ করা সোজা। ব্ল্যাক আউট কর। সঙ্গে কর মাদারের গুণকীর্তন প্রচার। 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' মার্কা বন্ধুরাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, দেবে।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অনেক আছে যে, তাদের কেন্দ্রগুলোতে ডিসপেনসারি আছে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার নেই। নান বা সন্ন্যাসীরাই রোগীর কাছ থেকে শুনে বড়ি-টড়ি দিয়ে দেন। সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেবার মতো কোনও হাসপাতাল-ই মাদার তৈরি করার চেষ্টা করেননি, প্রতুল অর্থ থাকার পরও। মাদার নিজের চিকিৎসা করাতে ভর্তি হয়েছেন অত্যন্ত নামী-দামি বে-সরকারি হাসপাতালে। নিজের গড়ে তোলা হাসপাতালকে চিকিৎসার দায়িত্ব দেননি। জানতেন, সামান্য ভরসা করার মতো পরিকাঠামো তাঁর হাসপাতালগুলোতে নেই।

গরিব, আতুর, মৃত্যুপথযাত্রীরা চিকিৎসা পেয়েছেন মাদারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে। মাদার নিজের চিকিৎসার জন্যে কিন্তু ভুলেও পা রাখেননি নিজের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে। আপন-পর জ্ঞানটুকু প্রয়োজনের সময় টনটনে ছিল—অন্তত চিকিৎসার ব্যাপারে। নীল পাড় সাদা খোলের সুতির শাড়ি পরে আর ভাঙা বাংলা বলেই বাজার মাত করে গেছেন মাদার। মাদার রাজনীতিকদের ভরসা জোগান। শিখিয়েছেন, কীভাবে কথায় ও কাজে দুই পৃথিবীতে থেকেও কোটি কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করা যায়।

কিন্তু, চিরকালের জন্য যায় কি? সময় উত্তর দেবে। অথবা উত্তর দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

মাদারকে নিয়ে এতটা আলোচনার পর মনে হতে পারে এ সব-ই মাদারের সীমাবদ্ধতা। আবার কেউ যদি বলেন, না এসব কোনও সীমাবদ্ধতার প্রকাশ নয়।

এ'সবই ভ্যাটিকানের প্রতি মাদারের দায়বদ্ধতার বিভিন্ন রূপ। আমরা কি এক কথায় এই বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে পারব?

কেউ কেউ মনে করতেই পারেন, একজন সেন্ট এর এমন আচরণ সাজে না। কিন্তু ধর্মের প্রচার ও প্রসার যাঁর লক্ষ্য, তাঁর খুব সাজে।

ভ্যাটিকান মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' করুক তাঁর কাজের জন্যে। খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনন্য অবদানের জন্যে। এতে আমাদের প্রতিবাদ জানাবার কোনও অবকাশই থাকে না। প্লিজ, 'সেন্ট' বানাতে অলৌকিক গপ্পো ফাঁদবেন না।

মাননীয় পোপ, দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতি করুণার তলানি আপনার মনের তলায় পড়ে থাকলে এমন ভয়ংকর খেলা খেলবেন না। আপনার এই খেলায় ধর্মান্তরে জোয়ার আসতেই পারে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে আধুনিক চিকিৎসা থেকে অলৌকিক চিকিৎসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অমানবিক, অপরাধ। মাননীয় পোপ, আপনার এ'খেলার পরিণতিতে অলৌকিক-চিকিৎসার দিকে ধাবিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্য আপনি-ই দায়ী থাকবেন।

ভারতকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যুগে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য ইতিহাস একদিন আপনাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই। এই সত্যটুকুও বোঝার ক্ষমতা কি কেড়ে নিয়েছে আপনার অসুস্থতা?

মিরাকেলের রোজ নামচা

২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার ২০০২। গাজোল থেকে সুবোধ সূত্রধর ফোন করলেন। সুবোধ আমাদের সমিতির সদস্য। গাজোল মালদা জেলার ছোট শহর। সুবোধ জানালেন, "মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানবার জন্য আমাদেরই কাছের গ্রাম নাকোড়ের একটি গরিব আদিবাসী বউকে হাজির করা হচ্ছে। নাম মণিকা বেসরা। দীর্ঘ বছর ধরেই ওদের পরিবারকে চিনি। নাকোড় মেহেন্দিপাড়া চার্চ এলাকার অন্তর্গত। মেহেন্দিপাড়া চার্চ থেকে নাকি গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মণিকা বেসরার পেটে টিউমার হয়েছিল। বায়পসি করে নাকি দেখা গেছে ক্যানসার। এই ক্যানসার নাকি, রাতারাতি সেরে গেছে। সারিয়ে দিয়েছে মাদারের ছবি। এ' ব্যাপারে আমরা কিছু করতে পারি না?"

২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২০০২। দারুণ অগ্রগতির খবর দিলেন সুবোধ। একটা টিম গড়ে কাজে নেমেছিলেন। টিমে সুবোধের সঙ্গী ছিলেন ডাঃ নিরঞ্জন মণ্ডল

ও ডাঃ মদনমোহন বিশ্বাস। ১৯৯৮-এ মণিকা বেসরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। অসুখটা টিবি। পেটে একটা মাংসপিণ্ড ধরা পরেছিল আলট্রাসোনোগ্রাফিতে। টিবি'র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এই মাংসের দলা বা মাংসপিণ্ডের উৎপত্তি। চিকিৎসা করেছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে ডাঃ আশিস বিশ্বাস। তিনি ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির কাছে মণিকাকে পাঠান। রঞ্জন মুস্তাফি চিকিৎসা করেন। পরবর্তী সময়ে মণিকা শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানেও একই কথা বলা হয়—রোগটা টিবি। মণিকার স্বামী সেলকু মুর্মুর কথা অনুসারে, হাসপাতাল থেকে ৯ মাস খাওয়ার জন্য অনেক রকম ওষুধ দিয়েছিল। মণিকা ওষুধ খেত। মণিকা ওষুধেই সেরেছে। এক দিনে টিউমার সেরেছে, এমন কিছু দেখিনি।

বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার ১১ মাস পরে মণিকা আবার বালুরঘাট হাসপাতালে যান। সেখানে দ্বিতীয়বার মণিকার আলট্রাসোনোগ্রাফি হয়। টিউমারের অস্তিত্ব ধরা পরেনি। মণিকার ডাক্তারদের মত, টিবি আজকাল অতি সাধারণ রোগ। ওষুধ খেয়েছেন, সেরেছেন। টিবি'র উপসর্গ টিউমারও সেরে গেছে। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই।

২০০০ সালে সে সময়কার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন পার্থ দে। তিনি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ মুর্শেদের কাছে মণিকার চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করেন। ডাঃ মুর্শেদ মণিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ডকুমেন্টের কপি পার্থ দে'র কাছে পাঠিয়েছেন।

সুবোধ আরও জানালেন, মণিকা এখন বলছেন, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮-এর রাতে হঠাৎ করে তাঁর বিশাল সাইজের টিউমারটা ভ্যানিস হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পতিরাম কেন্দ্রে। সে রাতে পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। মণিকা যখন ব্যথায় ছটফট করছেন, তখন মাদারের ছবি থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে মণিকার পেটে পড়ল। ওমনি ব্যথা চলে গেল। অবাক মণিকা পেটে হাত বুলিয়ে দেখেন, বিশাল টিউমারের কোনও চিহ্নই নেই। সে'রাতেই মণিকা নাকি ঘটনাটি জানান সিস্টার বার্থলোমিয়াকে। সিস্টার জানান কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার নির্মলাকে।

রাজ্যের এত রোগী থাকতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন মণিকার রিপোর্ট তলব করলেন? এটা কোটি টাকার প্রশ্ন। মণিকা তো মারা যাননি। চিকিৎসা বিভ্রাট নিয়ে কোনও বিতর্কও ওঠেনি। তবে? সিস্টার নির্মলা কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট আদায় করতে চাইছিলেন, যাতে লেখা থাকবে—মণিকা দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন, তারপর ঠিক কী করে যে সেরে উঠলেন? সত্যিই আশ্চর্য!

সিস্টার নির্মলা শেষ পর্যন্ত একজন ধর্ম প্রচারক। ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য

প্রয়োজনে 'কালো' কে 'সাদা' বলবেন—এটাই স্বাভাবিক। ধর্মের রাজনীতিতে এটা স্বাভাবিক।

সুবোধ এও জানালেন, এখন হঠাৎ করে মিশনের সেন্টারগুলো থেকে জোর প্রচার চালান হচ্ছে, মণিকার টিউমারটা আসলে ছিল ক্যানসারের প্রতিক্রিয়া। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য নাকি খুব নামি ডাক্তার। তিনিই নাকি জানিয়েছিলেন, মণিকার এই ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসায় সারানো সম্ভব নয়। সেলকু জানিয়েছেন, ডাঃ ভট্টাচার্যের নাম-ই শোনেননি।

৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০০২। ফোনে ধরলাম প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে'কে। জানতে চাইলাম, মণিকার মেডিকেল রিপোর্ট চাওয়ার ইনসাইড স্টোরি। জানলাম, সিস্টার নির্মলা পার্থ-দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণিকা বেসরা নামের এক মহিলার টিউমার না ক্যানসার হয়েছিল। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ডাক্তাররা নাকি জানিয়েছিলেন—এ' অসুখ সারার নয়। তারপর মাদার টেরিজার একটা লকেট নিয়ে প্রার্থনা করায় রাতারাতি নাকি অসুখটা সেরে যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে পার্থ দে কথাগুলো লিখে দিলে পোপের কাছে সেই সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মাদার সেন্টহুড পাবেন কি না, সেটা নাকি তার সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করছে।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপারের কাছে তিনি বিষয়টি জানতে চান। সুপার তাঁকে সব ডকুমেন্টের কপি পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে এ বিষয়ে নিজের মন্তব্য লিখে পাঠান। সব পড়ে তিনি সিস্টার নির্মলাকে জানিয়ে দেন যে—মণিকার সুস্থ হওয়ার মধ্যে মিরাকেল কিছুই নেই। আধুনিক চিকিৎসাতেই তিনি সুস্থ হয়েছেন।

রাতে 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকা গোষ্ঠীর সাংবাদিক সুমন চক্রবর্তীর ফোন পেলাম। জানালেন, আগামী ৪ অক্টোবর ভ্যাটিকান মাদারকে সেন্টহুড দেওয়া নিয়ে একটা ঘোষণা রাখবে।

৪ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০২। বিবিসি'র ভারতের প্রতিনিধি সুবীর ভৌমিক ফোন করলেন। আজ ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে, মাদারের অলৌকিক মহিমার প্রমাণ মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক আদিবাসী মহিলার জরায়ুতে টিউমার হয়েছিল যা আসলে ক্যানসারের ফলে কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। বহু চিকিৎসার পর ডাক্তাররা জানিয়ে ছিলেন, আধুনিক চিকিৎসায় এ রোগ সারিয়ে তোলা অসম্ভব। এমন অসম্ভবই সম্ভব করেছে মাদার টেরিজার একটি লকেট। ১৯৯৮-এর ৫ সেপ্টেম্বর রাতে মাদারের মিরাকেলে মুহূর্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন মহিলা।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ভ্যাটিকানের কাছে এই দাবি জানাবার পর কলকাতার

পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বারুইপুরের বিশপ সালভাদোর লোবোর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি সত্যানুসন্ধান করেন। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে জানান, মণিকা বেসরা একজন ক্যানসার রোগী ছিলেন, তাঁর জরায়ুর ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে তোলা ছিল অসম্ভব। বিশপ লোবোর তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ভ্যাটিকান ঘটনাটিকে নির্ভেজাল মিরাকেল বলে ধরে নিয়ে সেন্ট ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

শ্রীভৌমিক জানালেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য রেকর্ড করতে চান, বিবিসি-তে প্রচারের জন্যে।

বি বি সি'র স্টুডিওতে পৌঁছলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেই বক্তব্য রাখলাম। বলা ভালো—প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জবাব। প্রশ্ন ছিল, মাদার টেরিজার মিরাকেল পাওয়ারের পরিচয় পেয়েছে বলে আজ ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে। ঘোষণার বলা হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুরের এক আদিবাসী মহিলার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। মাদার টেরিজার ছবি থেকে জ্যোতি এসে পড়ে মহিলার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসার সেরে যায়। মাদারের এই মিরাকেলকে ভ্যাটিকান স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি মাদারের 'সেন্টহুড' পাওয়ার ব্যাপারটা শক্ত করল। এ বিষয়ে আপনি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কী বলছেন, কী ভাবছেন।

উত্তরে মণিকা বেসরাকে নিয়ে আমাদের সমিতির গাজোল ও মশালদিঘি শাখার তিন সদস্য সুবোধ সূত্রধরের নেতৃত্বে যে তদন্ত চালিয়েছিল, বলেছিল তাঁরা কী পেয়েছেন, কী দেখেছেন, তাও বলেছি। জানিয়েছি আমাদের সমিতির স্ট্যান্ড। মাদারকে গরিবদের সেবা এবং ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজকর্মের জন্য ভ্যাটিকান তাঁকে সম্মান জানিয়ে 'সেন্ট' উপাধি দিতেই পারত। কিন্তু ভ্যাটিকান এটা কী করল? 'সেন্ট' বানাতে 'মিরাকেল'-এর মিথ্যে দাবি হাজির করে কিংবদন্তি মাদারকে তো অপমান-ই করল। আমরা মণিকার ডাক্তার ও স্বামী সেলকুর সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা কিন্তু জানিয়েছেন, মণিকা ওষুধ খেয়েই সুস্থ হয়েছে। সেলকু কিন্তু নিজেই বিশ্বাস করেন না যে, মণিকা মিরাকেলে রাতারাতি সুস্থ হয়েছেন। এরপরও মিথ্যেকে 'সত্যি' বলে চালাবার এই অপচেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয়।

এমন মিথ্যে প্রচারে আমাদের মতন গরিব দেশের বিশাল ক্ষতি হবে। শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, গরিব, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হবে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের বদলে 'মিরাকেল' চিকিৎসার দিকে ঝুঁকবে। ফলে মিথ্যে চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়বে। এমন এক সর্বনাশ মিথ্যাচারিতার জন্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে সমস্ত রকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবি রাখছি। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে এবং তাদের প্রধান সিস্টার নির্মলাকে প্রতারণা করার জন্য ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৪২০ ধারায় অভিযুক্ত করা

উচিত। এছাড়া ওদের 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ' (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা উচিত। এই ধারা মতে কেউ যদি অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার পক্ষে কোনও ধরনের বক্তব্য রাখেন বা প্রচার করেন, তবে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী, মাদারের অলৌকিক ক্ষমতা বিশ শতকের 'সেরা বুজরুকি'।

বক্তব্য শেষ করি একটা সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। আমাদের হাজির করা একজন অন্ধকে ভ্যাটিকান বা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে? পারলে আমাদের সমিতি অলৌকিক বিরোধী সমস্ত রকম প্রচার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। প্রণামী হিসেবে তুলে দেবে কুড়ি লক্ষ টাকা।

বিবিসি এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মতামত চায়। ওরা বলে, এ'বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। ভ্যাটিকানও চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে নীরবতা পালন করে।

এই সাক্ষাৎকার বিবিসি সারা দিন ধরে প্রচার করেছে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষায়। খরবটা গোটা পৃথিবীকে তোলপাড় করে দেয়। সংবাদসার বিসিসি-র ওয়েবসাইটে 'টপ টেন'-এ জায়গা দখল করে রেখেছিল বেশ কয়েক দিন।

BBC NEWS | World | South Asia | Mother Teresa's 'miaracle' challanged

Friday, 4 October, 2002, 11:59 GMT 12:59 UK

Mother Teresa's 'miracle' Challenged

By Subir Bhaumik

BBC correspondent in Calcutta

A miracle attributed to Mother Teresa has been Challenged in the Indian state of West Bengal.

A rationalist group in the state says a woman reportedly cured of **cancer** by placing a photograph of the nun on her stomach had subsequently received treatment in government hospitals.

Doctors who treated the woman, Monica Besra, say she was in pain several yeares after Mother Teresa died.

Vatican Officials earlier this week approved the miracle, and said this would strengthen her case for sainthood.

For several years Prabir Ghosh, general secretary of the Indian Rationalist and Scientifc Thinking Association, has challenged Hindu "godmen" and exposed their miracles as what he describes as cheap hypnotic tricks better performed by magicians.

Now he is challenging the claim of the Missionaries of Charity, who say a photograph of their founder, Mother Teresa, when placed over the stomach of 30-years-old Monical Besra, cured her of a tumour.

Undue Publicity

Mr Ghosh described the claim as bogus and typical of the process of cult building in all religious orders.

He says Mother Teresa could be considered for sainthood for her services to the poor, adding that it was an insult to her lagacy to bestow her sainthood on false claims of miracles.

Mr Ghosh says several doctors have reported to the west Bengal government that Ms Besra continued to receive treatment long after Mother Teresa died.

He said Ms Besra was admitted to hospital with chronic headaches and severe abdominal pain at least a year after Mother Teresa's death.

The doctors say that story of the miracle gets what they describle as undue publicity; illiterate and poor villagers may stop taking medical treatment for their maladies and seek miracle cures.

Mr. Ghosh says his association, which seeks to promote rational and scientific thinking in India, would expect the West Bengal Government to take legal action against the Missionaries of Charity.

When contacted, the Missionaries of Charity did not react to the charge.

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ইংরেজি করা হয়েছে 'Indian Rationals and Scientific Thinking Association'। আবার অনেকে আমাদের সমিতি ইংরেজিতে নাম দিয়েছেন, 'Science and Rationalists'

Association of India'। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় বাংলা অর্থ বজায় রেখে অন্য নাম দেওয়া হচ্ছে। তা হোক। 'গোলাপ'-কে যে নামেই ডাকুক, সে 'গোলাপ'ই।

৫ অক্টোবর, শনিবার, ২০০২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মিঠুন চক্রবর্তীর দৈনিক পত্রিকা 'খবরের কাগজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল একটি বড়ো লেখা। শিরোনাম :—

কাউকে কোনওভাবে ছোট করা বা আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু মাদারের সেন্টহুডকে কেন্দ্র করে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিবেদন। একবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক শক্তি বনাম বিজ্ঞানের যুক্তির লড়াই যদি আবার জমে ওঠে মন্দ কি? তবুও আবার বলে রাখি, এই বিতর্কের উদ্দেশ্য শুধু সঠিক কারণ অনুসন্ধান। কোনওমতেই কাউকে আঘাত করা নয়।

যুক্তিবাদীর কলমে

ভিত্তিহীন প্রচার করে সেন্টহুডে লাভ কী?

প্রবীর ঘোষ

মাদার টেরিজার কোনও অলৌকিক শক্তি ছিল না। সুতরাং সেই 'অলৌকিক' শক্তি দিয়ে রোগ সারানোর কোনও প্রশ্নই নেই। এখন সেন্টহুড দেবার জন্য মাদারের নামে যেসব প্রচার চলছে তা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক এবং ভিত্তিহীন। আমরা বিজ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে কড়াভাবে এর মোকাবিলা করেছি। যে মহিলার টিউমার মাদার সারিয়ে দিয়েছেন বলে খবর হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। এরকম কোনও ঘটনাই বাস্তবে ঘটেনি। বালুরঘাট হাসপাতালে এখনও ভর্তি রয়েছেন মণিকা বেসরা। মণিকার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনই রয়েছেন। আর সবচেয়ে অবাক লাগছে কাউকে সেন্ট করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতায় পরিচয় দিতে হবে কেন? ব্যাপারটা একেবারে বোকা বোকা। কারণ অলৌকিক বলে কিছু নেই। তাই সেন্টহুড দেবার ক্ষেত্রে অলৌকিক মানদণ্ড একেবারেই ভিত্তিহীন। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে শুক্রবার বি বি সি-র মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি পোপকে।

মণিকা বেসরার ঘটনাটি জানাজানি হবার পর বিবিসি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমরা পোপের উদ্দেশে বলেছি, আপনি কী একজন অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারবেন? বা মাদারের ছবি কোনও অন্ধ মানুষের চোখে বসিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে পারবেন? যদি তা পারেন তবে সমিতির তরফ থেকে নগদ ২০ লক্ষ টাকা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ইতিমধ্যেই বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে সমস্ত বর্ণনা সবিস্তারে জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। আমাদের প্রশ্ন স্বাস্থ্যদপ্তরকে, যারা এই ষড়যন্ত্র করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশানেবল অ্যাটভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪-তে বলা হয়েছে, কেউ যদি অলৌকিক ভাবে রোগ সারানোর কথা ঘোষণা করেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিন মাসের জেল হবে। আমাদের ইতিমধ্যেই আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের বিশদ কথা চলছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের শিলিগুড়ি শাখাকেও তথ্যাবলী দেবার জন্যে। তাই মিশনারিজ অব চ্যারিটি-র বিরুদ্ধে আমরা কড়া শাস্তির দাবি তুলেছি। কারণ এইরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভিত্তিহীন খবর বারবার প্রকাশ পেলে সাধারণ মানুষ ডাক্তারদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেবে।

মাদার টেরিজাকে, কেউ যদি সেন্টহুড দিতে চায় আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অযথা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে খবর চালাবার চেষ্টা করলে আমরা ছেড়ে দেব না। যেখানে বিজ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব নেই তা আমরা মানি না। সবচেয়ে বড় কথা, মানবতার কারণে আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে। মিথ্যে, আজগুবি, কল্পকাহিনি রটিয়ে কাউকে মহান বানানোর চেষ্টা করলে যুক্তিবাদী সমিতি ছেড়ে কথা বলবে না। এই প্রতিবেদন পড়ে অনেকেই হয়তো ভাববেন আমরা মাদারের সম্মানহানি করতে চাইছি। কিন্তু আদৌ ব্যাপারটা তা নয়। মাদার টেরিজা আমাদের শত্রু নন। কিন্তু তাঁর অলৌকিক কাহিনির কথা বলে যখন কোটি কোটি মানুষকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা চলছে তখন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। আবারও বলেছি, গোটা বিশ্বে অলৌকিক বলে কিছু ছিল না, নেই এবং আগামী দিনেও থাকবে না। মুমূর্ষু রোগীদের প্রতি তাই আমাদের আবেদন, এখনও সময় আছে। ডাক্তার দেখান। সুচিকিৎসা করুন, রোগ সেরে যাবে। মাদারের 'অলৌকিক' হাতের ছোঁয়ার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজের অকাল মৃত্যু ডেকে আনবেন না।

৬ অক্টোবর, রবিবার, ২০০২। 'খবরের কাগজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো ঃ

মাদার হাউস
সতর্ক
থমথমে

সিগনাস নিউজ ব্যুরো : মাদার টেরিজার অলৌকিক প্রসঙ্গে বিতর্ক জমে ওঠায় অত্যন্ত সতর্কতা রক্ষা করে চলছে মিশনারি অব চ্যারিটিজ। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আপাতত অনেকটাই রক্ষণাত্মক সিস্টাররা। তাঁরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা বজায় রেখে চলেছেন। পাশাপাশি ভ্যাটিকান সিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। শনিবার সকালে মাদার হাউসে গিয়ে দেখা যায় সেখানকার প্রায় সবকটি দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পরিচয় খতিয়ে দেখার পর তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। আপাতত সিস্টার নির্মলা চারদিন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। কারণ তিনি বিশেষ প্রার্থনায় মগ্ন রয়েছেন। অন্য এক সিস্টার এগিয়ে এসে জানালেন যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জের জবাব তাঁরা দেবেন। তাঁর কথায়, বিশ্বাসে কী না হয়। মাদারের মধ্যে যে অলৌকিকত্ব ছিল তা তাঁরা বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করার যাবতীয় চেষ্টাকে প্রতিরোধ করা হবে বলে ওই সিস্টার জানান।

৭ অক্টোবর, সোমবার, ২০০২। দিল্লির দৈনিক পত্রিকা 'Today'-র প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু একটাই খবর, 'Mothers Miracle Challenged' লাল বক্স করে লেখা 'Exclusive' India Today গোষ্ঠীর দৈনিক 'Today'। রাজধানী দিল্লিতে বোম ফাটল। Today-ওয়েব সাইটেও খবরটা বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হল।

৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০২। স্টার নিউজ চ্যানেল সারাদিন আমরা। কাশ্মীরে ভোট আর তা নিয়ে ব্যাপক হিংসা ও গন্ডগোল যখন প্রায় পুরো সময় খেয়ে নিচ্ছে, তখন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়ে উঠেছে, মাদার টেরিজাকে সেন্ট বানাবার জন্য ভ্যাটিকানের মিথ্যচারিতার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির তীব্র প্রতিবাদ।

একই দিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুটি সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা এ এফ পি এবং রয়টার খবরটা ছাড়ল। ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মিথ্যাচারিতা বে-আব্রু করার খবর। তাদের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি—সবই ওদের সরবরাহ করা খবরে স্থান পেল। এ এফ পি এবং রয়টার আরও জানাল, মাদারের মিরাকেল বিষয়ে যুক্তিবাদী সমিতির তদন্ত

Vol. 1 Issue 114 Monday 7 October 2002 Pages 16 Rs 2

Today
> get with it
The Capital's Afternoon Newspaper

AYESHAAAAA!
Our party girl turns a model
>p.16



net savvy
INTERNET ACCESS FROM
TATA TELESERVICES
THE COMPLETE TELECOM COMPANY



Shah reign continues
>p.13

Ronaldo scores in 50 seconds
>p.10





MOTHER'S MIRACLE CHALLENGED

Mother Teresa is one step closer to becoming a saint after the Vatican recognised that a woman was cured of a tumour by Mother's miracle. Rationalists say it was medicine not miracle.

Suman K. Chakrabarti
KOLKATA. The "miracle" that took Mother Teresa closer to sainthood last week has been challenged by one of India's most well-known rationalist groups.

After years of challenging Hindu "godmen" and exposing their 'miracles' as cheap hypnotic tricks better performed by magicians, Prabir Ghosh, general secretary of the Science and Rationalists Association of India, has challenged the miracle claim.

EXCLUSIVE

The Missionaries of Charity say that a tribal woman in northern Bengal was cured from tumour after keeping a photograph of the nun on her stomach.

The miracle was discussed at a closed-door meeting at the Vatican last Tuesday in which the doctors explained it to cardinals, bishops and priests who are members of the saint-making department known as the Congregation for the Causes of Saints, that they have no medical explanation for the healing of a 30-year-old tribesman Jitendra Biruwa, who was suffering from a tumour.

A second miracle attributed to Mother Teresa would be needed after the beatification for her to be declared a saint.

Ghosh says that their investigators revealed that Biruwa had subsequently received treatment

—Turn to Page 2



রিপোর্ট এবং চ্যালেঞ্জের খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কাছে। ওরা সব শোনার পর এ বিষয় কোনও মন্তব্য করতে বা বক্তব্য রাখতে রাজি হয়নি।

রাতে সুবোধ সূত্রধরের সঙ্গে কথা হল। সুবোধ জানালেন। মণিকা বেসরার দিদি কাঞ্চনের সঙ্গে আজই কথা হল, কাঞ্চন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির গঙ্গারামপুর হোলি ক্রস হাসপাতালের নার্স ছিলেন। কাঞ্চন-ই মণিকাকে বালুরঘাট হাসপাতালে ও শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে কাঞ্চনের হোলি ক্রসের নার্সের চাকরিটা গেছে। আপাতত কাঞ্চন থাকেন বুনিয়াদপুরের কামারডাঙায়। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কাজটা মিশনারিজদের-ই দেওয়া। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি থেকে কয়েকজন এসেছিলেন দিন কয়েক আগে। কাঞ্চনকে পই-পই করে পাখি পড়াবার মতো পড়িয়ে গেছেন, হঠাৎ কোনও সাংবাদিক ওঁর বাড়িতে এসে পড়লে কী বলতে হবে। বলতে হবে—মাদারের লকেট পেটে রেখে মণিকা প্রার্থনা করছিল একটা রাতে। সেই রাতে হঠাৎই টিউমারটা অদৃশ্য হয়ে যায়। কাঞ্চন একথাও বলেছেন, যাঁরা মণিকার চিকিৎসা করেছিলেন, সেই ডাক্তাররা কেউই বলতে রাজি হচ্ছেন না যে মাদারের আশীর্বাদে রোগ সেরেছে। তাই মিশনারিজের সিস্টার ও নানরা ডাক্তারদের ওপর রেগে আছেন। কাঞ্চন যদি উলটোপালটা কিছু বলে ফেলেন, তাই তাঁকে নার্সের চাকরি থেকে সরিয়ে সাংবাদিকের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছেন, বলে মণিকাও মনে করেন। মণিকা এ'সবই সুবোধকে বলেছেন দীর্ঘ-বছরের পরিচয়ের সুবাদে।

৯ অক্টোবর, বুধবার ২০০২। পত্রিকার নাম আনন্দবাজার। প্রথম পৃষ্ঠার খবর **'টেরিজার মহিমা, নাকি ওষুধ, মণিকা নিরাময় কীসে'।**

খবরটির একাংশে বলা হয়েছে, "মণিকার দিদি আপাতত থাকেন বুনিয়াদপুরের কামারডাঙার বাড়িতে প্রথামিক স্কুলশিক্ষিকা কাঞ্চন জানিয়েছেন, চিকিৎসার পরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। **পাতিরাম মিশনারিজ অফ চ্যারিটি থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, মাদারের লকেট ছুঁইয়ে প্রার্থনার সময় অলৌকিক ভাবে মণিকার পেটের টিউমার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এবং মাদারের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে যেন তাঁরা মনে রাখেন।"**

এ'দিনের সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক 'দ্য এশিয়ান এজ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল একটি খবর **'যুক্তিবাদীদের বিদ্রুপের লক্ষ্য মাদারের মিরাকেল'**। খবরটি এক জায়গায় বলা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ-দে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে ২০০০ সালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীমতী বেসরা সুস্থ হয়েছেন মেডিকেল ট্রিটমেন্টে।

খবরটি আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, ঃ মিস্টার ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, যে ডাঃ ভট্টাচার্য সার্টিফাই করেছেন মণিকা বেসরা এমন অসুখে ভুগছিলেন যা সারা সম্ভব নয় এবং তিনি সুস্থ হয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা—সেই ডাঃ ভট্টাচার্যের খোঁজ এখন মিডিয়াগুলো পাচ্ছে না কেন?

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু খ্রিস্টানব্রাদারহুডের বিশ্বায়নের পরিকল্পনার কারিগররা তো আর ভারতীয় আঁতেল মার্কা জোকার নন, সত্যিই মেধা-বুদ্ধির মিশ্রণ। ওরা কেন ডাঃ ভট্টাচার্যকে নিউজ মিডিয়ার সামনে হাজির করবে? এতো সূর্য-চন্দ্রের অস্তিত্বের মতোই সত্যি যে, তোতাপাখি ডাক্তারবাবুটিকে নিউজ মিডিয়া হাতের সামনে পেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন এসে আছড়ে পড়তে থাকবে—কবে প্রথম মণিকা আপনার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলেন? কোথায় মণিকা আপনাকে দেখান? শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ হাসপাতালে? না, কোনও চেম্বারে? আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন মণিকার জরায়ুতে যে টিউমার হয়েছে, তা ক্যানসার, অর্থাৎ কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি? নিশ্চয়ই বায়প্সি টেস্ট করাবার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন? কোন্ প্যাথলজিকাল ল্যাব থেকে বায়পসি টেস্ট করা হয়েছিল? একটাই ল্যাব থেকে টেস্ট করা হয়েছিল? নাকি একাধিক ল্যাব থেকে? সেই বায়প্সি রিপোর্ট কোথায়? প্যাথলজিকাল ল্যাবের রিপোর্টগুলো সঙ্গে এখন বহু ক্ষেত্রেই সারে, এ সত্য ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অরগানাইজেশন থেকে ক্যানসারের চিকিৎসকরা মানেন। আপনার কেন মনে হল, মণিকার ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসায় সেরে ওঠা সম্ভব নয়? এই মত কী কোনও ক্যানসার বিশেষজ্ঞের? সেই বিশেষজ্ঞের নাম ঠিকানা কী? মণিকার কী কেমোথেরাপি চলছিল? কোন্ হসপিটালে কেমো চলছিল? আপনি কি কেমো নিতে কোনও ডাক্তারের কাছে মণিকাকে রেফার করেছিলেন? না করে থাকলে কেন করেননি? আপনি কী জানতেন যে, কেমোর প্রয়োজন নেই, মাদারের মিরাকেলেই মণিকা সেরে উঠবেন? যে ডাক্তাররা মণিকার চিকিৎসা করেছেন, আপনি কি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? মণিকার কি টিবি হয়েছিল? টিবি-র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে জরায়ুতে এমন একটা দলা হওয়া কি সম্ভব? টিবি সারলে কি দলাও সেরে যেতে পারে? কী কী কারণে আপনার মনে হল, মণিকা ক্যানসারে ভুগছেন?

এমনই হাজারো জরুরি প্রশ্নের ঝড়ে ডাঃ ভট্টাচার্যকে মুখ থুবড়ে পড়বেন-ই—এটা বুঝেই কী ভ্যাটিকানের এই লুকোচুরি?

আবারও একটা কথা মনে করিয়ে দিই—শুরুতে ভ্যাটিকান জানিয়ে ছিল মণিকা ক্যানসার রোগী। ২০ অক্টোবর ২০০২-এর রোজনামচায় সেই প্রসঙ্গে আসব।



THE ASIAN AGE

14th Asian Games BUSAN 2002

GOLD RUSH

US sniper strikes again, injures boy, 13

EDIT PAGE

Intellectual shop-lifting

By H.Y. Sharada Prasad

Kolkata Wednesday 9 October 2002 — 10 Pages — Rs 2.50

Vol. 7 No. 120

Rationalists target Mother's miracle

By Pawwez Hafeez

Kolkata, Oct. 8: The "miraculous" cure of an abdominal tumour of a woman, on the basis of which the Vatican is poised to accord sainthood to Mother Teresa, has been challenged by some doctors, a rationalist and a former state health minister.

The controversies of the sceptics is that Monica Besra, a resident of Nakir village in south Dinajpur district who was suffering from tubercular meningitis, was cured following prolonged treatment at several hospitals, including Balurghat District Hospital, Malda Hospital and the North Bengal Medical College and Hospital. She was cured by the doctors of these hospitals. Calling her cure a miracle of Mother Teresa, whose photograph is supposed to have healed her, is a hoax and seeking sainthood for her on the basis of this so-called miracle is a fraud," Prabir Ghosh of the Science and Rationalist Association of India said on Tuesday.

Mr Ghosh clarified that he held Mother Teresa in high esteem and have no problem if she is called a saint for her selfless service to the wretched and destitute of the world. But I feel that her canonisation on a fraudulent miracle will be a disservice to the great soul," he said.

Giving details of Ms Besra's malady and its treatment, Mr Ghosh said she had been suffering from a curable disease

■ Turn to Page 2

SPOTLIGHT

■ Continued from Page 1

"The doctors at the Balurghat hospital — Dr Tarun Biswas, Dr Ranjan Mustafi and Dr Ashish Chakrabarty — who treated Ms Besra gave her anti-tubercular therapy to cure the ovarian tumour. She was released from the hospital in June 1998," he said.

Later she also received treatment at the North Bengal Medical College and Hospital. Nine months later another ultrasonograph showed that her tumour had vanished. This was possible because of the prolonged treatment, Dr Mustafi is reported to have said. Former state health minister Partha De echoed Dr Mustafi's statement.

In fact, Mr De had informed the Missionaries of Charity in 2000 that Ms Besra was cured by medical treatment. Mr Ghosh has also questioned the bona fides of Dr Bhattacharya, who is reported to have certified that Ms Besra was suffering from an incurable disease and that she was healed by a miracle. "Why were the views of the doctors who treated Ms Besra not taken into consideration? Who is this Dr Bhattacharya and why is he not available to the media," Mr Ghosh asked.

Even Ms Besra is persistently refusing to talk to the media.

When contacted for its version, the Missionaries of Charity refused comment. When it was pointed out that his association was hurting the sentiments of thousands of Mother Teresa's admirers by trying to question the authenticity of her miraculous power, Mr Ghosh claimed that he was receiving support from many people who also thought that her greatness did not depend on whether she was declared a saint or not.

'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র খবরে এবার আমরা। সর্বভারতীয় খবরে দিনভর আমরা। অনেকটা সময় ধরে। আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের চ্যালেঞ্জ ভাষা পেল। ছাপার অক্ষর ছেড়ে এবার শব্দ হয়ে। পানের দোকান থেকে রান্নাঘর, খেত থেকে বস্তি সর্বত্র ভাসছে আমাদের কথা। মণিকার বেসরার অসুখ যে মাদারের মিরাকেলে সারেনি সে কথা। খবরের কাগজ থেকে দূরে থাকা কোটি কোটি মানুষ জানলেন, ভ্যাটিকানের শতাব্দীসেরা প্রতারণার কথা, আমাদের চ্যালেঞ্জের কথা।

১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০২। বিশ্বের অন্যতম নামী ও সম্ভ্রান্ত সাপ্তাহিক 'টাইম' (TIME)। আজ 'টাইম' প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদ কাহিনি—মাদার টেরিজার মিরাকেল বিতর্ক। একই সঙ্গে 'টাইম'-এর ওয়েবসাইটে জ্বলজ্বল করছে 'সেন্ট' বিতর্ক। উপ-শিরোনামে লেখা আছে "Monica says she is proof of a miracle by the late nun; her husband begs to differ"। বাংলা করলে দাঁড়ায়, "মণিকা বলেছেন তিনি মৃত নানের (মাদারের) অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ; ওঁর স্বামীর ভিন্ন মত"।

ভিতরে রয়েছে মণিকার স্বামী সেলকুর কথা, "My wife was cured by the doctors and not by any miracle"; অর্থাৎ "আমার স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলেছেন ডাক্তাররা, অলৌকিক নয়।" সেলকুর বক্তব্য হিসেবে আরও লেখা আছে, "This miracle is a hoax." অর্থাৎ "এই মিরাকেল একটা ধোঁকা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই কথাই জানিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য সুবোধ। কিন্তু তারপর দ্রুত পালটে গেছে গোটা পরিস্থিতিটা। এখন ভ্যাটিকান, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, খ্রিস্টান ব্রাদারহুডের পৃষ্ঠপোষকরা নিশ্চয়ই মণিকা, সেলকুর কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ৪ অক্টোবর বিবিসি যে বোমা ফাটিয়েছে; তারপর সেলকুর মুখে এমন কথা! সেলকুর এই সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই আমার সাক্ষাৎকার প্রচারের দু-এক দিনেক মধ্যেই নেওয়া। মিশনারিজদের ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই নেওয়া।

বিবিসি, এ এফ পি, রয়টার, টাইম এবং আরও সব নিউজ মিডিয়াগুলো এ কী আরম্ভ করেছে? সব্বাই মিলে যুক্তিবাদী সমিতির অনুসন্ধান রিপোর্ট, প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে ভ্যাটিকানকে লক্ষ্য করে। ভ্যাটিকানের অবস্থা এখন বোমা-বিধ্বস্ত পার্ল হারবার-এর মতো।

TIME-এর খবরের অনেকটা জুড়েই আমরা আছি। হ্যাঁ খবরের অনেকটা জুড়েই আমরা আছি। টাইম-এর ওয়েব সাইট থেকে একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"The vacuum created by that silence is being filled by conspiracy theorists who see the Missionaries of Charity



TIME ASIA

· Get a FREE Gift from TIME
· Send the Gift of TIME
· Magazine Customer Service



SPECIAL ISSUE
The New Bollywood
The future of film



Home
Asia News
Pacific News
Technology
Business
Arts
Travel
Global Adviser
Special Reports
Photos

Other News:
• U.S.
• World
• Asia
• Pacific
• Europe
• Middle East
• Africa
• Latin America

Mobile Edition
E-mail Services
Media Kit
Customer Service
• Subscribe
• Renew
• Change Address
• Give a Gift



CLICK HERE



TIME

SEARCH | All of TIMEasia.com | > Advanced Search

FROM THE MAGAZINE

October 21, 2002 / VOL. 160 NO. 15
LETTER FROM CALCUTTA

What's Mother Teresa Got to Do with It?

Monica says she's proof of a miracle by the late nun; her husband begs to differ



DEVJYOTI GHOSH FOR TIME

Seiku Murmu and Monica Besra, with a portrait of the prospective saint

Print E-Mail
>Subscribe to TIME

Domestic bliss has fled the household of Seiku Murmu and his wife Monica Besra—and it's all Mother Teresa's fault. Monica is a celebrity in the small village of Dangram, 460 miles northeast of Calcutta, because she is the beneficiary of what many Catholics believe is the first posthumous miracle of Mother Teresa, founder of the Missionaries of Charity. On Sept. 5, 1998, the first anniversary of the nun's death, Monica was suffering abdominal pain caused, she believed, by a tumor. But the purported tumor vanished when Monica applied a medallion with an image of the late Albanian nun to the site of her pain. In August 2001, Monica's miracle was supplied to the Vatican as part of the fast-tracking of Mother Teresa's canonization. Two weeks ago, the Vatican recognized the 1998 miracle, beginning the process of Mother Teresa's beatification, a major step toward sainthood.

All this irritates Monica's husband Seiku. "It is much ado about nothing," he says. "My wife was cured by the doctors and not by any miracle." He is peeved at his wife's fame, in part because the press is constantly at his doorstep. "I want to stop this jamboree, people coming with cameras every few hours or so." He concedes that the locket is part of the story of Monica's ordeal but says no one should suppose there was a cause-and-effect relationship between it and the cure. "My wife did feel less pain one night when she used the locket, but her pain had been coming and going. Then she went to the doctors, and they cured her." Monica still believes in the miracle but admits that she did go to see doctors at the state-run



The "miraculous" cure of an abdominal tumour of a woman, on the basis of which the Vatican is poised to accord sainthood to Mother Teresa, has been challenged by some doctors, a rationalist and a former state health minister. The contention of the sceptics is that Monica Besra, a resident of Nakor village in south Dinjapur district of West Bengal in India who was suffering from tubercular meningitis, was cured following prolonged treatment at several hospitals, including Balurghat District Hospital, Malda Hospital and the North Bengal Medical College and Hospital. "She was cured by the doctors of these hospitals. Calling her cure a miracle of Mother Teresa, whose photograph is supposed to have healed her, is a hoax and seeking sainthood for her on the basis of this so-called miracle is a fraud," Prabir Ghosh of the Science and Rationalist Association of India said on Tuesday. Saying that he had great admiration for Mother Teresa, Ghosh said that her greatness did not depend on whether she was declared a saint or not.

overeagerly producing proof that their founder is within the gates of heaven That chorus is amplified by vociferous debunkers, among them Prabir Ghosh, head of the Science and Rationalist Association of India. Ghosh, who is based in Calcutta, has deflated the claims of many of India's self-proclaimed Hindu holy men and holds that no miracle should be exempt from scrutiny. He says he has no complaint "if she is declared a saint for all the great work she had done among poor people, But, adds, "she is not capable of any miracle. It is indeed an insult to Mother Teresa to make her sainthood dependent on some stupid miracles. "Ghosh tells Time that he will shut down his association and turn over its 2 million rupees ($40,000) to the Catholic order if the sisters will put the medallion to test and have it cure another tumor."

এরপর একটা মজার ছত্রিশ-ভাজা মার্কা গপ্পো শোনাই। 'টাইম' ম্যাগাজিনের এই লেখাটির রেফারেন্স টেনেছে অনেক ভারতীয় পত্রিকা-ই। স্বভাবতই তারা আমাদের সমিতির বক্তব্যের উল্লেখ করেছে। টাইম ম্যাগাজিনকে 'কোট' করেও যুক্তিবাদী সমিতির নামটা বেমালুম ভুলে থেকেছে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলো।

বিবিসি, এ এফ পি, রয়টার, টাইম ইত্যাদি মহাশক্তিধর নিউজ মিডিয়াগুলো যখন মাদারের মিরাকেল নিয়ে যুক্তিবাদী সমিতিকে হাতিয়ার করে প্রশ্নের মেরুঝড় তুলেছে, তখন শহর কলকাতার পত্রিকাগুলো আশ্চর্য রকম নিস্তরঙ্গ। এমন অদ্ভুত আচরণে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের কেউ অবাক কেউ বা মজার খোরাক পেলেন, কেউ বা বললেন—'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'।

১৮ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'আজকাল'-এর এডিটরিয়ল পেজে ছাপা হল আমার একটি লেখা—'সফেদ ঝুট এবং কিছু কথা'। সেখানে গোড়া থেকেই 'গত শতকের সেরা বুজরুকি' চিহ্নিত করেই মাদার-মিরাকেলের নেপথ্য কাহিনি হাজির করেছি।

২০ অক্টোবর, রবিবার, ২০০২। পত্রিকার নাম-আনন্দবাজার। চার কলাম জুড়ে খবর, 'এখনই টেরিজা-মহিমায় আচ্ছন্ন ভ্যাটিকান'। ভ্যাটিকান থেকে খবর পাঠিয়েছেন শ্রাবণী বসু। তাঁর কথায়, **"ভ্যাটিকান সরকারি ভাবে তাঁকে সন্ত ঘোষণা করবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়। তার আগে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শেষ ধাপ (বিয়েটিফিকেশন) সম্পন্ন হবে আগামী বসন্তে, ভ্যাটিকানের তরফে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এখনও পাঁচ-ছ'মাস দেরি।"**

এবার কালীপুজো!



লক্ষ্মী-কালী। উপরে উঠছে

প্রতিবেদন: যত বদলে যাচ্ছে ততই যাওয়া লক্ষ্মীমূর্তিকে কালী রূপে পুজো করলেন চেতলা রোডের বাসিন্দা দীপ ঘোষ। লক্ষ্মীপুজো করার পর রবিবার রাত থেকে নাকি ভালো হতে শুরু করেছিল মূর্তিটি। লক্ষ্মীর এই কালীরূপ ধারণের পর মুখে মুখে রটে যাওয়ায় এখন রীতিমতো ভিড় জমছে চেতলা রোড এলাকার এই বাড়িটি। ভরে উঠছে দর্শনার্থীর খাতা। এদিকে শুক্রবার ঘটিয়া টালা উপাজনের এই কিংবদন্তি প্রতিবেশী মন্ত্রণাবার পথে নেমে পড়েছেন মূর্তিশিল্পী প্রতীম ঘোষ। তিনি এদিন ডানাদুলে দিয়ে মূর্তিটিও পরীক্ষা করেন। এ ছাড়া মানবতাবাদী ও মূর্তিশিল্পী ক্ষেত্রের সদস্যরাও এই মূর্তিকে বিকৃত পূর্ণতা করেন। রঙিন মাথের ব্যবসায়ী দীপ ঘোষ, যাঁর বাড়িতে এই মূর্তির পুজো হচ্ছে, তিনি মঙ্গলবার জানান, শুক্রবার বেহালার ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে ২৪ টাকা দিয়ে মূর্তিটি তিনি কিনেছিলেন। স্থানীয় পুরোহিত তনু চক্রবর্তী রবিবার সন্ধ্যায় পুজো করেছিলেন ওই মূর্তির। ওই রাতেই দীপ ঘোষ নাকি মূর্তিটিকে কালো হয়ে যেতে দেখেছেন। পরের দিন সকালে তিনি ডেকে পাঠান পুরোহিতকে। সোমবার সকালে আর একবার পুজো হয় মূর্তিটির। মুখে-আলতা মাখার পর মূর্তিটির ওজন নিয়েছে ষষ্ঠীতলা পড়ে। ভিড় জমতে শুরু করে ৮৫ চেতলা রোডের ওই বাড়ির সামনে। ভিড় সামলাতে নেমে পড়েন এলাকার কিশোর-যুবকরা। ভিড়ের মধ্যে ভাল মিশিয়ে জমতে থাকে এলাকার ভাগ্য। আগামী কালী পুজো পর্যন্ত এই দর্শন চলবে। দীপবাবু জানান, ওই দিন তিনি কালী পুজো করবেন এই লক্ষ্মীমূর্তি দিয়েই। তারপর এক বছরের জন্য মূর্তিশিল্পী প্রতীম ঘোষ জানান, মূর্তিটির মা ষষ্ঠী ও গণেশ কালো হয়ে গেছে। তাঁর মতে, সিলভার নাইট্রেটের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে মূর্তিতে। তিনি মূর্তিটির কালো জল থেকে কিছুটা নমুনা নিয়ে ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবে পরীক্ষা করানোর প্রস্তাব দেন। দীপ ঘোষ ও পাড়ার লোকজন প্রতীমবাবুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে মানবতাবাদী ও মূর্তিশিল্পী ক্ষেত্রের সদস্যরাও এই মূর্তিকির প্রতিবাদে সভা করেন।

আনন্দবাজার ভ্যাটিকানকে কোট করে জানাচ্ছে, ২০০৩-এর মার্চ-এপ্রিলে বিয়েটিফিকেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেন্টহুড দেওয়া হবে ২০০৩-এর মাঝামাঝি নাগাদ।

তাহলে ঝুলি থেকে শেষ পর্যন্ত বেড়াল বেরুল ২০০৩-এর অক্টোবরে। সেন্টহুড দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আঁট-ঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন পোপ। ২০ অক্টোবর ২০০২-এর আনন্দবাজার বলছে, "**.....এখনও পাঁচ-ছ'মাস দেরি। কিন্তু ভ্যাটিকান জুড়ে এখন থেকেই টেরিজাকে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।**" এত কিছুর পর কেন পিছোলেন পোপ?

আনন্দবাজার ২০ অক্টোবর ২০০৩। ঠিক একটি বছর পরের আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় বলছে, "পোপ নিজে চেয়েছিলেন টেরিজাকে সরাসরি সন্ত পদে আসীন করতে। কিন্তু তাঁর কার্ডিনালদের পরামর্শে বিয়েটিফিকেশনের জরুরি পর্বটি পালন করাই সাব্যস্ত হয়।"

আনন্দবাজার ২০০২ এবং ২০০৩ সালের ২০ অক্টোবর সংখ্যা দুটি থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে কোনও অসুবিধেই হয় না যে, ২০০২-এর শেষ দিকে মাদার টেরিজাকে সেন্ট বানাবার প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে 'বিয়েটিফিকেশন'-এর মধ্যেই নিজেদের আটকে রাখতে হয়েছে।

আটকে গেছে বিশ্ব মিডিয়ার প্রচণ্ড চাপে। আর এই চাপ সৃষ্টিতে মিডিয়াদের একমাত্র হাতিয়ার 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। না, আর কোনও সংগঠনের নাম বিশ্বের কোনও নিউজ মিডিয়াই উল্লেখ করেনি।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো—আজ চাপে পড়ে মণিকাকে টিউমার রোগী বলা হচ্ছে। এক বছর আগে ভ্যাটিকান প্রচার রেখেছিল, মণিকা ছিল ক্যানসার রোগী। এখন প্রচণ্ড চাপে পড়ে, ব্যাক ফুটে খেলছেন।

২০ অক্টোবর, রবিবার ২০০২। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রাবণী বসু ভ্যাটিকান সিটি থেকে রিপোর্ট দিচ্ছেন "পেটে টেরিজার মাদুলি ঝুলিয়ে রেখে যাঁর পাকস্থলীর ক্যানসার সেরে গিয়েছে বলে মেনে নিয়েছে ভ্যাটিকান, 'যুক্তিবাদীদের' সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও।"

২০০২-এর ৪ অক্টোবর ভ্যাটিকানের বুজরুকির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা প্রচার-প্রতিবাদ চ্যালেঞ্জ জানানো সত্ত্বেও কয়েকটা দিন ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেয়নি ভ্যাটিকান। তারপর চাপ বাড়তেই ডিগবাজি। ক্যানসার হল টিউমার।

তাহলে টিউমারের কোনও বায়পসি রিপোর্ট না দেখেই বালখিল্যের মতো "ক্যানসার সেরেছে, ক্যানসার সেরেছে" বলে শোরগোল তুলেছিলেন কেন পোপ? এ তো দেখছি, 'ছিল বিড়াল, হলো রুমাল'-এর গল্প।'

এই ভ্যাটিকানি ডিগবাজি শুধু ডিগবাজি নয়। যুক্তিবাদী সমিতির জয়।



লক্ষ্মীমূর্তিতেই হবে এবার কালীপুজো!

আনন্দবাজার ভ্যাটিকানকে কোট করে জানাচ্ছে, ২০০৩-এর মার্চ-এপ্রিলে বিয়েটিফিকেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেন্টহুড দেওয়া হবে ২০০৩-এর মাঝামাঝি নাগাদ।

তাহলে ঝুলি থেকে শেষ পর্যন্ত বেড়াল বেরুল ২০০৩-এর অক্টোবরে। সেন্টহুড দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আঁট-ঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন পোপ। ২০ অক্টোবর ২০০২-এর আনন্দবাজার বলছে, "....এখনও পাঁচ-ছ'মাস দেরি। কিন্তু ভ্যাটিকান জুড়ে এখন থেকেই টেরিজাকে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।" এত কিছুর পর কেন পিছোলেন পোপ?

আনন্দবাজার ২০ অক্টোবর ২০০৩। ঠিক একটি বছর পরের আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় বলছে, "পোপ নিজে চেয়েছিলেন টেরিজাকে সরাসরি সন্ত পদে আসীন করতে। কিন্তু তাঁর কার্ডিনালদের পরামর্শে বিয়েটিফিকেশনের জরুরি পর্বটি পালন করাই সাব্যস্ত হয়।"

আনন্দবাজার ২০০২ এবং ২০০৩ সালের ২০ অক্টোবর সংখ্যা দুটি থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে কোনও অসুবিধেই হয় না যে, ২০০২-এর শেষ দিকে মাদার টেরিজাকে সেন্ট বানাবার প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে 'বিয়েটিফিকেশন'-এর মধ্যেই নিজেদের আটকে রাখতে হয়েছে।

আটকে গেছে বিশ্ব মিডিয়ার প্রচণ্ড চাপে। আর এই চাপ সৃষ্টিতে মিডিয়াদের একমাত্র হাতিয়ার 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। না, আর কোনও সংগঠনের নাম বিশ্বের কোনও নিউজ মিডিয়াই উল্লেখ করেনি।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো—আজ চাপে পড়ে মণিকাকে টিউমার রোগী বলা হচ্ছে। এক বছর আগে ভ্যাটিকান প্রচার রেখেছিল, মণিকা ছিল ক্যানসার রোগী। এখন প্রচণ্ড চাপে পড়ে, ব্যাক ফুটে খেলছেন।

২০ অক্টোবর, রবিবার ২০০২। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রাবণী বসু ভ্যাটিকান সিটি থেকে রিপোর্ট দিচ্ছেন "পেটে টেরিজার মাদুলি ঝুলিয়ে রেখে যাঁর পাকস্থলীর ক্যানসার সেরে গিয়েছে বলে মেনে নিয়েছে ভ্যাটিকান, 'যুক্তিবাদীদের' সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও।"

২০০২-এর ৪ অক্টোবর ভ্যাটিকানের বুজরুকির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা প্রচার-প্রতিবাদ চ্যালেঞ্জ জানানো সত্ত্বেও কয়েকটা দিন ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেয়নি ভ্যাটিকান। তারপর চাপ বাড়তেই ডিগবাজি। ক্যানসার হল টিউমার।

তাহলে টিউমারের কোনও বায়পসি রিপোর্ট না দেখেই বালখিল্যের মতো "ক্যানসার সেরেছে, ক্যানসার সেরেছে" বলে শোরগোল তুলেছিলেন কেন পোপ? এ তো দেখছি, 'ছিল বিড়াল, হলো রুমাল'-এর গল্প।'

এই ভ্যাটিকানি ডিগবাজি শুধু ডিগবাজি নয়। যুক্তিবাদী সমিতির জয়।

যুক্তিবাদীদের জয়।

২৩ অক্টোবর বুধবার ২০০২। ভোরে ট্রেনে মালদায় পৌঁছলাম 'খোঁজখবর'-এর প্রতিনিধি হিসেবে। সঙ্গী খোঁজখবর-এর ফোটোগ্রাফার নন্দন। খোঁজখবর বাংলা ভাষার জনপ্রিয় অনুসন্ধানমূলক টিভি অনুষ্ঠান। এখানে আসার উদ্দেশ্য মণিকাকে নিয়ে সত্যানুসন্ধান চালানো এবং বিষয়টি ক্যামেরা বন্দি করা।

একটা ইন্টারেসটিং তথ্য পেশ করছি। গতকাল পর্যন্ত কোনও দেশি-বিদেশি টিভি কোম্পানি-ই দেখাতে পারেনি মণিকা, সেলকু এবং মণিকার ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার। দেখাতে পারেনি এমন কোনও' এক্সক্লুসিভ ইনসাইড স্টোরি' যাতে একটা ঋজু সত্য উঠে আসে। কথাটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। বিভিন্ন টিভি নিউজের সাংবাদিকরাই আমাকে বলেছেন, একাধিক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল হাত ছিল, এমন ভাবনা আসাটা অস্বাভাবিক নয়।

এমনই এক বিশ্রি পরিস্থিতিতে ছবি তুলে দেবার আমন্ত্রণ এল। তাও আমন্ত্রণ এল এতই দেরিতে, যখন মণিকা চলে গেছেন লৌহ যবনিকার অন্তরালে। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি মণিকাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেলেছে, হাজার মাথা খুঁড়েও নিউজ মিডিয়াগুলো তার হদিশ পাচ্ছে না।

ভ্যাটিকান কোথায় বুক চিতিয়ে মণিকা-সেলকু-ডাক্তার ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে বিতর্কের আগুনে জল ঢেলে দেবে, তা নয়, গোড়া থেকেই লুকোচুরি। ভ্যাটিকানের এই 'চুপ-গুপ' ব্যবহারই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—'ডালমে কুছ কালা হ্যায়।'

মালদা স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির মশালদিঘি শাখার দুই তরুণ চিকিৎসক নিরঞ্জন মণ্ডল ও মদনমোহন বিশ্বাস এবং গাজোল শাখার সুবোধ সূত্রধর।

গাড়ি নিয়ে প্রথমেই গেলাম ফুলের বাজারে। কয়েকটা সেরা ফুলের তোড়া কিনলাম। দৌড়লাম আলমপুর চার্চে। খবর আছে, এখানেই মণিকাকে গত ৪ অক্টোবর থেকে গোপনে রাখা হয়েছে।

বিশাল এলাকা নিয়ে আলমপুর চার্চ। বিশাল বাগানে আনাজপাতির চাষ। ছোট্ট একটা ডিসপেনশরি। গ্রামের মানুষরা লাইন দিয়ে ওষুধ নিচ্ছেন। ডাক্তার নেই চার্চের সিস্টাররাই রোগী দেখছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।

ইনচার্জ সিস্টারের দেখা মিলল। রোগী দেখছিলেন। একটি ফুলের তোড়া হাতে আমি ওঁর দিকে এগোলাম। আমার পোশাক ও শরীরী ভাষা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি ধর্মে খ্রিস্টান। গলায় ক্রস। মাথায় একটা টুপি মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি ঝুলিয়ে একটা ফুলের তোড়া তুলে দিলাম সিস্টারের হাতে। অনেক কথা হল। অনেক ছবি তোলা

হল। জানালাম, এসবই ক্যাসেট বন্দি করে রাখছি মাদারকে সেন্টহুড দেবার সময় দেখাবার পরিকল্পনা মাথায় রেখে।

সিস্টারের চোখে ও কথায় যে সতর্কতা শুরুতে দেখেছিলাম, তা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে আমার ব্যবহারে। দ্বিতীয় একটি ফুলের তোড়া আমার হাতেই ছিল। সেটা সিস্টারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, একটা অনুগ্রহ করে মণিকা বেসরা-র কাছে পৌঁছে দেবেন। বলবেন, পুলক গোমস দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সিস্টারের কাছ থেকে খবরটা পাওয়া গেল। গত পরশু মণিকা তাঁর গ্রামের বাড়ি নাকোড়-এ গেছেন। এ-খবরও মিলল, এতটা গোপনীয়তার কারণ 'র‍্যাশনালিষ্ট প্রবীর ঘোষ'।

বাসস্টপ দানগ্রাম। বাস আর ম্যাক্সি ট্যাক্সি দাঁড়ায়। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক, সব-ই এখানে আছে। ছোট্ট আধা-শহর। দশ-বিশটা গ্রামের মানুষ দানগ্রামেই বাজার করতে আসেন। নাকোড়বাসীদের দোকান-বাজার করতে এখানেই আসতে হয়। দীর্ঘ বছর ধরে মণিকা পরিবারের জন্য দোকান-বাজার করতে এখানেই আসেন। তবে গত মাসখানেক হল দানগ্রামে মণিকাকে কেউ দেখেননি। রাতারাতি ভ্যানিস।

দানগ্রামের প্রচুর মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। ওঁদের অনেকে নাকোড় গ্রামের মানুষ। নাকোড়। এখান থেকে দু'কিলোমিটারের পথ। ওঁদের সাক্ষাৎকার থেকে যে কয়েকটি কথা বা 'পয়েন্ট' উঠে এসেছে, সেগুলো হলো : (১) মণিকার বর সেলকু 'জন' খাটত। (২) যেটুকু চাষযোগ্য জমি ছিল, তা-ও মণিকার চিকিৎসার খরচ জোগাতে বন্ধক দিতে হয়েছে। (৩) মণিকার দিদি কাঞ্চন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। (৪) মণিকার রোগের দায়িত্ব কাঞ্চনের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন মণিকা ও সেলকু। (৫) কাঞ্চন-ই মণিকাকে নিয়ে যান বালুরঘাট হাসপাতাল ও শিলিগুড়ি হাসপাতালে। (৬) এর বছর খানেক পর কাঞ্চনের সঙ্গ ধরে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির গাড়ি নাকোড়ে ঢুকল। (৭) গরীব মণিকাদের বাড়ি ঘন ঘন মিশনারিজদের গাড়ি আসতে লাগলো। সে এক রহস্যময় আনাগোনা। গাড়ি থেকে সিস্টাররা নেমে সোজা ঢুকে যেতেন মণিকাদের ঘরে। ঘণ্টাখানেক থেকে বেরিয়ে আসতেন। (৮) ওদের আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে মণিকাদের অবস্থা ফিরে গেল। (৯) তারপর মণিকা, সেলকু খ্রিস্ট ধর্ম নিলেন। (১০) মণিকারা এখন আর হতদরিদ্র নন। যথেষ্ট অবস্থা ফিরেছে।

দানগ্রাম বাসস্টপে একটি জামা কাপড়ের দোকান 'আজকাল'। আজকালের মালিক নাকোড়ের বাসিন্দা। মণিকার আত্মীয়ও। তাঁর কথায়—মণিকারা ভূমিহীন কৃষক। খুব গরীব। বর সেলকু 'জন' খাটতো। এখন তাড়ি গিলে পড়ে থাকেন। কাজ করেন না। কাজ করার দরকার হয় না। সংসারে এখন কোনও অভাব নেই মিশনারিজের কৃপায়। প্রতি মাসেই আলমপুর চার্চ থেকে গাড়ি আসে মণিকার

বাড়িতে। মণিকাদের পরিবার 'আজকাল' থেকে ইচ্ছেমতো শাড়ি, ধুতি, জামা, কাপড় নিয়ে যায় ধারে। এই ধার মিটিয়ে দেয় আলমপুর চার্চ। মণিকার পরনের শাড়ি অবশ্য আলমপুর চার্চের সিস্টার নিজে পছন্দ করে কিনে দেন। কিনে দেন ব্লাউজের কাপড় বা ব্লাউজ। ও কী ব্যাগ নেবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেন সিস্টার। বছর দুয়েক আগেও মণিকা দু-পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটেই পাড়ি দিতেন। এখন ম্যাক্সি-ট্যাক্সিতে যাতায়াত করেন। মণিকার ছেলে-মেয়েরা আগে ঘরে বসে থাকত। এখন চারজনই মিশনারিজদের স্কুলে পড়ে, ওদের হোস্টেলে থাকে। সবই বিনে পয়সায়।

দানগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের মানুষগুলো একটি বিষয়ে এক মত, টেরিজার মিরাকেলে মণিকার রোগ সারাটা ডাহা মিথ্যে, টাকার বিনিময়ে মণিকাদের দিয়ে মিথ্যে বলানো হয়েছে।

নাকোড়েও দেখা মিলল না মণিকার। দেখা পেলাম সেলকুর। সেলকুর অতি পরিচিত সুবোধ আমাদের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও সেলকু ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে বিলকুল নারাজ। ক্যামেরায় ছবি হচ্ছে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলকু সতর্কতার সঙ্গে কিছু কিছু করে মুখ খুলতে লাগলেন। সেলকু স্বীকার করলেন কয়েকটি কথা। (১) মণিকার টিবি হয়েছিল। (২) পাঁচ রকমের ওষুধ দিয়েছিলেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা। (৩) ৯-১০ মাস ওষুধ খেয়েছিলেন মণিকা। (৪) পেটে এত বড় একটা টিউমার হয়েছিল যে, কুঁজো হয়ে হাটতেন মণিকা। (৫) দেখলে মনে হত ১০ মাসের পোয়াতি। (৬) মাদারের চার্চ-ই সংসার চালাচ্ছে। (৭) মাদারের কৃপাতেই মণিকার রোগ সেরেছে। মাদারের ছবি থেকে হঠাৎ একটা আলো এসে পেটে পড়তেই টিউমার ভ্যানিস। (৮) সেলকুর বন্ধক রাখা জমি ছাড়াতে আমার (এই লেখকের) আর্থিক দান গ্রহণ করতে এখন-ই অসুবিধে আছে। মাদারের চার্চের অনুমতি নিতে হবে। চার্চের এমনই নির্দেশ। (৯) মণিকা এখন আছেন পতিরাম চার্চে। (১০) সেলকু, তাঁর ইচ্ছেমতো মণিকার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। ফোনে চার্চের অনুমতি নিতে হয়। (১১) এখন গোলমাল চলছে, মাদারের অলৌকিক ক্ষমতার একমাত্র প্রমাণ মণিকা। কলকাতার যুক্তিবাদীরা পিছনে লেগেছে, তাই চার্চ মণিকাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

নাকোড় গ্রামের প্রচুর মানুষ কথা বলেছেন ক্যামেরার সামনে। মণিকার পেটে বিশাল টিউমার থাকায় গর্ভবতী মনে হত—একথা কেউ-ই মানলেন না।

নাকোড় থেকে সোজা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে গেলাম। দেখা পেলাম হাসপাতালের সুপার ডাঃ মঞ্জুর মুর্শেল ও ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির। ডাঃ মুস্তাফি মণিকার চিকিৎসা করেছিলেন। সুপার ডাঃ মুর্শেদ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, টি ভি ক্যামেরার সামনে মুখ খুলবেন না তাঁরা। যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষের সামনেই শুধু মুখ খুলবেন। কারণ—সময়টা খুব খারাপ। এই সময় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ একমাত্র নির্ভরযোগ্য,

বিশ্বাসযোগ্য মানুষ। শুনে একই সঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত হচ্ছিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে, খুশি দু'জনেই জানালেন, (১) মণিকার হয়েছিল টিবি। এতে অনেক সময় শরীরে 'একস্ট্রা গ্রোথ' হয়, যাকে বলতে পারি টিউমার সঙ্গে ছিল যক্ষ্মা সংক্রামণজনিত মস্তিষ্কের প্রদাহ। সব মিলিয়ে রোগটাকে বলতে পারি, টিউবার কুলার মেনিনজাইটিস। (২) টিবি সারতে থাকলে টিবি রোগের উপসর্গ টিউমার সারতে থাকে। (৩) মণিকা ৫ রকম ওষুধের ৯ মাসের একটা কোর্স নিয়েছিলেন। টিবি সারাবার ওষুধ। (৪) এতে সেরেছে। টিউমার বা মাংসের দলা সেরেছে। টিবি এখন খুবই সাধারণ অসুখ। (৫) টিউমারটা বা দলাটা ছিল একটা লেবুর আকারের। (৬) ভ্যাটিকান, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এবং আমেরিকার টিভি সি এন এন প্রচার করছে—কোনও এক ডাঃ ভট্টাচার্য নাকি জানিয়েছেন, মণিকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। এমন ক্যানসার যা আধুনিক চিকিৎসায় সারানো সম্ভব নয়। এটা ডাহা মিথ্যা, কুরুচিকর মিথ্যা। (৭) সরকারের উচিত এইসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে ৪২০ ধারায় মামলা করা। (৮) সরকারের উচিত সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট' অনুসারে মামলা করা। (৯) ভ্যাটিকান সিটি থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁকে এনেছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ছিল মণিকা ক্যানসারে ভুগছিল—এটা আমাদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।

সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ আরও জানালেন, (ক) মিশনারিজ, অফ চ্যারিটির তরফ থেকে সুপারকে অনুরোধ করা হয়েছিল, মণিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত নথি যেন তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। (খ) ডাঃ মুর্শেদ তা দেননি। কারণ ইতিপূর্বেই মিশনারিজরা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছিল, যেন মণিকার রোগটাকে ক্যানসার বলে ডাক্তাররা মত প্রকাশ করেন। এরপর আসল নথি ওদের হাতে তুলে দিলে ভবিষ্যতে কেউ প্রমাণই করতে পারবে না—মণিকা আসলে কী রোগে ভুগছিলেন। তখন মিশনারিজদের মিথ্যে প্রচারটাই সত্যি হয়ে যাবে। (গ) সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন পার্থ দে। মিশনারিজ অব চ্যারিটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি ডাঃ মুর্শেদের কাছে বিস্তৃত ভাবে জানতে চান। (ঘ) শ্রীদে'র কাছে সব নথি পাঠিয়ে দিই। সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম মণিকার রোগ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও আমার মন্তব্য। (ঙ) মিশনারিজ অফ চ্যারিটি রায়গঞ্জে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। মণিকার যাঁরা চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানায়। আলোচ্য বিষয় ছিল—গ্রামীণ স্বাস্থ্য, সঙ্গে 'মণিকার রোগ ও আরোগ্য'। অদ্ভুত বিষয়। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মণিকার রোগ ও আরোগ্য নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা। ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি ও ডাঃ তরুণ বিশ্বাসকে ওই সেমিনারে যোগদানের অনুমতি দিইনি। ডাঃ বিশ্বাসের কাছেই মণিকা প্রথমে গিয়েছিলেন। তিনিই ডাঃ মুস্তাফির কাছে কেসটা রেফার করেছিলেন। আমি নিজেও ওই আলোচনা সভায় যাইনি। (ছ) অতিরিক্ত জেলাশাসক গৌতম ঘোষের নির্দেশে মণিকার রোগমুক্তি নিয়ে তদন্ত করেছেন হরিরামপুরের

যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণ সরকার। শুনেছি অরুণবাবুর কাছে মিশনারিজদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আমরা মণিকার অরিজিনাল প্রেসক্রিপশন ও অন্যান্য নথি মণিকাকে ফেরত দিইনি। (ছ) মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে জানল যে মণিকার টিউমার ছিল ফুটবল সাইজের; টিউমারটা আসলে ক্যানসার? এইসব উলটোপালটা মিথ্যে কথা যারা বলে তারা তো অরিজিনাল ডকুমেন্ট পেলেই হাওয়া করে দেবে। হাওয়ায় আরও জোরালো গুজব ছুঁড়ে দেবে। (জ) ডকুমেন্ট দেখতে হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা কোনও ডকুমেন্ট হাওয়া করে দিইনি। বরং রক্ষা করে চলেছি।

এবার গেলাম পতিরাম চার্চে। বালুরঘাট থেকে ফেরার পথে রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই মিশনারি অফ চ্যারিটির বিশাল সাম্রাজ্য। ডান দিকের চার্চে আমাদের গাড়ি ঢুকল। কিছু বালক ও কিশোর মাঠে খেলছিল। একজনই যুবক। জানলাম, ওই আদিবাসী যুবকটি এই চার্চের কেয়ারটেকার। 'প্রেস' স্টিকার মারা গাড়ি দেখে সতর্ক। নাম জানতে চাওয়ায় এড়িয়ে গেল। মণিকা বেসরার সঙ্গে দেখা করতে চাই—শুনে বললো, কে মণিকা বেসরা? ভাবটা এমন, যেন নামটা এই প্রথম শুনল।

মণিকার নাম শুনে ইতিমধ্যে ছোটদের খেলা গেছে থেমে। ওরাও শুনতে চাইছে কথা।

মণিকা কে? তাও বোঝাতে হল। এও বললাম, মণিকার স্বামী সেলকুই জানিয়েছেন—মণিকা এখানে আছেন।

এত কিছু শোনার পরও যুবকটির মুখে একই কথা—না, মণিকা নামের কেউ তো এখানে থাকে না। থাকলে আমি তো জানতে পারতাম।

খেলা থামানো ছেলেদের মধ্যে একজন জানাল, মণিকা বেসরা এখানেই থাকে। এই হল মণিকার ছেলে।

একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিল। মণিকার ছোট ছেলে। নাম—আনারস। আনারস জানাল, মা এই চার্চেরই রাস্তার ওপাশে থাকেন। যুবকটি যত ধামাচাপা দিতে চায়, ততই ধামা খুলে দেয় আনারস।

ওপারে গিয়েও একপ্রস্থ নাটক। সিস্টার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, মণিকা এখানে থাকে কে বলল?

বললাম, সেলকুই বলল। সিস্টার জোরালভাবে জানিয়ে দিলেন মণিকা এখানে থাকেন না।

নাটকটা এখান থেকেই শুরু করেছিলাম। দশ-পনের মিনিটের নাটক। নাটক শেষে সিস্টার আমার একান্ত বন্ধু হয়ে গেলেন। ফুলের তোড়া নিলেন খুশি মনে। জানালেন, এত গোপনীয়তার কারণ প্রবীর ঘোষ ও যুক্তিবাদী সমিতি। আমাকে ফিসফিস করে জানালেন, মণিকা গেছেন গঙ্গারামপুরের 'হোলিক্রস মিশন হসপিটাল'-এ। ওখানে

একটা এক্সরে হবে ওর। এখনও মণিকা পুরোপুরি সুস্থ নয়।

আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পতিরাম ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। গঙ্গারামপুরে পৌঁছবার আগে মণিকার গাড়ি যদি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে? গাড়ির মডেল, রং, রেজিস্ট্রেশন নম্বর—অত্যন্ত গোপন খবরগুলো প্রায় কানে কানে বলে দিলেন সিস্টার।

ছুটলাম গঙ্গারামপুরের হোলিক্রস হসপিটালে। দেওয়াল ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড। গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মণিকার গাড়ি। এখানেও একই সমস্যা। মণিকাকে নিয়ে মিথ্যের সাতকাহন। ডাক্তার, নার্স যাঁদেরই মণিকার কথা জিজ্ঞেস করি, তাঁরাই যেন আকাশ থেকে পড়েন। মণিকার নাম-ই শোনেননি। আমার হাতে ফুলের তোড়া। নন্দনের হাতে পুঁচকে ক্যামেরা। আমরা চক্কর কাটলাম অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত এই খোঁজটুকু পেলাম, ভি আই পি রোগী কোন কেবিনে থাকেন। ভি আই পি কেবিন থেকে একজন নার্সকে বের হতে দেখে তাঁর কাছে মণিকার খোঁজ করলাম। নার্সের মুখে একই ক্যাসেট বাজল, কে মণিকা? না, মণিকা তো এখানে আসেনি। এখানে ঢুকেছেন পারমিশান আছে? আপনারা এখান থেকে চলে যান।

নার্সকে দেখিয়ে আমাদের বাইরের দিকে হাঁটা শুরু হল। নার্স চোখের আড়াল হতেই আমরা দ্রুত পায়ে ভি আই পি কেবিনে হানা দিলাম। পর্দা সরাতেই মণিকা। আরোগ্য কামনা করে। একটা ফুলের তোড়া এগিয়ে দিলাম। ফুলের তোড়া নিতেও মণিকা সাহস পেলেন না। তাঁর অনেক প্রশ্ন—কোথা থেকে আসছেন? এখানে আছি, কে খবর দিল? ফুলের তোড়া দেবার অনুমতি হোলিক্রসের সিস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি কি না? আমি অসুস্থ, এ খবর কে দিল? আমার সঙ্গে দেখা করতে সিস্টার নির্মলার অনুমতি নিয়েছি কি না?

প্রশ্নের হার্ডল রেস একের পর এক অতিক্রম করার পর মণিকা ফুলের তোড়া নিলেন। ছবি তুলতে দিলেন।

এই মণিকা বছর দুয়েক আগের গরীব, অপুষ্টিতে শীর্ণ, শতছিন্ন পোশাকের মণিকা নন। পরনে দামি শিল্কের শাড়ি, শিল্কের ব্লাউজ, কাঁধে দামি চামড়ার ব্যাগ। মণিকা এখন আর আর খালি পায়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পথ হাঁটেন না। এখন তাঁর যাতায়াতের জন্য গাড়ি থাকে। মণিকা এখন খুব দামি মানুষ। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কৃপায় দামি মানুষ। অথবা এও হতে পারে—মণিকা-ই 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'কে খ্রিস্টজগতের কাছে দামি করে তোলার তুরুপের তাস।

২৫ অক্টোবর, শুক্রবার ২০০২। রাত ১০টা। 'আকাশবার্তা' চ্যানেল 'খোঁজ খবর' অনুষ্ঠানে বে-আব্রু করা হল ভ্যাটিকানের বুজরুকি। অনুষ্ঠানটি আবারও দেখান হল ২৬ অক্টোবর সকাল ৮-৫৫ মিনিটে, ২৭ অক্টোবর রাত ১০টায়, ২৮ অক্টোবর সকাল ৮-৫৫ মিনিটে। পরপর টানা চারদিন একই অনুষ্ঠান—খুবই ব্যতিক্রমী ব্যাপার। অবশ্য এরপরও অনেকবার অনুষ্ঠানটি দেখান হয়েছে।

হাঁ, একটা জরুরি খবর—২০০২-এ 'শোক খবর' ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও চ্যানেল মণিকার ডাক্তারানের, সেলফুন ও মণিকার সাক্ষাৎকার দেখাতে সক্ষম হয়নি। এটা আমাদের গর্ব, শোকখবর ও মুক্তিবাণী সমিতির গর্ব।

অনেকেই মনে করতে পারেন—সবকিই যখন ব্যর্থ, তখন কী করে সব কিছুরই ক্রেডিট দাবি করতে পারলাম? কেন-ই বা সিসটারস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন? উত্তর—আজ উদ্ধার করেছি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন যুক্তি আজ লাগিয়ে। এর চেয়ে বেশি—না, মুখ খুলছি না।

রোডনামচা দুই : একটি বছর পরে

২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০০৩। মাত্র দিন কয়েক আগে ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে ১৯ অক্টোবর ২০০৩ মাদার টেরিজাকে 'ব্লেসেড' উপাধি দেওয়া হবে 'বিয়াটিফিকেশন' অনুষ্ঠানে। গত কয়েক দিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মিডিয়া ওদের থেকে ফোনে অভিনন্দন পেয়েছি। ১৯ অক্টোবর 'সেলিব্রেট' নেবার পরিকল্পনা ভ্যাটিকান বাতিল করে 'ব্লেসেড' দিচ্ছে—তাই অভিনন্দন। এইসব অভিনন্দন গ্রহণ করার পাশাপাশি নতুন করে সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন আগামি ১৯ অক্টোবরের 'গুডমর্নিং আমেরিকা' অনুষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রেকর্ড-বন্দি করেছে দিন চারেক আগে।

কিন্তু আজ সকাল থেকে যেসব খবর পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে, সেন্ট প্রক্রিয়া বিরোধীদের বিভ্রান্ত করে ১৯ অক্টোবরই 'সেন্ট' দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

সকাল ছটা তিরিশ। ফোনের ও প্রান্তে সুবীর ভৌমিক। বিবিসি'র প্রতিনিধি। জানালেন, একটু আগে বিবিসি'র রোম প্রতিনিধি একটা বিস্ফোরক খবর দিয়েছেন। ভ্যাটিকানের অতিথি হিসেবে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় আসবেন। অতিথিরা কে, কোথায় থাকবেন, তার একটা লিস্ট আজ প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকার দুটি আশ্চর্য নাম রয়েছে। একজন ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি। অন্যজন ডাঃ তরুণ বিশ্বাস। দু'জনই বালুরঘাট হাসপাতালের ডাক্তার। ডাক্তার বিশ্বাসের কাছেই মণিকা প্রথম যান। তিনি-ই মণিকাকে ডাক্তার মুস্তাফির কাছে রেফার করেন। দুই ডাক্তার-ই ইতিমধ্যে জানিয়েছেন—মণিকা চিকিৎসাতেই ভালো হয়েছে। কোনও অলৌকিক ক্ষমতার নয়। এরপরও তাঁদের কেন অতিথি হিসেবে রোমে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যাটিকান? তবে কি ডাক্তার দুজন ডিগবাজি খাবেন? শেষ মুহূর্তে এমন একটা প্রমাণ পেয়ে যাওয়ার

উৎসাহের রস-ই যাবে পাল্টে। বিয়াটিফিকেশনের উৎসব হঠাৎ বদ্ধ পাল্টে যাবে সেন্টিফের উৎসবে। রোমে ডাক্তারদের নামের তালিকা বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রকাশিত হওয়াটা এমন সাকেথ-ই বদ্ধ করে।

সুবীর ভৌমিক বলালেন, এত সাড়ালেন, কিন্তু শেষ হাসিটা কি শেষ-ই হাসবেন? বাপারটা ভালো করে দেখুন। ডাক্তার দু'জনের যাওয়াটা অটিকাবার চেষ্টা করুন।

এক মুহূর্তের তাঁর শিবাকে 'ব্লেসেড' করালেন কি 'সেন্ট', তাতে আমাদের মুক্তিবাণীদের কিছুই এসে যায় না। কিন্তু লাগাতার প্রচারে আমরা অবশ্যই একটা বিশ্বাসযোগ্য গড়ে তুলতে পেরেছি, এই ধরনের নিখোর অপ্রত্র নিয়ে একজনকে সেন্ট বানাবার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

সকাল সাতটা দুড়ি। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে ফোন করলেন। সুবীর ভৌমিকের কথাই ফোন শোনালেন। ফোন করার উদ্দেশ্যটাও একই। সকাল সাতটা পঁয়তিরিশ। 'আসোসিয়েটেড প্রেস' থেকে ফোন। বক্তব্য ও উদ্দেশ্য একই। সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ। ফোনে ইন্ডো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস-এর অরোপাজনটি মুখার্জি। একই বক্তব্য। একই প্রয়াশ।

সকাল আটটা দশ। ফোনে খবরটা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীসূর্যকান্ত মিশ্রকে। দুঃখকে বললাম, মাদার টেরিজা-সেন্টিফক-মণিকা-ডাঃ মুস্তাফি-ডাঃ বিশ্বাস-ডাঃ মুর্শিদ সেলফু-নাকোড় গ্রামের মানুষজনের কথা। জানালাম, একটু আগেই ফোন পেয়েছি বিবিসি, আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ও কয়েকটা নিউজ এজেন্সি থেকে। তাঁরা খবর দিলেন—ডাঃ বিশ্বাস ও ডাঃ মুস্তাফির নামে রোমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই লিস্ট প্রকাশ করেছেন সিসটার নির্মলা। দুই ডাক্তারের থাকার ব্যবস্থা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি করার মানে হচ্ছে ডাক্তার দু'জন রোমে যাচ্ছেন। ওঁরা রোমে গেলে নিশ্চিন্তে ধরে নেওয়া যায় যে, ওঁরা ডিগবাজি খাবেন।

জানতে চাইলাম, ডাক্তার দু'জন কি রোমে যাওয়ার অনুমতি নিয়েছেন আপনার কাছে? আমার মনে হয়, ওঁরা সরাসরি রোম যাওয়ার অনুমতি চাননি। কারণ, ১৯ অক্টোবরের কাছাকাছি একটা দিনে ওঁরা রোমে যাচ্ছেন, এটার প্রচার ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি (এম. ও. সি) নিশ্চয় চাইবে না। গোটা ব্যাপারটা রহস্যাবৃত গোপনীয়তার সঙ্গেই সরবে। সুতরাং ডাক্তার দু-জন বিশেষের জন্য কোনও শহরে যাবার অনুমতি চেয়েছেন, এমনটা বড়ো সম্ভব।

আপনার অনুমতি না নিয়েও পোপের বিশাল ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে বিদেশ যেতেই পারেন। ভাবতেই পারেন, পশ্চিমী দুনিয়া শেষ পর্যন্ত বিষয়টা মানেক করে নেবে। আমরা চাই, এবিষয়ে আপনার ক্লিন ইমেজের মর্যাদা রেখে আপনি বিষয়টি

দেখবেন। আপনার অনুমতি ছাড়া বিদেশে গেলে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেবেন। রোমে গিয়ে ডাক্তাররা যদি ঘোষণা রাখেন যে মণিকার রোগ সেরেছে মাদারের মিরাকেলে, তাহলে ওঁদের বিরুদ্ধে 'ড্রাগস অ্যাণ্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' অনুসারে আপনি যাতে ব্যবস্থা নেন, তার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ রাখব আপনার কাছে। যে ডাক্তার অলৌকিক উপায়ে রোগ মুক্তির পক্ষে প্রচার রাখেন, সেই ডাক্তারের চিকিৎসা করার নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না। ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গোটা বিষয়টি শুনলেন। জানালেন, এখন পুজোর ছুটি চলছে। সাত তারিখ রাইটার্স খুলবে। সেদিন একবার আমাকে রাইটার্সে ফোন করুন। দুই ডাক্তার বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন কি না। সেক্রেটারির কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব। বিনা অনুমতিতে গেলে, বিভাগীয় শাস্তি ওঁদের নিশ্চয়ই পেতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবলাই রায়। তিনি আরও একটি নতুন তথ্য জানিয়েছেন। লকেট, মাদুলি, তাবিজ, কবচ দিয়ে অসুখ সারাবার দাবি কেউ কেউ করে। এইসব লকেট বা কবচের অসুখ সারানোর যে ক্ষমতা আছে সেটা ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের সামনে প্রমাণ করে ড্রাগ লাইসেন্স নিতে হয়। ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে লকেট, কবচ এইসব পরে রোগ সেরেছে প্রচার করলে লোকে এইসব কিনবে। এমন মিরাকেল লকেট, কবচ বিক্রি বে-আইনি। এদের বিরুদ্ধে একটা আইন আছে 'ড্রাগস অ্যাণ্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট'। এই আইন ভাঙলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেলের বিধান রয়েছে।

দুপুর দেড়টা নাগাদ নিউদিল্লি থেকে ফোন করলেন চন্দন নন্দী। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর সাংবাদিক। জানালেন, যেসব ভি আই পি ভারতীয় ১৯ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভ্যাটিকানে আসছেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থার তালিকা আজ প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি ও ডাঃ তরুণ বিশ্বাসের নাম আছে। আপনারা এ বিষয়ে কিছু করছেন?

বললাম, খবরটা সাত সকালেই পেয়েছি। কথা বলেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে। মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন ও অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত জানালাম।

বিবিসি, আমেরিকান ব্রডকাসটিং কর্পোরেশন ও হিন্দুস্থান টাইমস প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই একটি বিষয়ে সমমত। ১৯ অক্টোবর 'বিয়েটিফিকেশন'-এর দিনটি 'সেন্টহুড' উৎসবের দিন হয়ে উঠতে পারে।

৩ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০৩। 'দ্য হিন্দুস্থান টাইমস'-এ খবরটা প্রকাশিত হল। গতকাল আমার সঙ্গে চন্দন নন্দীর কথোপকথন গুরুত্বের সঙ্গেই প্রকাশিত হল।

এদিনের 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর ওয়েবসাইটেও খবরটা এল।

Row over Mother's sainthood continues [03/10/2003] HindustanTimes. com

Row over Mother's sainthood continues

Chandan Nandy

(New Delhi, October 2)

The visit to the vatican by two of the three West Bengal government doctors who treated Monica Besra, a tribal woman, has sparked off a fresh round of controversy over Mother Teresa's sainthood. The Missionaries of Charity (MoC) had earlier claimed that Besra was cured of an ailment by the Mother's miracle.

Rationalists in Kolkata suspect that the doctors' proposed visit to the papal city has been arranged by the Catholic Church and the MoC and that they might change their initial stand of having medically treated and cured the woman. The communication sent by the MoC to the Vatican includes the names of Dr Ranjan Mustafi, Dr Tarun Biswas and Besra who are scheduled to leave for Rome on October 7.

Sister Nirmala, head of MoC, reached the Vatican last Saturday. Sister Nirmala and some other MoC nuns are in the papal city to attend a crucial meeting on October 19 to decide on conferring sainthood on the Mother.

Speaking to the Hindustan Times over phone from Kolkata, Science and Rationalists' Association of India general secretary Prabir Ghosh said that the doctors' Vatican visit smacked of a possible "somersault" on their stand of having medically cured Besra.

"The doctors' visit to the Vatican could not have taken place without some kind of Inducement. If they now say it was a miracle, they should be booked under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954," Ghosh said.

He has also spoken to West Bengal Health Minister Surya Kanta Mishra and apprised him of the doctors' visit abroad. He demanded to know whether they had taken due permission from the state government to go on a foreign visit. Ghosh said he has also spoken to state Advocate General Bolai Roy and sought advice to proceed legally against Dr Mustafi and Dr Biswas.

· The doctors' Vatican visit has raised other questions as well. As state government employees, did they seek prior permission of the authorities? . "I can't say whether they have sought permission. Normally, we do not object to foreign visits," West Bengal Health Secretary Asim Barman said.

Dr Manzur Murshed, the third doctor, had alleged that some persons claiming to be associated with the Catholic Church and the MoC were pressuring him to pass of the cure as a miracle.

In 1998, gynaecologist Dr Mustafi and Dr Biswas had treated Besra, now 30, for ovarian tumour and tubercular meningitis. She received nine months of anti-tubercular treatment under them. After being discharged from the Balurghat hospital. Besra's treatment at the North Bengal Medical College and Hospital was successful with a last ultra-sound investigation showing that her tumour had disappeared.

According to the Vatican's "proof", on October 5, 1998 Besra prayed to Mother Teresa at MoC, Kolkata. Her pain vanished the same night.

('হিন্দুস্থান টাইমস'-এর ওয়েবসাইট)

দপ্তরের এক সচিবের বিনা অনুমতিতে বিদেশ ভ্রমণ।

শুনলাম, ডাক্তার রঞ্জন মুস্তাফি একথাও বলেছেন, তাঁর পাসপোর্ট-ই নেই। অতএব বিদেশ যাবেন কী করে?

আমার অভিজ্ঞতা বলে, এক বা দু-দিনে পাসপোর্ট বের করা সম্ভব। খুব সম্ভব। আমাদের সমিতির এক সদস্যের খুব তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বের করা জরুরি ছিল। ২৪ ঘন্টায় বেরিয়ে ছিল। আর এখানে তো ভ্যাটিকান খুঁটি। বিশাল ব্যাপার।

ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফিকে ফোনে ধরলাম। জানতে চাইলাম ঘটনাটা। ডাঃ মুস্তাফি জানালেন, রোমে যাওয়ার কোনও আমন্ত্রণ-ই পাননি। নিজের পাসপোর্ট নেই। গোটা ঘটনাই ভিত্তিহীন। সঙ্গে এও জানালেন, গতকাল ও আজ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ না স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে কয়েকজন এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেছেন। তাঁরা জানতে চাইছিলেন, রোমে কবে যাচ্ছি। যাওয়ার ডিপার্টমেন্টাল অনুমতি আছে কি না? ভ্যাটিকান কেন দুই ডাক্তারের নামে অ্যাকমডেশন অ্যালট করেছে? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। সঙ্গে প্রচ্ছন্ন হুমকি, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়া যেন বিদেশে পাড়ি না দিই। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির হয়ে যেন ডিগবাজি না খাই—ইত্যাদি।

ডাঃ মুস্তাফি শেষ কথা জানালেন, আগামি ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত বালুরঘাটের বাইরে পা রাখবেন না, ঠিক করেছেন।

ডাঃ মুস্তাফিকে এক বছর আগের বক্তব্যে অটল থাকায় অভিনন্দন জানালাম।

৫ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। আজ দুর্গা পুজোর দশমী। 'চ্যানেল ভিশন'-এর লাইভ টক শো 'ভিশন টাইম' জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। রাত ৯টা ১৫ থেকে ১০টা পর্যন্ত। ফোনে প্রশ্ন করা যায়। এই অনুষ্ঠানে আমি আজ অতিথি বা আলোচক। সঞ্চালক—সাংবাদিক কুনাল ঘোষ।

কুনাল আমার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রোতা-দর্শকদের তারপরই খবরটা দিলেন, আগামী ১৯ অক্টোবর মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার ভ্যাটিকানি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন মাদারকে সেন্টহুডের পরিবর্তে 'ব্লেসেড' দেওয়া হবে।

টি ভি ক্যামেরার সামনে কুনাল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই যে মাদারকে সেন্টহুড দেওয়াটা আটকে দিলেন, আপনার কেমন লাগছে?

উত্তরে যা বলেছিলাম, তাকে ছোট্ট করে বললে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াতে পারে— (১) ১৯ অক্টোবর সেন্টহুড দেওয়া বন্ধ করে দিতে পেরেছি। এখনই দৃঢ়তার সঙ্গে এমনটা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু বলতে পারছি না। (২) এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি, ভ্যাটিকান বিষয়টিকে যেভাবে একটা ভয়ংকর 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' হিসেবে নিয়েছে, তাতে ছলে-বলে-কৌশলে

আবার যুদ্ধ জেতার চেষ্টা করবেই। (৩) গত এক বছরে ভ্যাটিকান অনেক খেলা খেলেছে। প্রথমে বলেছে ২০০৩-এ মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' দেওয়া হবে। ২০০৩-এ জানলাম মিডিয়ার চাপের কাছে পিছু হটেছে। সেন্ডহুডের বদলে ব্লেসেড দেওয়া হবে। তিন দিন আগে জানলাম মণিকার দুই চিকিৎসককে রোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশেষ অতিথি করে। অনেক বিশ্বখ্যাত নিউজ মিডিয়ার স্পষ্ট ধারণা, ১৯ অক্টোবর শেষ মুহূর্তে মাদারকে 'সেন্ট' উপাধি দিয়ে বাজিমাৎ করার ছক নিয়েই ডাক্তার দু'জনকে শেষ মুহূর্তে রোমে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেছে। শেষ পর্যন্ত বালুরঘাটের ডাক্তাররা রোমে যাচ্ছেন না। (৪) এরপরও আবার কবে নতুন কোনও রোগী ও মাদারের মিরাকেলের পক্ষে সার্টিফাই করার মতো ডাক্তারকে রোমে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পারে ভ্যাটিকান।

'ভিশন টাইম'-এ একথাও বলেছি, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এই সত্যটা ভ্যাটিকান মানল মাত্র বছর কয়েক আগে।

আধুনিক বিজ্ঞান বুঝে গেছে 'অলৌকিক' বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। ভ্যাটিকান বোঝেনি। এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর সঙ্গে একই পংক্তিতে। এই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ভ্যাটিকানের আর কত বছর লাগবে কে জানে?

তবে পোপের দিকে পশ্চিমি খ্রিস্টান সমাজের আঙুল তোলার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পশ্চিমি নিউজ মিডিয়াগুলোর কর্মধারায়।

পশ্চিমী মিডিয়াগুলো 'ক্যানান ল' ও পোপের মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে যে লাগাতার ভাবে তুলে ধরেছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওরাও চায় খ্রিস্ট ধর্মের নামে এই মিথ্যাচারিতা বন্ধ হোক।

নিউজ মিডিয়াগুলোর লাগাতার প্রচারের প্রভাব পশ্চিমি খ্রিস্টান জগতে পড়তে বাধ্য। পশ্চিমি খ্রিস্টান জগতের জাত্যভিমান পোপের দিকেই আঙুল তুলবে। পোপের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন অনেক আর্চবিশপ-ই, আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে এ খবরও পেয়েছি। ইতিমধ্যেই পোপের মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে, বোকা-বোকা ক্যানান ল'র বিরুদ্ধে এবং যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে তাঁদের অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

তৃতীয় সহস্রাব্দে পশ্চিমি জগতে ধর্মীয় দীক্ষাগুরু হিসেবে পোপের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। খ্রিস্টান ব্রাদারহুডের লক্ষ্য পূরণের জন্যে হলেও অসম্ভব। উপাসনা **ধর্মকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার না করলে তা এগিয়ে থাকা চেতনার মানুষরা বর্জন করবেই।** তাই তো পশ্চিমি জগতে ঈশ্বর বিশ্বাসীর তুলনায় নিরীশ্বরবাদীরা সংখ্যাগুরু।

৬ অক্টোবর, সোমবার, ২০০৩। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় ও বিদেশি মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়েছি। কিছুটা একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা।

নতুন একটা ঘটনা ঘটল। ফ্রান্সের নামী পত্রিকা 'ল্য মণ্ড' (Le Monde) -এর দক্ষিণ এশিয়ার করেস্পন্ডেন্ট ফ্রাঁসোয়া শিপো (Francoise Chipaux) এলেন সাক্ষাৎকার নিতে। ফ্রাঁসোয়া উত্তর পঞ্চাশের মহিলা। সম্ভ্রান্ত চেহারা। মনে হল অহংবোধ একটু বেশিই।

কথা এগোচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বিষয় পরিষ্কার হচ্ছিল। ফ্রাঁসোয়া দৃঢ় প্রত্যয়ী—বালুরঘাটের দুই ডাক্তার রোম যাচ্ছেন-ই। ওদের যাওয়া ঠেকাতে পারব না। যদি শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভবও করতে পারি, তবুও আগামি ১৯ অক্টোবর মাদারকে সেন্টহুড দেওয়া হবেই। কলকাতারই এক বিখ্যাত ডাক্তার রোমে হাজির থাকবেন। তিনিই দেবেন মাদারের আরও এক অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ।

ফ্রাঁসোয়ার ইগোই শেষ পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে দিল ডাক্তারের নাম। ডাঃ সুনীল ঠাকুর। ভারতের নামী অস্থি বিশেষজ্ঞ কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ।

ডাঃ সুনীল ঠাকুরকে মোবাইলে পেলাম। শেষ পর্যন্ত শোনালেন, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কলকাতার এক সিস্টারের মাদারের মিরাকেলে ভালো হয়ে ওঠার গল্প। সিস্টারের কলার বোনে একটা প্রবলেম ছিল। ডাঃ ঠাকুর রোগিণীকে দেখেছিলেন। জানিয়ে ছিলেন অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই। মাদার টেরিজা তখন বেঁচে। তিনি কাঁধে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। অবাক কাণ্ড! মাসখানেকের মধ্যে রোগিণী একদম সুস্থ। এই ঘটনাকে মিরাকেল ছাড়া আর কী বলব?

ল্য মন্ড্ পত্রিকার ফ্রাঁসোয়া শিপো'র কথায় এলাম। উনি প্রথমে প্রসঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করলেন। শেষে স্বীকার করলেন ফ্রাঁসোয়া এসেছিলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজই।

ফ্রাঁসোয়ার কাছেই শুনলাম, আপনি রোমে যাচ্ছেন। ১৯শে অক্টোবরের উৎসবে হাজির থাকবেন। আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

আমার এসব কথা শুনে ডাঃ ঠাকুর কিছুটা গুটিয়ে গেলেন বলে মনে হলো। বললেন, হ্যাঁ যাব তো ভাবছি। আসলে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আমন্ত্রণ করেছে। মাদারও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। জান তো মাদারকে নিয়ে আমি বই লিখেছি।

ওই বইতে সিস্টারের ওই কলার বোন ঠিক হয়ে যাওয়ার কথাও লেখা আছে।

বললাম, বইটা তো পড়িনি। এখন শুনলাম মাদার হাত বুলিয়ে একজনের কাঁধের হাড়ের অসুখ সারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাদারকে সেন্ট বানাতে এই ঘটনাটা কোনও কাজেই লাগবে না। মাদারের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা অলৌকিক উপায়ে কাউকে সুস্থ করছেন, এমন প্রমাণ চাই।

আপনি নামী ডাক্তার। আপনার তো জানা, এমন অনেক অসুখ আছে যা আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য নিজে থেকেই সেরে যায়। মানসিক কারণে অনেক শারীরিক অসুখ হয়। আবার এসব মানসিক কারণে সেরেও যায়। কিন্তু ক্যানসার বা টিউমার মাদারের লকেটে ছুঁইয়ে রাতারাতি সেরে গেছে, এমন গুল-গপ্পো কে বিশ্বাস করবে বলুন? কোনও এক ডাক্তার ভট্টাচার্য নাকি জানিয়েছেন, মণিকা ক্যানসারের রোগী ছিলেন। মাদারের লকেটের কল্যাণে রাতারাতি মণিকা ভালো হয়ে গেছেন। কে এই ডাক্তার ভট্টাচার্য? মিশনারিজ অফ চ্যারিটিই মণিকার চিকিৎসক হিসেবে হাজির করেছিল ডাক্তার ভট্টাচার্যের নাম। কিন্তু এখন মিডিয়ার সামনে ডাঃ ভট্টাচার্যকে হাজির করছে না। জানি না, সত্যিই ডাঃ আর. এন. ভট্টাচার্য নামে কেউ আছেন কিনা? নাকি, জেরার মুখে প্রতারণা ধরা পড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকায় ডাঃ ভট্টাচার্যকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে? মণিকা ক্যানসার রোগী ছিলেন বলে যে নথির কথা ভ্যাটিকান প্রথম দিকে বলে আসছিল, সে নথি পাল্টে এখন টিউমার রোগী বানান হয়ে থাকলে একটুও অবাক হব না।

শেষে একটু অনুরোধ রাখলাম, মিশনারিজদের ফাঁদে পড়ে রোমে পা বাড়াতে যাবেন না। ওদের মিথ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবেন না।

না। ডাঃ সুনীল ঠাকুর শেষ পর্যন্ত ওদের মিথ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। রোমে যাননি। ফ্রাঁসোয়া-র প্রত্যয়ের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছেন। ডাঃ ঠাকুরের এই সহযোগিতা আমাদের লড়াইয়ের পাথেয়। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন।

৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০৩। ভোর ৪টে ৩০ মিনিট। দেবীনিবাসের ফ্ল্যাট থেকে আমাকে তুললেন সঞ্জীব শ্রীবাস্তব ও রবি লেখি। সঞ্জীব বিবিসি নিউজ-এর ইন্ডিয়া করেসপন্ডেন্ট। লেখি ফোটোগ্রাফার।

বিবিসি নিউজ টিমের সঙ্গে আমি ওদের গাইড। লক্ষ্য বালুরঘাট ও নাকোড় গ্রাম।

দুপুর ১টা নাগাদ পৌঁছলাম গাজোল-এ। গাড়ি থামল। যুক্তিবাদী সমিতির পথসভা হচ্ছে। গাজোল শাখা ও মশালদিঘি শাখার প্রচুর সদস্য হাজির। তাদের

হাতে হাতে পোস্টার। মাদারের নামে বুজরুকি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে মূলত পোস্টার। পথসভায় প্রচুর মানুষের ভিড়। এখানে আমরা মিনিট কুড়ির জন্য দাঁড়ালাম। তারই মধ্যে সুবোধ সূত্রধরের একটা সাক্ষাৎকার ক্যামেরা-বন্দি করলেন রবি লেখি।

আবার দৌড়। দৌড় থামল বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। তখন বেলা ৩টে। ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি রোগিণী দেখছিলেন। ভালো ভিড়। চেম্বারের দেয়াল ঢেকে গেছে 'অবতার' ও ঠাকুরের নানা ছবিতে।

ডাঃ মুস্তাফি বিবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এক বছর আগে আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেরই পুনরাবৃত্তি। ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে সেই চ্যালেঞ্জ ঠোকা তীক্ষ্ণ কথা।

সাক্ষাৎকার শেষে ডাঃ মুস্তাফি আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। জানালেন, ৩ অক্টোবর হিন্দুস্থান টাইমস-এ ওঁর রোম যাওয়া নিয়ে যে খবর বেরিয়েছে, তা ভুল। আজ পর্যন্ত রোমে যাওয়ার জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাননি। পাসপোর্ট নেই। কেন বালুরঘাটের দুই ডাক্তারের নাম অতিথি হিসেবে মিশনারিজরা প্রকাশ করলেন, বুঝতে পারছি না। তার ওপর যেদিন হিন্দুস্থান টাইমস-এ খবরটা বের হল, সেদিন থেকে গোয়েন্দারা এসে জেরা করতে লাগল। যাচ্ছি না, তবু না যাওয়ার জন্য অদ্ভুত চাপ সৃষ্টি।

অদ্ভুত দিয়ে যে ঘটনার শুরু, তার বিস্তৃতিতে আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক।

৮ অক্টোবর, বুধবার, ২০০৩। কাল রাত ভোর বৃষ্টি হয়েছে। আজও বৃষ্টি চলছেই। কাল ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ সব-ই বিস্কুট চিবিয়ে সারতে হয়েছে। রাতে মালদার 'কলিঙ্গ' হোটেলে উঠেছি। স্নান করে, ডিনার সেরে রিসেপশনে ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতে বলে টিভিতে খবর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ রিসেপশনের ফোন বাজার আগেই ঘুম ভেঙেছে। সাড়ে পাঁচটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গাজোলে সুবোধ অপেক্ষা করছিলেন। ওঁকে তুলে বৃষ্টি পিছল পথে দানগ্রাম। নাকোড়ের রাস্তায় ঢুকতেই এক বছর আগের পথের সঙ্গে আজকের পথের পার্থক্য চোখে পড়ল। পথ আর কাঁচা নেই। দু'কিলোমিটার পথ-ই ইট পেতে তৈরি হয়েছে।

মণিকার স্বামী সেলকুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। এক বছর আগের সাক্ষাৎকারের উল্টো কথা বাজিয়ে গেলেন সেলকু। এবারের কথাগুলো এরকম—(১) মণিকার টিউমার দেখে মনে হত ন'মাসের পোয়াতি। (২) ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন, এ অসুখ সারবে না। মণিকা মরবে। (৩) ১৯৯৮-এ রাতারাতি মণিকার টিউমার

ভ্যানিস হয়ে যায়। (৪) কেউ অর্থ সাহায্য দিলে সেলকু নিতে রাজি। এক বছর আগে সেলকুকে জমি ছাড়াতে টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, সিস্টার নির্মলার অনুমতি ছাড়া কোনও অর্থ সাহায্য নেওয়ার উপায় নেই তাঁর। (৫) অনেকটা জমি নিয়ে যে বড় একতলা বাড়িতে মণিকা-সেলকু পরিবার থাকেন, তাতে বিভিন্ন ভাইদেরও ভাগ আছে। গত বছর সেলকু কিন্তু বলেছিলেন, বাড়িটা তাঁর।

বুঝলাম, এক বছরে সেলকুকে ভালোই শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

১২ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। জার্মান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে মাদার টেরিজার সেন্টহুড দেওয়া নিয়ে আমার বক্তব্য রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। বক্তব্য না বলে সাক্ষাৎকার বললে ঠিক বলা হয়। প্রচার করা হবে ১৯ অক্টোবর।

১৫ অক্টোবর, বুধবার, ২০০৩। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা এ এফ পি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও নিউজ মিডিয়াকে খবর পাঠাল, "ভারতের যুক্তিবাদী দল মাদার টেরিজার অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিবাদ করেছে।" বড় খবর। ভিতরে আছে—মাদারের নামে মিথ্যাচারিতা করার বিরুদ্ধে আমরা যে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে চলেছি, সে খবর।

খবরে আরও বলা হয়েছে, বুধবার সাইন্স অ্যান্ড র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ জানান, "আমরা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার নির্মলা যোশীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি, তিনি প্রমাণ করুন মণিকা বেসরা সুস্থ হয়েছে ওষুধে নয়, মাদারের আশীর্বাদে। তিনি এখন পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ-এ সাড়া দেননি।"

"আগামি শুক্রবার আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা নিয়েছি, মিথ্যে প্রমাণ হাজির করে মাদারকে সেন্টহুড দেওয়ার বিরুদ্ধে।" তিনি (প্রবীর ঘোষ) বলেছেন।

"আমি মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি খ্রিস্টান সমাজকে প্রতারিত করার জন্য।" তিনি বলেছেন।

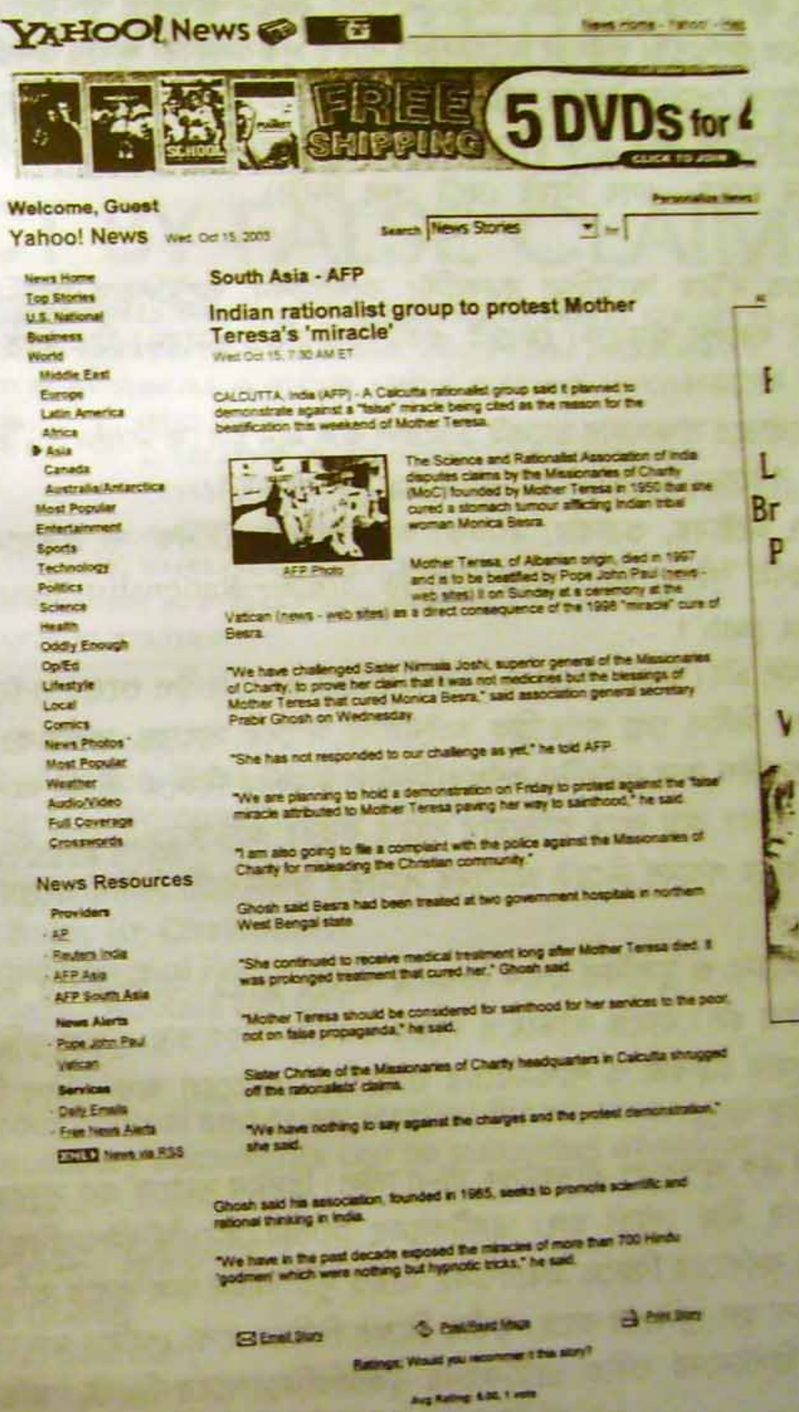
ঘোষ বলেছেন, বেসরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দু'টি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন।

"তিনি (মণিকা) দীর্ঘ চিকিৎসার ফলেই সুস্থ হয়েছেন।" ঘোষ বলেছেন।

"মাদার টেরিজাকে গরিবের প্রতি তাঁর কাজের নিরিখেই সেন্টহুড দেওয়া যেত। এর জন্য মিথ্যে প্রচারের কোনও প্রয়োজন ছিল না।" তিনি বলেছেন—

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কলকাতার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সিস্টার যুক্তিবাদীদের এই দাবিগুলো শুনে উদাসীনতার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়েছেন। বলেছেন, "আমাদের সম্বন্ধে আনা অভিযোগ ও প্রতিবাদ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই।"

"ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর সংগঠন ১৯৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী চিন্তার পক্ষে ভারতে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।"


YAHOO! News

FREE SHIPPING 5 DVDs for

Welcome, Guest
Yahoo! News Wed. Oct 15, 2003

Search News Stories for

News Home
Top Stories
U.S. National
Business
World
Middle East
Europe
Latin America
Africa
Asia
Canada
Australia/Antarctica
Most Popular
Entertainment
Sports
Technology
Politics
Science
Health
Oddly Enough
Op/Ed
Lifestyle
Local
Comics
News Photos
Most Popular
Weather
Audio/Video
Full Coverage
Crosswords

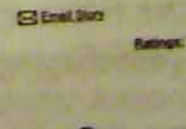
News Resources
Providers
- AP
- Reuters India
- AFP Asia
- AFP South Asia
News Alerts
- Pope John Paul
- Vatican
Services
- Daily Emails
- Free News Alerts
News via RSS

South Asia - AFP

Indian rationalist group to protest Mother Teresa's 'miracle'

Wed Oct 15, 7:30 AM ET

CALCUTTA, India (AFP) - A Calcutta rationalist group said it planned to demonstrate against a "false" miracle being cited as the reason for the beatification this weekend of Mother Teresa.


AFP Photo

The Science and Rationalist Association of India disputes claims by the Missionaries of Charity (MoC) founded by Mother Teresa in 1950 that she cured a stomach tumour afflicting Indian tribal woman Monica Besra.

Mother Teresa, of Albanian origin, died in 1997 and is to be beatified by Pope John Paul (news - web sites) II on Sunday at a ceremony at the Vatican (news - web sites) as a direct consequence of the 1998 "miracle" cure of Besra.

"We have challenged Sister Nirmala Joshi, superior general of the Missionaries of Charity, to prove her claim that it was not medicines but the blessings of Mother Teresa that cured Monica Besra," said association general secretary Prabir Ghosh on Wednesday.

"She has not responded to our challenge as yet," he told AFP.

"We are planning to hold a demonstration on Friday to protest against the 'false' miracle attributed to Mother Teresa paving her way to sainthood," he said.

"I am also going to file a complaint with the police against the Missionaries of Charity for misleading the Christian community."

Ghosh said Besra had been treated at two government hospitals in northern West Bengal state.

"She continued to receive medical treatment long after Mother Teresa died. It was prolonged treatment that cured her," Ghosh said.

"Mother Teresa should be considered for sainthood for her services to the poor, not on false propaganda," he said.

Sister Christie of the Missionaries of Charity headquarters in Calcutta shrugged off the rationalists' claims.

"We have nothing to say against the charges and the protest demonstration," she said.

Ghosh said his association, founded in 1985, seeks to promote scientific and rational thinking in India.

"We have in the past decade exposed the miracles of more than 700 Hindu 'godmen' which were nothing but hypnotic tricks," he said.

Email Story Print Story

Ratings: Would you recommend this story?

Avg Rating: 6.00, 1 vote

"আমরা অতীতে ৭০০ হিন্দু তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরদের ভাণ্ডাফোড় করেছি....." তিনি বলেছেন।

"ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর সংগঠন ১৯৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী চিন্তার পক্ষে ভারতে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।"

YAHOO! News

News Home - Yahoo! - Help



Welcome, Guest

Yahoo! News Wed, Oct 15, 2003

Search News Stories for

Personalize News

News Home
Top Stories
U.S. National
Business
World
Middle East
Europe
Latin America
Africa
Asia
Canada
Australia/Antarctica
Most Popular
Entertainment
Sports
Technology
Politics
Science
Health
Oddly Enough
Op/Ed
Lifestyle
Local
Comics
News Photos
Most Popular
Weather
Audio/Video
Full Coverage
Crosswords

News Resources

Providers
- AP
- Reuters India
- AFP Asia
- AFP South Asia

News Alerts
- Pope John Paul
- Vatican

Services
- Daily Emails
- Free News Alerts

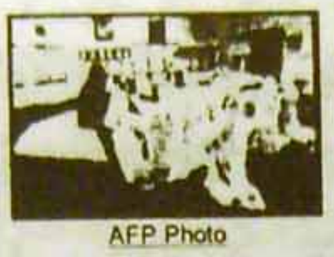
XML News via RSS

South Asia - AFP

Indian rationalist group to protest Mother Teresa's 'miracle'

Wed Oct 15, 7:30 AM ET

CALCUTTA, India (AFP) - A Calcutta rationalist group said it planned to demonstrate against a "false" miracle being cited as the reason for the beatification this weekend of Mother Teresa.



AFP Photo

The Science and Rationalist Association of India disputes claims by the Missionaries of Charity (MoC) founded by Mother Teresa in 1950 that she cured a stomach tumour afflicting Indian tribal woman Monica Besra.

Mother Teresa, of Albanian origin, died in 1997 and is to be beatified by Pope John Paul (news - web sites) II on Sunday at a ceremony at the Vatican (news - web sites) as a direct consequence of the 1998 "miracle" cure of Besra.

"We have challenged Sister Nirmala Joshi, superior general of the Missionaries of Charity, to prove her claim that it was not medicines but the blessings of Mother Teresa that cured Monica Besra," said association general secretary Prabir Ghosh on Wednesday.

"She has not responded to our challenge as yet," he told AFP.

"We are planning to hold a demonstration on Friday to protest against the 'false' miracle attributed to Mother Teresa paving her way to sainthood," he said.

"I am also going to file a complaint with the police against the Missionaries of Charity for misleading the Christian community."

Ghosh said Besra had been treated at two government hospitals in northern West Bengal state.

"She continued to receive medical treatment long after Mother Teresa died. It was prolonged treatment that cured her," Ghosh said.

"Mother Teresa should be considered for sainthood for her services to the poor, not on false propaganda," he said.

Sister Christie of the Missionaries of Charity headquarters in Calcutta shrugged off the rationalists' claims.

"We have nothing to say against the charges and the protest demonstration," she said.

Ghosh said his association, founded in 1985, seeks to promote scientific and rational thinking in India.

"We have in the past decade exposed the miracles of more than 700 Hindu 'godmen' which were nothing but hypnotic tricks," he said.

Email Story Post/Read Msgs Print Story

Ratings: Would you recommend this story?

Avg Rating: 6.00, 1 vote



"আমরা অতীতে ৭০০ হিন্দু তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরদের ভাণ্ডাফোড় করেছি....." তিনি বলেছেন।

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০০৩। যুক্তিবাদী সমিতির কলকাতা অফিসে (৩৩ এ, ফ্রীক স্ট্রো, কলকাতা-৭০০ ০১৪) বুদ্ধবালীন তৎপরতা। আগামী কাল মাদার কলকাতার বেলঘরিয়া জোড়া মন্দিরের সামনে প্রতিবাদী পথসভা। বিকেল ৪টোয় শুরু হবে। পথসভা আয়োজনের সমিতির পূর্ব কলকাতা শাখার উপর। কর্মসূচির শাখানের পোস্টার তৈরির সমিতির পূর্ব কলকাতা ও উত্তর কলকাতা শাখার ওপর। পোস্টারে কী লেখা হবে, কী ছাঁদা হবে, কী প্রচারপত্র ছাড়া হবে, কে কী সমিতি পালন করবে—এসব নিয়েই মেটে বেল মিটিং।

রাত সাড়ে আটটায় আনন্দবাজার প্রকাশনি কর্পোরেশন অফিসিয়ার সিইনি থেকে ফোনে ধরলেন আমাকে। ফোনেই একটা ইন্টারভিউ নেবেন। ঠিক রাত সাড়ে ন'টায় ফোন করবেন।

প্রত্যাশামতো সাক্ষাৎকার ভালোই উতরোল বলে মনে হল। ছাপালেন ১১ অক্টোবর প্রকাশ করবেন। সেদিনের এডিশনটি পাওয়া যাবে।

১৭ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০৩। আজ ইংরেজি দৈনিক 'দ্য এশিয়ান এজ' এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে—Rationalist forum on protests' path'।

সকাল ১টা। আমি, সুমিত্রা ও অনিন্দ্য হাজির হলাম দিলীপ গুপ্তর সল্টলেকের বাড়িতে। দিলীপ গুপ্ত পেশায় আইনজীবী সাহেব সাবেক সম্পাদক।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বর্ষীয়ান সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আনব? কার কাছে অভিযোগ আনব? অভিযোগের ভাষা কী হবে? এসব বিষয়ে পরামর্শ নিয়েই আমাদের সমিতির তরফে দিলীপ গুপ্তর কাছে আসা।

আলোচনা ও মুসাবিদা শেষে বিকেল আমরা ফ্লাটে। কম্পিউটারে কমপ্লেন ড্রাফট করা হল। কাজে অভিযোগ আনব কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুজয় কুমার চক্রবর্তী ও পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ডি সি বাজপেয়ীর কাছে।

আজ এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। ব্রিটেন সমাজে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার বীজ পোঁতা হল। ভাটিকানের সিস্টার নির্মলাসহ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণাসহ আরও দুটি আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ আনা হল পুলিশের কাছে। তৃতীয় বিশ্বের শিরিয়ে থাকা শোষিত মানুষগুলো পশ্চিমি খ্রিস্টানদের প্রতীক ভাটিকানের বুদ্ধবিরিকেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল।

দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হল লিউড মিডিয়াগুলোতে খবর দেওয়া পালা। দুটো ফোনে আমি ও অনিন্দ্য খবর পৌঁছে দিয়ে লাগলাম।

DO NOT RIDICULE MOTHER TERESA'S LOVE & DEDICATED ACT BY FALSE CLAIMS

WE DEMAND FROM THE STATE AND CENTRAL GOVT. A STRONG LEGAL ACTION AGAINST SISTER NIRMALA FOR VIOLATING INDIAN LAWS:

1. IPC 420
2. DRUGS & MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENT) ACT 1954
3. DRUGS & COSMETICS ACT 1940

BY MAKING A PROPAGANDA OF FALSE MIRACLE CURE.

To

1. Mr. D C Vajpai,
   D G of Police, West Bengal (HQ)
   Writers' Buildings, Kolkata 700 001
   Fax: 2214 5486

2. Mr. Sujoy Kr. Chakraborty,
   Comissioner of Police,Kolkata
   Lalbazar, Kolkata 700 001
   Fax: 2214 5424

For your perusal and consideration for necessary action.
(All necessary documents can be submitted whenever required.)

Prabir Ghosh
General Secretary,
Bharatiya Bigyan O Yuktibadi Samity
(Science & Rationalists' Association of India)
72/8 Debinibash Road, Kolkata 700 074
Ph: (033)2569 0435, 2529 5111, 98311 21900

Date: 17 October 2003

বিকেল তিনটে দশ। বেলেঘাটা জোড়া মন্দিরে পৌঁছে চোখ ট্যারা। আমরা বলেছি, বিকেল চারটেতে প্রতিবাদী পথসভা। কিন্তু এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে অনেক নিউজ মিডিয়া। ঢাউস ঢাউস টিভি ক্যামেরা হাজির।

সাড়ে তিনটের আগেই টি ভি ক্যামেরার সামনে সাক্ষাৎকার দেওয়া শুরু করতেই হল।

বিক্ষোভ সভায় সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্ন ছিল। আমাদের উত্তর ছিল। উত্তর দেবার দায়িত্ব ছিল আমার ও সুমিত্রার উপর। সুমিত্রা 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়া'র জেনারেল সেক্রেটারি। হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন যুক্তিবাদী সমিতির উইং।

ইংরেজিভাষী বিদেশি মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংরেজি-চোস্ত এদেশী মিডিয়ার বাঙালি সাংবাদিকদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা আসমান-জমিন ফারাক আছে। বিদেশি মিডিয়ার সাংবাদিকরা রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে বেশিমাত্রায় নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসু ও নির্লিপ্ত। কোনও পক্ষ অবলম্বন করে বা কোনও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করে সংবাদের বিকৃতি ঘটাতে সচেষ্ট হয় না। লন্ডনের দৈনিক 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট'-এর সাংবাদিক ফিলিপ রীভ থেকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি এ এফ পি'র শৈলেন্দ্র এন শীল—সবাই এই ছাঁচে গড়া। মিডিয়াগুলো তাদের সাংবাদিকদের এই ছাঁচে গড়ে। ফলে পাশ্চাত্যের নিউজ মিডিয়াগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি।

ইংরেজি ভাষার ভারতীয় নিউজ চ্যানেলগুলোর বাঙালি সাংবাদিকরা সাধারণভাবে তুলনায় অনেক বেশি ঝক্‌ঝকে, বাক্‌চতুর, তারুণ্যের ঝাঁঝে ভরপুর। পার্থক্য গড়ে দিয়েছে এঁদের মানসিকতা। এঁদের মধ্যে আকাদেমিক নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ত মানসিকতার বড়-ই অভাব। জানার আগ্রহের চেয়ে আক্রমণ চালাবার প্রবণতা বেশি। নিরপেক্ষভাবে একটি খবর পরিবেশন করার চেয়ে, ঘটনার মধ্যে ইনভলভড হয়ে নিজের মতের পক্ষে খবরটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এটাই এই বঙ্গেই ইংরেজি-চোস্ত সাংবাদিকদের মূলস্রোত। মনে হয় তাঁরা আগে থেকে ঠিক করেই আসেন কোন দিকে টেনে লিখবেন বা দেখাবেন।

আজ দেশি-বিদেশি নিউজ মিডিয়াগুলোর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই সত্যটাই বার বার প্রকট হয়ে উঠছিল। বিদেশি মাধ্যমের প্রতিনিধিরা যখন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন—আমাদের বক্তব্য কী? বক্তব্যের পিছনে কী যুক্তি আমরা হাজির করছি? তখনই এদেশি নিউজ মিডিয়ার ঝক্‌ঝকে বাঙালি তরুণীরা চোস্ত ইংরেজিতে মাছের বাজার বসিয়ে ফেলেছেন। এঁরা সব্বাই একসঙ্গে আঙুল তুলে চেঁচাচ্ছেন—আপনারা

সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কমপ্লেন লজ করলেন কোন যুক্তিতে? মণিকার সঙ্গে মিশনারিজ অব চ্যারিটি বা সিস্টার নির্মলা কোনওভাবেই জড়িত নন। মণিকার ব্যাপারে এনকোয়ারি করেছে ভ্যাটিকানের টিম। এরপরও আপনারা কেন সিস্টারের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক ভাবে কমপ্লেন করলেন।

না। উত্তর শোনার মতো ধৈর্য ও দায় তাঁদের ছিল না।

এরই মাঝে অনেক মুখ থেকে একই প্রশ্ন ছুটে এল—আপনারা 'ক্যানান ল'কে অস্বীকার করছেন? 'ক্যানান ল' পাল্টাতে চাইছেন? আপনারা জানেন 'ক্যানান ল' কী?

বুঝুন প্রশ্নের ধরন?

ক্যানান ল'র অস্তিত্ব যে আছে, তার জবরদস্ত প্রমাণ পোপের সাম্রাজ্য ভ্যাটিকানের উপস্থিতি। এরপর কেন বলতে যাব যে—'ক্যানান ল নেই।' আমরা ক্যানান ল পাল্টাতে চাইছি। কারণ, একজনের ভুল ধারণা, ভুল বিশ্বাস সমাজকে প্রভাবিত করে। সামাজিক পরিবেশ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে, তেমনই মানুষও সমাজকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি মানুষের চেয়ে সংগঠনের প্রভাব আরও বেশি। সংগঠন শক্তিশালী হলে তার ভুল চিন্তাধারার প্রচারে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ প্রভাবিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের এই সত্যকে মাথায় রেখেই আমরা ক্যানান ল পাল্টাতে চাইছি।

আমরা জানি ক্যানান ল'র সুরের সঙ্গে মৌলবী ও টিকিধারীদের সুর প্রায়শই মেলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এরা একই সুরে চেঁচায়। কন্ডোমের বিরুদ্ধে এরা উচ্চকণ্ঠ। ভ্যাটিকানের পরিবার সংক্রান্তমন্ত্রী লোপেজ টুজিল্লো বি বি সি'র অনুষ্ঠানে ক্যানান ল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সন্তান কামনা ছাড়া পতি-পত্নীর দেহমিলন অনৈতিক। কন্ডোম কাম-সুখের রাস্তা দেখায়, ব্যাভিচারের পথ প্রশস্ত করে।

ভ্যাটিকানের শেষ আবিষ্কার—কন্ডোম কখনই এড্‌স প্রতিরোধ করে না। বরং কন্ডোম ব্যবহারের জন্যই এড্‌স বাড়ছে।

দেহ-মিলন মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে চেপে রাখতে গেলে অস্বাভাবিক মানসিকতা বাড়বে। মানসিক রোগ বাড়বে। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ বাড়বে। জানি না শারীর-বিজ্ঞানের এই সত্যকে ভ্যাটিকান কবে বুঝবে? জানি না দেশি সাহেব সাংবাদিকরা ক্যানন ল বিষয়ে কতটা জানেন, ক্যানান ল'কে কতটা স্বীকার করেন। সন্তান কামনা ছাড়া দেহ-মিলন উচিত নয়—এমন নীতি কথায় বিশ্বাস করার মতো কোনও সাংবাদিক বিক্ষোভ সভায় ছিলেন কিনা জানি না। কন্ডোম ব্যবহার উচিত নয় অথবা পৃথিবী জুড়ে এড্‌স ছড়াবার কারণ কন্ডোম ব্যবহার—এমন বিজ্ঞানবিরোধী সর্বনাশা বিশ্বাসে সহমত কোনও সাংবাদিক ওখানে হাজির ছিলেন, ভাবলেই আতঙ্কে শিউরে উঠছি। তবে আশার কথা এই যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা এখনও কথায়

ও বাজে এক নয়।

এঁরা 'ক্যানান ল'কে চিরন্তণ ও অভ্রান্ত মনে করতে চান, করুন। এঁদের অনেকে গ্রহরত্ন ধারণ করেন, আমাদের বলার কিছুই থাকতে পারে না। এঁদের অনেকে জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের কাছে যান। এঁরা জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের 'বখ্‌রা' হলে আপনার আমার কী? এইসব ইংরেজি বলিয়ে-কইয়ে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া আনপড় কুসংস্কারে ডুব দেওয়া মানুষগুলোর কোনও পার্থক্য আছে কি?

তা আছে। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে জিজ্ঞাসার আগুন আছে। উসকে দিলেই জ্বলে ওঠে। ওদের নিয়েই যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। ইংরেজি বলতে কইতে পারে মধ্য-মেধার, মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার মানুষদের মধ্যে অহং ও ভণ্ডামি বড়-ই বেশি। এঁরা শিখতে চান না। স-ব জানেন। শিখে বড় হওয়ার চেয়ে, অন্যকে ছোট করে বড় সাজার প্রবণতা বড়-ই বেশি।

আমরা 'ক্যানান ল'র বিরোধিতা করছি। খ্রিস্টান সমাজকে বিরোধিতা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেন্ট-এর সংজ্ঞা পালটাতে চাইছি। মাদার'কে পণ্য বানিয়ে, তাঁর নাম করে মানুষকে প্রতারিত করে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা মাদারকেই অপমান করছেন। এই প্রতারণা বন্ধ না করলে প্রচারের দৌলতে আমজনতা অলৌকিক চিকিৎসার দিকে দৌড়বে। অলৌকিক চিকিৎসার ভয়াবহ পরিণতির জন্য কে দায়ী হবে? পোপ? ভ্যাটিকান? মিশনারিজ অফ চ্যারিটি? সিস্টার নির্মলা? ভ্যাটিকানের সুরে সুর মেলান নিউজ মিডিয়া? নাকি এরা প্রত্যেকেই দায়ী? আপনারা নিজেদের যুক্তি দিয়ে বিচার করুন। উত্তর পাবেন-ই। এই ছিল আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশের 'থিম'।

যে দেশি সাহেব সাংবাদিকরা আমাদের 'ক্যানান ল' পাল্টাবার চেষ্টাকে দুঃসাহসিক বা বোকামো মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকে প্রতিদিন 'ওয়েবসাইট সার্চ' করেন কিনা জানি না। যাঁরা করেন, তাঁরা পরের দিনের 'বিবিসি নিউজ' ওয়েবসাইট দেখে নিশ্চয়ই লজ্জায় মাটিতে মিশেছেন। ওখানে বলা হয়েছে—"মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' দেওয়ার প্রশ্নে বেশির ভাগ মানুষই প্রবীর ঘোষের পক্ষে একমত। তাঁরাও মনে করেন, সেন্টহুড দেওয়ার জন্য মিরাকেল'কে যুক্ত করার কোনও প্রয়োজন নেই।"

খাঁটি ব্রিটিশ নিউজ মিডিয়ার এমন জোরালো বক্তব্যকে মেনে নেবার মতো মুক্ত মনের পরিচয় কি এঁরা দিতে পারবেন? নাকি ইংরেজি শেখা বাঙালি কাঁকড়া হয়ে থাকবেন?

আজ সারা ভারতের টিভি চ্যানেলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ দায়ের করার খবর। বেরান হয়েছে আমাদের বিক্ষোভ পথসভা। শোনান হয়েছে আমাদের বক্তব্য।

১৮ অক্টোবর, শনিবার, ২০০৩। বিবিসি রেডিও আজ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে আমার একটা সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে বাংলায়।

সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটা। নতুনত্ব অবশ্য একটু আছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান সমাজের কাছে আবেদন রেখেছি—ক্যানান ল'র অবৈজ্ঞানিক দিকগুলো পাল্টে দিতে সোচ্চার হোন।

আজ শুধুমাত্র আসমুদ্র হিমাচল নয়, বিশ্ব জুড়ে পত্র-পত্রিকায় নানা ওয়েবসাইটে বিশাল সাড়া ফেলে আমরা, যুক্তিবাদী সমিতি। সমিতির রাণা হাজরা দিন-ভোর ওয়েবসাইট সার্চ করে শ'খানেক কপি তুলেছে।

এ এফ পি তাদের ওয়েবসাইটে জানাচ্ছে —

Indian rationalists call Mother Teresa's miracle hocus-pocus
48 minutes ago

CALCUTTA, India (AFP) – Members of an Indian rationalist group demanded the arrest of the head of Mother Teresa's order,



arguing she fudged facts to claim a miracle to secure sainthood for the Roman Catholic nun.



"Sainthood Means Falsehood," said a poster carried by one of the approximately 100 protesters in the Indian city of Calcuta, where Mother Teresa's Missionaries of Charity (MoC) order is headquartered.

The Nobel lauteate's sainthood stems from the claims of 35-year-old Indian tribal woman, Monica Basra, who insists that she was cured of stomach cancer by Mother Teresa.

Friday's protesters said it was a fraud perpetrated by the MoC and Mother Teresa's successor, sister Nirmala.

Prabir Ghosh, Chief of Science and Rationalists' Association of India, said the forum registered fraud cases with the police against Sister Nirmala.

Hot breath : An Indian activist of the Science and Rationalists' Associaton of India performs a fire-breathing act as she demonstrates against claims that Mother Teresa performed a miracle in Calcutta.

(AFP/Deshakalyan Chowdhury).

News 24. assist 24. finance 24. food24. health2, smalls24, subscribe24

Lip Service
Lip Service brings you the quotes of the week from and about southern and South Africa.

News24 on DStv
News24.com and DStv have launched southern Africa's first interactive news television channel, channel 59 of the DSv bouquet.`

Make News24 my home page /FAQ SIGN ME IN

News sections WORLD : NEWS Updated : 18/10/2003 08:48 - (SA)

Homepage
World
Iraqi Dossier
News
South Africa
Sport
Africa
Sci-Tech
Enertainment
Finance
Health
Backpage

Special Focus

Assist24
Auctions24
Finance24
Food24
Property24
Health24
Subscribe24
Women2
Wheels24
Lotery
Letters

Looking for some HOT weekend entertainment?

'Medicine was the miracle'
15/10/203 1 : 47 - (SA)

Print article * email story

Calcutta, India - A Calcutta rationalist group said on Wednesday it planned to demonstrate against a "false" miracle being cited as the reason for the beatification this weekend of Mother Teresa.

The Science and Rationalist Association of India disputes claims by the Missionaries of Charity (MoC) founded by Mother Teresa in 1950 that she cured a stomach tumour afflicting Indian tribal woman Monica Besra.

Mother Teresa, of Albanian orgin, died in 1997 and is to be beatified by Pope John Paul II on Sunday at a ceremony at the Vatican as a direct consequence of the 1998 "miracle" cure of Besra.

Related Articles

* Mother Teresa, the musical
* My convent runneth over
* Saintly relics on way to Rome
* Waiting for second miracle
* Mother Teresa to be beatified
* Mother Teresa miracle real

Weather
Horoscopes

Special Reports

Rugby World Cup
Idols
Iaqi Dossier
Zimbabwe
Aids Focus
More

Partners

Die Burger
Beeld
Bolksblad
Rapport
Fanansies & Tegniek
Landbou
Sake
LitNet
Natal Witness
City Press
finance Week
Carte Blanche
SASI
Community

"We have challenged Sister Nirmala Joshi, superior general of the Missionaries of Charity, to prove her claim that it was not medicines but the blessings of Moher Teresa that cured Monica Besra, "said association general secretary Prabir Ghosh.

"She has not responded to our challenge as yet," he told reporters.

'False' miracle

"We ae planning to hold a demonstration on Friday to protest against the 'false' miracle attributed to Mother Teresa paving her way to sainthood," he said.

"I am also going to file a complaint with the police against the Missionaries of Charity for misleading the Christian community."

Ghosh said Besra had been treated at two government hospitals in northern West Bengal state.

"She continued to receive medical treatment long after Mother Teresa died. It was prolonged treatment that cured her," Ghosh said.

"Mother Teresa should be considered for sainthood for her services to the poor, not on false propaganda," he said.

Sister Christie of the Missionaries of Charity headquarters in Calcuta shrugged of the rationalists' claims.

We have nothing to say against the charges and the protest **, she said.

Ghosh said his association, founded in 1985, seeks to promote scientific and rational thinking in India.

"We have in the past decade exposed the miracles of more than 700 Hindu 'godmen' which were nothing but hypnotic tricks," he said.

Discussion Forums - Have your say about this article

View or various picture galleries

You can now get the latest news from News24 via interactive TV-simply switch to channel 59 on

.... Top stories in this category

AFP

ভারতের বৃহত্তম নিউজ এজেন্সি পি টি আই ১৮ অক্টোবর ২০০৩-এর ওয়েবসাইটে জানাল —

News

Commentary Diary Elections Interviews Specials The Staes information You Can Use Newsletters

Breaking News on Mobile SMS : NEWS to 7333.

Article Tools
Email this Article
Printer-Friendly Format
Letter to the Editor

Today in News

Mortuaries of Science
Education Programmes at NID
'Today's hawks can become dovers'
Kashmir hostage crisis ends
Book on the sari
Woman gang-raped twice in Bihar
Telgi called up cops from jail
Power from tap water
Indian Muslims do not need help Magician ends 44-day drama

Kolkata gears up for Mother's beatification

Last Updated : October 18, 2003 03:30 1ST.

Mother Teresa does have her critics.

Stoking the controversy surrounding the 'miraculous cure' of Monica Besra that pushed Moher Teresa to beatification, rationalists on Friday demanded 'strong legal action' against her successor Siser Nirmala for 'propagating a false claim'.

Their demand is based on the testimony of two government doctors, who treated the tribal woman, that she was cured solely by medical intervention.

"We demand from the West Bengal and central governments strong legal action against Sister Nirmala for violating Indian laws as laid down by Section 420

of the Indian Penal Code, besides the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 and the Drugs and Cosmetics Act, 1940,'' Prabir Ghosh, general secretary of the Science and Rationalists Association of India, told PTI.

Ghosh, who submitted the demand to the Director-General Police Dinesh Bajpai and Kolkata Police Commissioner Sujay Chakravorty said that Sister Nirmala, currently at the Vatican for Sunday's beatification ceremony, had made false claims about the miraculous cure, besides propagating acting magic remedies.

''I have inerviewed the doctors who treated Monica and I am fully satisfied that she was cured as a result of medical intervention,'' Ghosh said questioning whether Pope John.

Paul II or Sister Nirmala would take the responsibility upon themselves if anybody felt encouraged to seek similar remedies for their illness and died in the process.''

এ'দিনের বি বি সি ওয়েবসাইট বলল —

''Prabir Ghosh, secretary of the Calcutta-based Indian Rationalists Association, openly questions the miracle.

''Mother Teresa was a great soul and I think it is an insult to her legacy to make her sainthood dependent on bogus miracles. It should be linked to her great work among the poor,'' says Mr. Ghosh.

He says Mother Teresa herself went to the best hospitals – and the best doctors – in the city when she fell ill.

Most agree with him that Mother Teresa does not need miracles to be declared a saint.''

Hindustan Times.Com লিখল —

Rationalists say Mother Teresa's miracle claim is 'bunkum'

Kittivas Mukherjee, Indo-Asian News Service
Kolkata, October 17

A group of rationalists on Friday demonstrated against a miracle attributed to Mother Teresa that is being cited by the Vatican for her beatification.

The rationalists also lodged a complaint with the police, urging action to stop ''propaganda'' about the miracle and ''take action'' against Sister Nirmala, who heads the Missionaries of Charity order set up by Mother Teresa.

''We ask the church not to sully the image of Mother Teresa by attributing to her false claims of miracles,'' Prabir Ghosh, general secretary of Science and Rationalists' Association of India, said at a street side meeting.

The rationalists have described as ''bunkum'' the claim that an Indian tribal woman was cured of a tubercular tumour after she prayed to the revered nun in 1998.

The Pope has approved the miracle of Moher Teresa and is set to beatify her on sunday in rome, taking her a step closer to sainthood.

The rationalists distributed pamphlets to passers-by in a congested easern Kolkata locality.

''Do not ridicule Mother Teresa's love and dedicated acts by false claims,'' read he single-page leaflet in english signed by Ghosh.

''We demand from the state and central governments strong legal action against Sister Nirmala for violating Indian laws,'' it also said.

The volunteers held aloft placards that read : ''Don't mock Mother Teresa'', ''Moher did not bargain for sainthood'', Is good work not enough?'' and ''Why resort to fraud.''

Ghosh alleged that Sister Nirmala had ''turned this sainthood thing into a business.''

Ghosh said if the authorities did not take action, the rationalists would sue Nirmala.

He said the rationalists had no objection to Mother Teresa being made a saint, ''but why take recourse to falsehood for a religious cause.''

The rationalists contend that if supposed miracles were passed off as medical cure, poor Indians would run to 'shamans' and 'godmen' for treating illness instead of going to doctors.

Even doctors who treated the 35-year-old tribal woman, Monica Besra, claim that she had been cured with nine months of anti-tubercular medication.

Zinos.Com-এর Dhamaka News আমাদের সমিতিকে নিয়েই ধামাকা ঘটাল।

Rationalists question Mother Teresa's 'miracle'

A controversy is brewing on the miracle attributed to Mother Teresa on the basis of which the Vatican has put her on the fast track to sainthood *(Inspirational))*

A controversy is brewing on the miracle attributed to Mother Teresa, on the basis of which the Vatican has put her on the fast track to sainthood.

A Kolkata-based group called the Rationalists Association of India has questioned the auhenticity of the miracle. And now West Bengal's former Health Minister, Partha De, has confirmed that the Missionaries of Charity was told two years ago that what was being viewed as a miracle was in fact a medical cure.

Ever since the Vatican approved the miracle that Mother Teresa's posthumous intervention had cured Monica Besra of a tumour in the stomach – She has consistently refused to speak about it. "I will not say anything. What I had to say, I said in Kolkata. I will not speak again," Monica insisted.
Prabir Ghosh of the Rationalist Association of India, which was formed in 1985 to debunk tall claims, insisted, "It was a very ordinary disease and it was curable by treatment. Treatment was given and she was cured. Where is the miracle in that?"

The Association's claim is based on investigations at the state government hospital at Balurghat in North Bengal where Monica Besra was treated for tuberculoid meningitis in 1998.

In February 2000, the Missionaries of Charity approached the then health minister. They wanted a government doctor from Balurghat to testify in a religious court.

"Apparently they desired that he (doctor) will depose that there was a miracle in treating Monica Besra, a patient who was treated at the hospital. We told them that was not possible, but that they could put their queries to the government. Indeed, they did put their queries and then we held an enquiry. It revealed that Monica had some ailment, she was treated in the hospital, she was cured and then she was released," Partha De elaborated.

The Missionaries of Charity refused to comment on what is emerging as a conflict between religious faith and medical science. But the Rationalists Association is looking for the doctor who

certified that Besra's cure was a miracle.

Contributed by :
M H Ahsan
(C) Dhamaka News
Email : editor@dhamakanews.net
Website : Dhamaka News

Do you have comments on this?

Zinos.Com-ই শুধু এই 'ধামাকা নিউজ' নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়নি। কলকের বুদ্ধিবাদী সমিতি ভূমিকা বিশ্ব জুড়েই 'বিগ ধামাকা' বা 'ধামাকা নিউজ'। এবং কলকাতার প্রায় পত্র-পত্রিকাতেই 'বিগ ব্লাক আউট'।

'খ্রিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধ' বিশ্বব্যাপী গড়ে তোলার পরিকল্পনা যাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, সেই বহুজাতিক সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনীতি থেকে সংস্কৃতি সব-ই নিয়ন্ত্রণ করে। এমত অবস্থায় আমাদের সমিতির কর্মস্থলের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা শহরে আমাদের ব্লাক আউট করার পরিকল্পনা ভ্রাতৃত্ববোধের পালকরা গ্রহণ করলে তা কার্যকর হবেই। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হই, যখন দেখি এত কিছুর পরও খ্রিস্টান-জনমত আমাদের-ই পাশে এসে দাঁড়ায়।

সবের-ই ব্যতিক্রম আছে। শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত আঙুলে গোনা ব্যতিক্রমী দৈনিক ছিল। তার মধ্যে প্রথমেই যে নামটি করতে হয়, সে নামটি হলো 'The Asian Age'।

'এক নজর' হিন্দি টিভি নিউজ বুলেটিন। প্রচারিত হয় 'এ টি এন কলকাতা' চ্যানেলে রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা। মাদারকে মিরাকেলের সঙ্গে যুক্ত করে সেন্টহুড দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আমার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল। নতুন কথা যা বলেছি তা হল, বিশ্ব জুড়ে হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। গড়ে তোলা হোক মাদার টেরিজার লকেট তৈরির ফ্যাক্টরি। সিস্টার নির্মলা, আপনাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ করে দিন। পরিবর্তে রোগীদের সারিয়ে তুলতে মাদারের লকেট বিতরণ করুন। সিস্টাররা এরপর থেকে তাঁদের অসুখের জন্য ডাক্তারদের সাহায্য নেওয়া বন্ধ করুন। লকেট ঝুলিয়ে রোগ সারান।

এমন আচরণ না করলে মানুষ আপনাদের দিকে আঙুল তুলে বলবে— 'বিবেকহীন', 'ভণ্ড' বলে।

সঙ্গে একটি আবেদন ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আগামী ৯ নভেম্বর কলকাতায় মাদারের 'ব্লেসেড' হওয়া নিয়ে উৎসব হবে। সেই উৎসবের আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করেছেন শুনেছি। একজন মার্কসবাদী হিসেবে অলৌকিক ব্যাপারে

বিশ্বাস রাখলে জনমানসে তার প্রভাবে হবে ভয়াবহ। আমাদের সমিতি একই সঙ্গে অনুরোধ ও দাবি রাখছে—আপনি ওই অনুষ্ঠানে যাবেন না।

এন ডি টিভির লাইভ প্রোগাম বরখা দত্তের 'বিগ স্টোরি'। সময় রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা। ইংরেজি এই অনুষ্ঠানে বরখা সঞ্চালক। আলোচক যুক্তিবাদী সমিতির সৌরভ দাশগুপ্ত ও নিউ দিল্লির এক বিশপ।

বরখা দাপুটে সঞ্চালক। তাঁর মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার লেশ মাত্র নেই। আকাদেমিক নিরপেক্ষতা আছে। আছে নির্লিপ্ত থাকার গুণ। সুতরাং, অনুষ্ঠান জমজমাট।

বরখার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ আমাদের সমিতির বক্তব্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, উল্লেখ করেছেন, হাসপাতালের ঝাঁপ বন্ধ করে মাদারের লকেট তৈরির ফ্যাক্টরির কথা।

'খোঁজ খবর' আজও দেখিয়েছে গত বছর আমার তুলে আনা মণিকা-সেলকু-ডাক্তারদের নিয়ে ভ্যাটিকানকে ভয়ংকর রকম বে-আব্রু করা অনুষ্ঠান। 'আকাশ বার্তা' চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি দেখানো হল রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা।

'মাদার টেরিজা' নামের বেলুনটি সবচেয়ে বেশি ফুলিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মিডিয়া। যুক্তিবাদী সমিতির ভূমিকা ছিল বিবেকের। আজ নিজেকে হালকা লাগছে। বুঝতে পারছি, চূড়ান্ত জয়ের দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। এ জয় প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষের জয়। পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গের অপরিণামদর্শী মিডিয়াগুলো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরবে। অন্যস্বরে কথা বলবে।

১৯ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। ভ্যাটিকান সিটি থেকে বিভিন্ন মিডিয়া খবর পাঠালো—পোপ দ্বিতীয় জন পল মাদার টেরেজাকে 'ব্লেসেড' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা' বলে ঘোষণা করলেন।

না। মাদারকে শেষ পর্যন্ত 'সেন্ট' ঘোষণা করা হয়নি। কার্ডিনালদের পরামর্শে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা থেকে পিছিয়ে যান পোপ। এটাই খবর।

সকাল থেকেই পৃথিবীর টিভি চ্যানেল, রেডিও এবং দৈনিক পত্রিকায় মাদারের মিরাকেলের পাশাপাশি অনিবার্যভাবেই যুক্তিবাদী সমিতিও উঠে এসেছে। মাদার টেরিজা নিয়ে যে কোনও ওয়েবসাইট ক্লিক করলেই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে যুক্তিবাদী সমিতির তোলা মণিকা বিতর্ক।

'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' পৃথিবীর সবচেয়ে নামি দৈনিক পত্রিকা। সকালে হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের লেকটাউনের অফিসে পত্রিকাটিকে একটা সাক্ষাৎকার

দিলাম আমি ও সুমিত্রা। মূল প্রসঙ্গ অবশ্যই মাদার টেরিজাকে সেন্ট দেওয়া নিয়ে বিতর্ক।

বিবিসি রেডিও'র লন্ডন থেকে ফোন করলেন সাকিল আনোয়ার। আজই ভারতীয় সময় রাত দশটায় আমার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে।

সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, সমস্ত মানুষেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। মাদার টেরিজারও ছিল। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার, কন্ডোমের ও গর্ভপাতের বিরোধী ছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তহবিল বাড়াতে অর্থ সাহায্য নিয়েছেন একনায়ক শাসক থেকে কুখ্যাত মাফিয়ার কাছ থেকেও।

মাদার টেরিজা আতুরজনের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। এ যেমন সত্য, তার চেয়েও বড় সত্য মাদার ছিলেন ধর্ম প্রচারক। ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সেবাধর্মের চেয়ে শক্তিশালী কোনও অস্ত্র নেই—এটা ভ্যাটিকান জানে। মাদারও জেনেছিলেন। তাইতেই আমরা দেখেছি, সেবার আড়ালে তিনি ধর্মান্তকরণের কাজ চালিয়ে গেছেন।

এইসব সীমাবদ্ধতার পরও তাঁকে শুধুমাত্র সেবাকর্মের জন্য 'সেন্ট' দিতে পারতেন পোপ। এমন সেবাধর্মের জন্য মাদার টেরিজা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা কলকাতাবাসী হিসেবে গর্বিত হয়েছি।

কিন্তু মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানাতে যে নগ্ন মিথ্যাচারিতার পথে ভ্যাটিকান নেমেছে তা শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ংকরও।

আমাদের মতো কুসংস্কারে ডুবে থাকা দেশের মানুষ প্রচারের দৌলতে অলৌকিক- চিকিৎসার দিকে দৌড়লে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। এই প্রতিটি মৃত্যুর দায় আমরা আগাম চাপিয়ে দিচ্ছি পোপ-ভ্যাটিকান-সিস্টার নির্মলা-মিশনারিজ অফ চ্যারিটির উপর।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত লোকজন অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা না করিয়ে মাদারের লকেট ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এটা আমরা দেখতে চাই। আমরা চাই কথায় ও কাজে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা এক হোন। নতুবা ইতিহাস এদের ভণ্ড বলেই চিহ্নিত করবে।

মিশনাজির অফ চ্যারিটির তরফ থেকে জানান হয়েছে রোম থেকে ফিরে আগামী ৯ নভেম্বর কলকাতায় উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই উৎসবে যোগ দিয়ে একটা অন্য মাত্রা যুক্ত করবেন। ১৯ অক্টোবর সময়াভাবে বুদ্ধদেববাবু নাকি রোমে হাজির থাকতে পারছেন না। তাই এই ব্যবস্থা। মার্কসবাদী বুদ্ধদেববাবু মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ওই উৎসবে যোগদান করলে তা হবে স্পষ্টতই স্ববিরোধিতা। মার্কসবাদ ও ধর্মে থাকার স্ববিরোধিতা।

● মাদার টেরিজাকে 'ব্রেসেড' দেওয়ার পরও মিডিয়ায় এ'নিয়ে বিতর্কের ঝড় কমেনি।

● কলকাতার আঙুলে গোনা ব্যতিক্রমী পত্রিকা যারা আমাদের এই লড়াইয়ের খবর তুলে ধরেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সান্ধ্য দৈনিক 'সত্যযুগ'। ২১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে এক পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হল একটা প্রতিবেদন। শিরোনাম **'বুজরুকিফিকেশন?'** প্রতিবেদনে মাদারের মিরাকেল-মণিকা বিতর্ক উস্কে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই উঠে এল আমাদের কথা। লেখা হল,

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ বলেন, 'মাদার ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু এবং তাকে সেন্টহুড প্রদান করার মাপকাঠি তো এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু এই যে অলৌকিকতার দাবি করা হচ্ছে, এটা তো সবটাই একটা ধাপ্পা। কোনো প্রমাণ নেই। কোনোভাবেই চিকিৎসাশাস্ত্রের পরীক্ষিত নয়। পুরোটাই বুজরুকি।' সেই সঙ্গে যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারের উচিত 'তথাকথিত অলৌকিক' এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা। প্রবীরবাবু প্রশ্ন তুলেছেন মণিকার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ আর এন ভট্টাচার্যের উধাও হয়ে যাওয়া নিয়েও। প্রবীরবাবু ওই ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে বালুরঘাট জেনারেল হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানকার দুই ডাক্তার রঞ্জন মুস্তাফি ও মঞ্জুল মুর্শেদের সঙ্গে দেখা করতে। বস্তুত এঁরা দুজনই মণিকার টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিসের চিকিৎসা করেছিলেন ওই হাসপাতালে। 'ওঁরা বললেন, মণিকার শরীরে ৯ মাস ধরে অ্যান্টি-টিউবারকিউলোসিস চিকিৎসা চালানো হয়েছিল।' মণিকার গ্রামেরও প্রায় পঞ্চাশেক প্রতিবেশীর বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও সবাই বলেছিলেন, 'একটা কমলালেবু আকারের টিউমার ধীরে ধীরে মণিকার শরীর থেকে সেই সময়েই ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল'—প্রবীরবাবু জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, মণিকার স্বামীও একথা স্বীকার করেন।

কিন্তু বিবিসি এ মাসের প্রথম দিকে যেই না গ্রামে গিয়ে তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে উল্টো সুর। প্রবীরবাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'বিবিসি-র সাংবাদিকের কাছে মণিকার স্বামী বলেন, কলকাতায় গিয়ে একরাতেই নাকি তাঁর স্ত্রী অলৌকিকভাবে সেরে গিয়েছেন। অবাক কাণ্ড, গ্রামের লোকজনের মুখেও তখন কুলুপ!'

টানটান সতেজ যুক্তিতে দৃঢ় প্রবীরবাবু ও তাঁর সমিতির সহকর্মীরা। তাঁরা এখন মনে করেন, মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ নম্বর ধারায় মামলা করা উচিত। প্রবীরবাবুর বক্তব্য, 'ড্রাগ্‌স অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেব্‌ল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাক্ট) ১৯৫৪ এবং 'ড্রাগ্‌স অ্যান্ড কসমেটিক্‌স অ্যাক্ট ১৯৪০'—এই দুই আইন লঙ্ঘন করে সিস্টার নির্মলা মিথ্যে প্রচারের আশ্রয় নিয়ে মাদারের মহত্ত্বকে

অবমাননা করেছেন। এই বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের চর্চা কখনওই এভাবে চলতে দেখা যায় না।"

'সত্যযুগ' এ'কথাও লিখল,

"....মাদারকে মহিমা প্রদানে যে অলৌকিকতার শক্তি স্বীকার করা হল, তা আসলে মাদারকেই অসম্মান করা নয় কি? তিনিই যখন ছবি হয়ে গিয়ে কল্পিত বিভূতি ছড়ানোর উপাদান হয়ে গেলেন, তখনই তিনি আরও বড় হলেন?..."

যুক্তিবাদী সমিতির সুরে সুর মিলে যাওয়া কথা।

● 'তথ্যকেন্দ্র' বাংলা ভাষার সাহিত্য মাসিক। নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হল ঃ—

"মাদারকে সন্ত বানানোর চেষ্টা তো তাঁর সেবাধর্মকেই আঘাত করা। তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতি অবমাননা। রক্তমাংসের মানবীকে অবৈজ্ঞানিক রজ্জুতে, অলৌকিক ও অসত্যের মোড়কে মুড়ে ফেলা। প্রতিবাদে ক-জন বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ কণ্ঠ মেলাবেন, সেটাই এখন দেখার।"

"ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করতে কলকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ হাজির হয়েছিলেন বালুরঘাট জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসক রঞ্জন মুস্তাফি ও মঞ্জুল মুর্শেদের সঙ্গে কথা বলতে, যাঁরা ওই হাসপাতালে মণিকার টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসের চিকিৎসা করেছিলেন। ডাক্তারদের বক্তব্য, মণিকার শরীরে প্রায় ৯ মাস অ্যান্টি-টিউবারকুলোসিস চিকিৎসা চালানো হয়েছিল। এই চিকিৎসার ফলেই মণিকার টিউমারটি নষ্ট হয়েছে। মণিকার নাকোড় গ্রামের জনা পঞ্চাশেক প্রতিবেশী প্রবীরবাবুকে একবাক্যে জানিয়েছিলেন, একটা কমলালেবু আকারের টিউমার ধীরে ধীরে মণিকার শরীর থেকে ক্রমশ ছোটো হয়ে মিলিয়ে গেছে। মণিকার স্বামীও তখন এ কথা স্বীকার করেছিলেন। মোটামুটি এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। জলে দুধ মিশল, মণিকার গ্রামে বি বি সি চ্যানেলের খোঁজখবর করতে যাওয়ার ঘটনায়।

গিরগিটিকেও লজ্জা দিয়ে মণিকার স্বামী বি বি সি-র সাংবাদিকদের জানালেন, মাত্র একটি রাতের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী অলৌকিকভাবে সেরে গিয়েছেন। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি তাঁর প্রতিবেশীরাও। তারা যেন মুখে কুলুপ ঝুলিয়ে ছিলেন।"

"ধর্ম যাজকের সর্বোচ্চ আসনে থেকে গত ২৫ বছর ধরে পোপ এই নিয়ে কিন্তু হাজারেরও বেশি 'ব্রেসেড' বানিয়েছেন। আর তাঁর 'সন্ত' তৈরির কারখানা থেকে বেরিয়েছেন ৪৭৭ জন। প্রাচ্যের দেশ বিশেষ করে ভারতবর্ষ না হয় জাদুমন্ত্র ভূত-পেত্নি-রাক্ষস-খোক্ষসদের দেশ, কিন্তু বেয়াড়া যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যের এই হাল

কেন? প্রথম বিশ্বের প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কি এমন প্রশ্ন করা উচিত?"

"মাদারকে সন্ত বানানোর চেষ্টা তো তাঁর সেবাধর্মকেই আঘাত করা। তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতি অবমাননা। রক্তমাংসের মানবীকে অবৈজ্ঞানিক রজ্জুতে, অলৌকিক ও অসত্যের মোড়কে মুড়ে ফেলা। **প্রতিবাদে যুক্তিবাদী সংস্থাগুলি যদি পথে নামেন তাহলে বাংলার ক-জন বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ কণ্ঠ মেলাবেন, সেটাই এখন দেখার।"**

কলকাতার যে'সব মিডিয়া এতদিন ভ্যাটিকানের পক্ষে নির্লজ্জ দালালি করেছে, জয় বন্দনা করেছে, মাদারের মিরাকলের পক্ষে উদ্বাহু উল্লাস প্রকাশ করেছে, তারাই এখন নির্মমভাবে মাদার ও ভ্যাটিকানের কেচ্ছাকাহিনি তুলে ধরে এক নম্বরেই থাকতে চাইছে। ২৩ অক্টোবর ২০০৩ থেকে এমন-ই 'ডিগবাজি' লেখা ছাপা শুরু করল কলকাতার 'সিকান্দার' দৈনিক পত্রিকা। ১৯ অক্টোবর বিবিসি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারের কথাই যেন উঠে এসেছে।

'আজকাল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ৮ নভেম্বর, ২০০৩, 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে একটি চিঠি প্রকাশিত হল। চিঠিটি ইঙ্গিতবহ ও উদ্দীপ্ত করার মতো।

সিস্টার নির্মলা প্রতারণার দায়ে?

আমি আজকালের পাঠক। বয়সে প্রবীণ। আপনাদের কাছে প্রত্যাশা অনেক।

গত ১৭ অক্টোবর বাংলা ও ইংরেজি-সহ বহু চ্যানেলে দেখলাম, মাদার টেরিজাকে নিয়ে সিস্টার নির্মলা মানুষকে প্রতারিত করছেন। কারণ মণিকা বেসরা ৯ মাস চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয়েছে। এক রাতে মাদার-মিরাকলে নয়। নির্মলার এই মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

যুক্তিবাদী সমিতির এই সৎ লড়াইয়ে আপনাদের সামিল দেখতে চাই।

সাধন মজুমদার। রামকৃষ্ণ পল্লী।
বেলঘরিয়া। কলকাতা-৮৩

সব প্রগতিশীল প্রগতিশীল নয়

মাদার টেরিজার নামে, ভ্যাটিকানের নামে, ভয়ংকর রকমের বুজরুকি হল, যার উৎপত্তিস্থল কলকাতা। অবাক বিস্ময়ে বিশ্বের মিডিয়াগুলোর সঙ্গে আমরাও দেখলাম, কলকাতার প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা একদম চুপ।

কেন চুপ? তাঁদের কি তবে টিকি বাঁধা আছে সেই সব মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠানের কাছে, যারা অন্য সুরে গাইছে? অথবা নীরব?

রম্যাঁ রলাঁ ১৯৩৩ সালে তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, বুদ্ধিজীবীরা হল 'সরকারের চেনে বাঁধা কুকুর', যাঁরা আসলে 'ক্ষমতার দাস'।

'তথ্যকেন্দ্র' নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে এই একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল শেষ পংক্তিতে।

অনেক বিজ্ঞান সংগঠন ও যুক্তিবাদী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে আছে। কারও কারও বার্ষিক বাজেট এতই বড় অঙ্কের যে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু এরা কেন অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন করল?

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে গড়ে ওঠা বিজ্ঞান সংগঠন বা যুক্তিবাদী সংগঠনের পক্ষে খ্রিস্টান ভোটারদের তুষ্ট রাখার বিষয়টি মাথায় রাখতেই হয়। তাইতেই ভ্যাটিকানের বিরোধিতা করা 'হঠকারী' কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

মাদারকে 'সেন্ট' করা নিয়ে কলকাতার বড় মিডিয়াগুলো বড় বেশি নাচানাচি করেছে। ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভোটাররা মাদার-আবেগে গা ভাসিয়েছে। এই অবস্থায় পোপের মিথ্যাচারিতার বিরোধিতা করতে গেলে বিপদ আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি সেন্টিমেন্ট ধরে নিতেই পারে, এটা মাদারকেই অপমান। অতএব এ নিয়ে মুখ না খোলাই নিরাপদ। রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠনগুলো এমন ভাবনা থেকেই চুপ ছিলেন, এমন সম্ভাবনা প্রবল।

'খ্রিস্টান ভ্রাতৃত্ববোধ'-এর পুষ্টি চাওয়া মাথাগুলো আবার একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকারী কিছু সংগঠনেরও 'গডফাদার'। গডফাদারদের রাগালে রমরমা বন্ধ। অতএব ভ্যাটিকানের বিরুদ্ধে তারা 'স্পিকটি নট'।

কলকাতার মিডিয়াগুলো এদের কারও কারও উপর আলো ফেলার চেষ্টা করেছে।

একটা আলোয় কি ক্রিকেট মাঠ আলোকিত করা যায়?

মিডিয়ার আলোয় আলোকিত সব প্রগতিশীল যে প্রগতিশীল নন, কেউ কেউ প্রগতিশীল—ভ্যাটিকানের বুজরুকি তা আবার প্রমাণ করল।

সুপার ফ্লপ শো

প্রচার ছিল ৯ নভেম্বর, ২০০৩, কলকাতার সব রাস্তা যাবে মাদারের 'ব্লেসেড' পাওয়ার উৎসবে। উৎসবের মধ্যমণি হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সব-ই তো ঠিক-ঠাকই ছিল। সেন্ট পিটার্স গির্জায় 'বিয়েটিফিকেশন' অনুষ্ঠানের পর থেকে মাদার হলেন 'ব্লেসেড' অফ কলকাতা'। কিন্তু তারপর যতই দিন গড়াতে লাগল, ততই 'ব্লেসেড' বিতর্ক ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে কোনঠাসা করে চলল। বন্ধু মিডিয়াগুলোর ভূমিকাও বিস্ময়করভাবে পালটে গেল। যারা

এতদিন বাহবা দিয়েছে, একবারও মনে করিয়ে দেয়নি যে, এত মিথ্যে ভালো নয়, তারাই আজ নানা অভিযোগ খুঁচিয়ে তুলে বিশ্বাসযোগ্যতার হারানো জমি ফিরে পেতে চাইছে।

যে হাত এতদিন সেলাম ঠুকেছে, সে হাত-ই এখন পিছন থেকে ছোরা মারতে তৈরি।

পশ্চিমবঙ্গের আর্চবিশপদের হাবভাবও তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। ওঁরাও পোপের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন বলে গোপন সূত্রে খবর মিলেছে।

সব মিলিয়ে বড় রকমের ছন্দপতন।

৯ নভেম্বরে অনুষ্ঠান 'নমো নমো' করে-ই সারা ছাড়া উপায় ছিল না। একমাত্র ভরসা, মুখ্যমন্ত্রী এসে যদি মুখ-রক্ষা করেন।

শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীও এলেন না।

একে কী বলব, 'সুপার ফ্লপ শো' ছাড়া?

পোপের বিরুদ্ধে 'ক্যানান ল'র বিচারক

পোপের উপর একটা ডকুমেন্টারি রিপোর্ট তৈরি হয়ে আছে। পোপের স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে জরুরি ভিত্তিতে তৈরি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিবিসি রেডিও ওটা বাজাবে। শুনবে পৃথিবীর ১০০ কোটির উপর মানুষ। ডকুমেন্টারি রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব ছিল বিবিসি'র রেডিও করেসপন্ডেন্ট কল্পনা প্রধানের উপর। ডকুমেন্টারি তৈরির সময়টা খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ।

২০০৩-এর অক্টোবর দ্বিতীয় পর্যায়ে পোপ-মাদার-মণিকা-যুক্তিবাদী সমিতি বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। মিডিয়া ও খ্রিস্টান সমাজ তোলপাড় হচ্ছে। এমন-ই একটা সময়ে ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা পোপের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। পোপের বিরুদ্ধে এনেছেন ভয়ংকর সব অভিযোগ, যার আর এক নাম 'দুর্নীতি'। মণিকা বেসরার এ'সবই ধরা আছে ওই ডকুমেন্টারি রিপোর্টে।

৫ ডিসেম্বর, ২০০৩। পোপ নিয়ে ডকুমেন্টারি রিপোর্ট যাঁর তৈরি, সেই কল্পনা প্রধানের এক সাক্ষাৎকার নিই। তাতে কী বলেছিলেন কল্পনা?

কল্পনা ঃ মাদারকে 'সেন্টহুড' বা 'ব্লেসেড' অর্থাৎ 'সাধ্বী' বা 'ধন্যা' ঘোষণার আগে আমাকে কিছু কাজ করতে হয়েছিল বিবিসি'র জন্য। বিবিসি'র সাংবাদিক হিসেবে কয়েকজনের সঙ্গে মিট করি, যাঁরা 'ক্যাথলিক মণ্ডলী'র উচ্চপদে আছেন। যেমন ধরুন, 'আইন মণ্ডলী' বা 'ক্যানান ল'র বিচারক এ সি জোসেফ।

তো মিস্টার জোসেফ আমাকে বলেছিলেন যে, মাদারকে যে ভাবে 'ব্লেসেড' বা 'সেন্টহুড' ঘোষণা করার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। অনেক কিছু নিয়েই

বড় বেশি তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। যেমন 'ক্যানান ল' অনুসারে ক্যান্ডিডেটের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর থেকে 'সেন্ট' প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পদ্ধতি, এই ঐতিহ্য না মেনে মাদারের বেলায় যে ভাবে তাড়াতাড়ি করে সব কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে প্রশ্ন উঠতে পারে। যাঁরা ক্যাথলিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছেন, ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেন, তাঁরা এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, মাদার টেরিজার 'সাধ্বী' ঘোষণার প্রক্রিয়া এত তাড়াতাড়ি হল কেন?

তিনি আরও বলেছেন, মাদারের কাজের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই চান না যে, এ'রকম কোনও বিতর্কের সঙ্গে মাদারের নামটা জড়িত হোক।

তারপরও আবার উনি বলেন, এটা তো কোনও ক্রিমিনাল প্রসেস নয় বা কোনও জুডিসিয়াল প্রসেস নয়। তা হলে কেন এতো তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন হল?

তিনি বলেছেন, প্রথমে 'সার্ভেন্ট অফ গড', তারপর 'ব্লেসেড' এবং শেষে 'সেন্টহুড' দেওয়ার প্রতিটি ধাপে যথেষ্ট সময় দিতে হয়।

মণিকা বেসরার অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, হয় তো ভবিষ্যতে লোকে বলবে যে, এই অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট তদন্ত হয়নি। এই প্রশ্ন যে ভবিষ্যতে উঠতে পারে, এ নিয়ে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।

তারপরও মিস্টার জোসেফ বলেছেন যে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আরও বেশি সময় ধরে আরও গভীরভাবে ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন ছিল। এবং সেই ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার দরকার ছিল। সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কী বক্তব্য, কী প্রতিক্রিয়া, সেটা তাঁদের জানার দরকার ছিল। 'তাঁদের', মানে 'ক্যাথলিক মণ্ডলী' ও 'ক্যাথলিক আইন সভা'র লোকজনদের। সাধারণ মানুষের কাছে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য না হলে অর্থাৎ মিথ্যে মনে হলে, সেটাকে 'সত্যি অলৌকিক ঘটনা' বলে জোর করে চালাবার চেষ্টা করা ঠিক পদ্ধতি নয়। সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পরে মাদারের অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে ঘোষণা করতে পারতেন। অস্বস্তিকর বিতর্ক এড়াতে পারতেন।

আমি মিট করেছিলাম ক্যাথিলিক ফাদার রবিন গোমসের সঙ্গে। তিনিও প্রায় একই কথা বলেছেন। মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যে মাদারকে 'ধন্যা' শ্রেণিভুক্তির কাজ হয়েছে, যা নিয়ে গোটা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছে। তার একটা বড় কারণ, মাদারকে তাড়াহুড়ো করে 'সেন্ট' বানাবার চেষ্টা হয়েছে। ব্যাপারটা 'ক্যানান ল' মেনে হয়নি, ভ্যাটিকানের ঐতিহ্য মেনে হয়নি।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর যে ইতিহাস, তাতে পোপ যাঁকে 'ব্লেসেড' বা 'সেন্টহুড' শ্রেণিভুক্তিকরণ করতে চেয়েছেন, সেখানে দেখা গেছে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছর

পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাদারের ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর মাত্র চোদ্দ মাস পর থেকেই ভ্যাটিকান সেন্টহুড ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে নিজেদের উদ্যোগে। এটা একটা ব্যতিক্রম।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য কথা তিনি বলেছেন যে, যাঁরা খ্রিস্টধর্মীয় ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্, তাঁদের কাছে ঘটনাটা অবশ্যই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছে। কেন পোপ গোটা প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনমতো সময় দিলেন না? কেন পোপ ইনভেস্টিগেশন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করলেন? এগুলোও ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্দের থেকে উঠে আসা প্রশ্ন। তো ফাদার রবিন গোমস্ নিজেই একজন বিশিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্।

গোলমাল হ্যায় ভাই সব গোলমাল হ্যায়

কল্পনা ঃ মণিকা বেসরার অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম তখন যেটা হচ্ছিল, প্রথমে বিবিসি টেলিভিশনের জন্য নেওয়া হচ্ছিল; তারপরে আমি বিবিসি রেডিওর জন্য নিচ্ছিলাম। টেলিভিশন নিউজের জন্য খুব কম সময় বরাদ্দ। রেডিওর ডকুমেন্টারি রিপোর্টের জন্য অনেক লম্বা ইন্টারভিউ নিয়েছি। টেলিভিশন ও রেডিওর জন্য মণিকা বাংলাতেই কথা বলেছে। টেলিভিশনের জন্য ওকে সংক্ষেপে বলতে বলেছে। ওকে আমি বারবার বলছি, তুমি ছোটো করে বল। কিন্তু দেখছিলাম, ওকে কোনও প্রশ্ন করলে তার উত্তর না দিয়ে ও ডাক্তার থেকে শুরু করে, হসপিটাল থেকে শুরু করে পুরো ঘটনাটাই বারংবার বলে যাচ্ছিল। সব প্রশ্নের উত্তরেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা মুখস্তের মতো বলে যাচ্ছিল। ঠিক যেন টেপ চালিয়ে আর রিওয়াইন্ড করে একই কথা শুনে যাচ্ছি। আমার অবাক লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ওকে এমনভাবে মুখস্ত করানো হয়েছে যে, মাঝখান থেকে কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে না।

আমি এও দেখেছি, বিভিন্ন মিডিয়াকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া মণিকার ইন্টারভিউতে একটি শব্দ বা বাক্য একটুও এদিক-ওদিক হচ্ছিল না। অথচ প্রত্যেকটি মানুষের বেলায় একই প্রশ্নের উত্তরে শব্দ বা বাক্য গঠনের কিছু এদিক-ওদিক হয়। মণিকার বেলায় কিন্তু তেমনটা হচ্ছিল না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন একই টেপ শুনছি। আমার খট্‌কা লেগেছে।

মণিকাকে এতদিন প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। রোমে যাওয়ার আগের দিন, এই একটা দিন-ই প্রেসের সামনে মণিকাকে হাজির করা হয়েছিল। এক একটা প্রেস আলাদা আলাদাভাবে মণিকার সঙ্গে মিট করেছিল। প্রথমে এপি নিয়েছে। তারপর আমরা বিবিসি। বিদেশি টেলিভিশনগুলোকে এক এক করে মণিকার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমি কিছুটা খট্‌কা মেটাতে অনেক মিডিয়াকে মণিকার দেওয়া ইন্টারভিউ শুনছিলাম। ওকে প্রশ্নগুলো বাংলা করে দেওয়া হচ্ছিল। বাংলাতেই উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই সেই গোড়া থেকে মুখস্ত বলে যাওয়া। আমার মনে হচ্ছিল ওকে সব মুখস্ত করানো হয়েছিল

হয়তো বা। প্রবীর আপনার কী মনে হচ্ছে?

প্রবীর ঃ আমারও মনে হয়েছে মণিকা ও সেলকু শেখানো কথা মুখস্ত বলে যাচ্ছেন। আমি এক বছর আগে সেলকুর সঙ্গে কথা বলেছি। সেলকু যা বলেছিলেন আমরা তা টিভি'তে দেখিয়েছি। সেলকু বলেছিলেন, মণিকা হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ খেয়েছে, ভালো হয়েছে। রাতারাতি সেরে ওঠাটা মিছে কথা। এক বছর পরে বিবিসি নিউজ টিমের সঙ্গে যখন গেলাম, তখন সেলকু জানালেন, মণিকা মাদারের দয়ায় রাতারাতি সেরে গেছেন।

মণিকার চিকিৎসা করাতে সেলকু জমি বন্ধক দিয়ে ধার নিয়েছিলেন। জমি ছাড়াতে পারেননি শুনে এক বছর আগে আমি ওকে টাকাটা দিতে চেয়েছিলাম। সেলকু জানিয়েছিলেন, নির্মলার অনুমতি ছাড়া তিনি টাকা নিতে পারবেন না। কারণ সিস্টার নির্মলাই তাঁর পরিবারের সব খরচ জোগাচ্ছেন, ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে রেখে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন।

অথচ গত মাসে যখন বিবিসি টিমের সঙ্গে গেলাম, তখন ক্যামেরার সামনে সঞ্জীব শ্রীবাস্তবের প্রশ্নের উত্তরে সেলকু জানালেন, কেউ অর্থ সাহায্য করতে চাইলে নিশ্চয়ই নেবো।

গত বছর দেয়াল ঘেরা বাড়ির চৌহদ্দি দেখিয়ে সেলকু বলেছিলেন, এটা তাঁর একার। এ'বছর সে বাড়ি হয়ে গেছে অনেকের।

গোটা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনই স্বাভাবিক যে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ওঁদের যে ভাবে বলাচ্ছে, ওঁরা সে'ভাবেই বলছেন।

কল্পনা ঃ আমি মণিকা বেসরার ইন্টারভিউ নিয়েছি। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, মাদারের কৃপায় তোমার রোগ সেরেছে, এমন ঘটনা প্রচার পাওয়ার পর তোমার পরিবারের লোকজন বিষয়টা কেমনভাবে নিয়েছে? তারা খুশি?

উত্তরে ও খুব হেসে বলেছিল, হ্যাঁ খুব খুশি। আগে আমাদের খুব অভাব ছিল, খুব অশান্তি ছিল। এখন আমরা খুব ভালো আছি।

প্রবীর ঃ সেই ডাঃ ভট্টাচার্যের কোনও খোঁজ আপনারা কলকাতার পেয়েছিলেন?

কল্পনা ঃ না, না, না।

প্রবীর ঃ সুবীর ভৌমিক আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ ভট্টাচার্যকে ধরতে। খোঁজ পাননি। কোনও মিডিয়াই খোঁজ পায়নি। অথচ সি এন এন টিভির সামনে নাকি ডাঃ ভট্টাচার্যকে হাজির করেছিলেন নির্মলা। কিন্তু তারপরই ডাঃ ভট্টাচার্য ভ্যানিস। অথচ তিনিই সার্টিফাই করেছিলেন, মণিকা ক্যানসার রোগী।

কল্পনা ঃ আপনি জানিয়েছিলেন যে, বালুরঘাট হসপিটালের সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ এখন বর্ধমান হসপিটালে আছেন। এই খোঁজ পাওয়ার পর এইডসের ওপর একটা কাজ নিয়ে বর্ধমান হসপিটালে গিয়েছিলাম। এই কাজের পরিচয়ের সূত্র ধরে মণিকার চিকিৎসা বিষয়ে ডাঃ মুর্শেদের একটা ইন্টারভিউ নিতে ফোন করি। দেখলাম, উনি ফোন ধরছেন না। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। ডাঃ মুর্শেদের এক অ্যাসিস্ট্যান্টকে ধরলাম। এইডসের কাজের সময় পরিচয় হয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, ডাঃ মুর্শেদের কিছু বলার নেই। উনি তিনজন ডাক্তারের নাম দিয়ে বললেন, ওরা মণিকার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। এখন ওঁরা বালুরঘাটে নেই। অমুক অমুক জায়গায় পোস্টিং আছেন। একজন হাওড়ায় আছেন। একজন কলকাতার

আই ডি হসপিটালে আছেন। তিনটে জায়গাতেই চেজ করলাম। সেই ডাক্তারকে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ চিনলেন-ই না। ওঁদের কোনও ট্রেস পাইনি।

প্রবীর ঃ দুজন ডাক্তার মণিকাকে দেখেন। একজন ডাঃ তরুণ বিশ্বাস। যিনি মণিকাকে পরীক্ষা করে ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির কাছে রেফার করেন। আমরা গত মাসে বালুরঘাটে গিয়ে রঞ্জন মুস্তাফিকে সেখানেই পেলাম। কোথাও ট্রান্সফার হননি।

কল্পনা ঃ হ্যাঁ সেটাই অবাক কাণ্ড। ফোর্থ ডিসেম্বর আপনার কাছেই শুনলাম ডাঃ মুস্তাফি কোথাও ট্রান্সফার হননি। ফোন নম্বরও দিলেন। অথচ ডাঃ মুস্তাফি সঞ্জীবকে (বিবিসি নিউজ-এর করেসপন্ডেন্ট) বলেছিলেন, দেখা করবো না। সঞ্জীব তো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ডাঃ মুস্তাফি তো বলছিলেন, হেলথ সেক্রেটারি বা হেলথ মিনিস্টারের একটা চিঠি নিয়ে এসো, হ্যান-ত্যান, অনেক কিছু বলছিলেন।

প্রবীর ঃ আমি ৬ তারিখ রাতে ডাঃ মুস্তাফির সঙ্গে ফোনে কথা বলি। জানাই বিবিসি নিউজ টিম নিয়ে কালই ওর কাছে যাচ্ছি।

আমরা পৌঁছতেই সঞ্জীব ও লেখির (ফোটোগ্রাফার) সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ডাঃ মুস্তাফি। সঞ্জীবকে বললেন, প্রবীরদা'ই প্রথম এসেছিলেন আমার ইন্টারভিউ নিতে। আমি কিন্তু আমার মতো চেঞ্জ করিনি। ডিগবাজি খাচ্ছি না। হ্যাঁ, মিডিয়াগুলোকে এড়িয়ে চলছি। স্বীকার করছি। কারণ, মিডিয়াগুলো কে যে কেমন মতিগতি নিয়ে চলে, বোঝা মুশকিল। সব মিডিয়াকে এড়ালেও প্রবীরদা'কে কিন্তু এড়াইনি।

একটা কথা বড় সত্যি যে, আমার নেওয়া বা আমার সামনে দেওয়া ডাক্তারদের ইন্টারভিউই বিশ্বের তাবড় নিউজ মিডিয়া, নিউজ এজেন্সি প্রচার করেছে। আর সেখান থেকে লাখ খানেক মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। উৎস একটাই। বিস্ময়কর হলেও এটাই সত্যি।

শেষ কথা

পোপ-ভ্যাটিকান-মাদার-মণিকা-খ্রিস্টভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি মিলিয়ে যে ছবিটা ফুটে ওঠে, তা এ'দেশের ওঝা-ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র-জ্যোতিষীর আর-এক পিঠ।

এর-ই পাশাপাশি আরও এক সত্য হল—মাদারের লকেটে ক্যানসার সেরে ওঠার প্রচারে সাদা চামড়ার গোলামি করা মানসিকতার ভারতবাসী আরও বেশি করে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের দিকে ধাবিত হবে।

এমন-ই এক সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন করতে এক অসম্ভব জয়ের প্রয়োজন ছিল। মানুষের অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল।

এমন-ই এক অসম্ভব ও অনন্য স্বপ্নজয়ের কাহিনি এটি।

দে' জ পা ব লি শি ং



● প্রথম খণ্ড প্রকাশের পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

● গত পাঁচ বছরে শ'দুয়েকের উপর তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার পিছনের আসল সত্য ফাঁস করেছি। দু'শো থেকে দশটি ঘটনা এখানে তুলে এনেছি। বলতে পারেন, 'টপ টেন'। কাহিনীগুলো একশো ভাগ সত্যি।

● শেখান হয়েছে 'অলৌকিক' ধরতে কী করবেন, তার A to Z স-অ-ব।

● এ'বই পড়ে আপনি শুধু দারুণ অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর উত্তেজনা পাবেন না। পাবেন বাড়তি কিছু।